আমার কালের কথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো



প্রথম সংস্করণ —জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা, ১২

মুদ্রাকর—শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা, ৯

১

অসীম অনন্তকালের পথ অতিবাহন করে চলেছে মানুষের মিছিল। বছরের পর বছরের মাইল-পোস্ট পিছনে প'ড়ে থাকছে। বিরাম বিশ্রামহীন চলা। পঞ্চাশটা মাইল পিছনে ফেলে এসে বারেকের জন্য পিছনে চাইতে ইচ্ছা হ'ল।

পাশে যারা সঙ্গী সাথী জুটেছে, যারা কেউ এসেছে—তিরিশ মাইল, কেউ বা বত্রিশ, কেউ বা পঁয়ত্রিশ—যারা ভালবাসে—পথ চলায় যারা বহু সপ্তপদ এক সঙ্গে ফেলে হয়ে উঠেছে অন্তরঙ্গ মিত্র, অনুজের সমান প্রিয়—তারা লক্ষ্য করলে পথ চলার মধ্যে আমার ভাবান্তর। প্রশ্ন করলে--কি হ'ল দাদা?

বললাম—কালের পঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট ফেলে এলাম পিছনে; আজ মনে পড়ছে সেই কথা। আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই, রুক্ষ প্রান্তর, ছায়াশীতল সমতল পার হয়ে চলেছে জীবনের রথ, আলোকে অন্ধকারে, সুখে দুঃখে বিচিত্র এর রূপ—সেই সব কথা মনে পড়ছে ভাই।

তারা বললে—বলুন সেই কথা। আপনার কথা।

—না। আমার কথা বলতে নেই ভাই।

—না। বলুন।

—না। আমার মা বলেছেন—নিজের পুণ্যের কথা বললে সে পুণ্য ক্ষয় হয়, কীর্তির কথা বললে সে কীর্তির বনিয়াদে ফাট ধরে; নিজের বেদনার কথা বললে নিজের অপমান করা হয়; নিজের সুখের কথা বললে অহঙ্কারের পাপ স্পর্শ করে। নিজের কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে।

তারা হয়তো হাসলে। হাসির কথাই যে। বিংশ-শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে যে-একজনের কাছে নিজের কথা বলা যায় ব'লে অনুমান তারা করলে, তার অস্তিত্ব যে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

—হাসিস নে ভাই। তার কথা আমি বলি নি। আমিও যে তোদের সঙ্গী, এক সঙ্গে পথ চলেছি। তোদের সামনেও যে সন্ধি-ক্ষণ বা উদয়লগ্নের নব আভাস দেখা দিয়েছে, আমিও যে চোখের সামনে ঠিক তাই দেখছি। আমি বলছি যে-জনের কথা, সে হলাম আমি নিজে। নিজের কাছে ছাড়া নিজের সুখের কথা, পুণ্যের কথা, কীর্তির কথা—এ সব কথা বলতে নেই। যাঁরা অনন্যসাধারণ তাঁরা পারেন বলতে। যে হেতু না, তাঁদের অনুসরণ ক'রেই আমাদের চলা। তাঁরা ঋষি, আদিম কাল থেকে তাঁরা ব'লে আসছেন তাঁদের উপলব্ধির কথা, অভয়ের বাণী—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আর বলে যারা একান্তই নগণ্য সাধারণ, তারা। কারণ তাদের স্পর্শবোধ আছে—অনুভবশক্তি নাই, বেদনায় চিৎকার ক'রে কাঁদা, সুখে কলরব ক'রে উল্লাস করা হ'ল তাদের স্বভাবধর্ম। অনন্যসাধারণ আমি নই; অতি বিনয় ক'রে নিজেকে নগণ্য সাধারণও মনে করি না। তাই চিৎকার করে কেঁদে, বা কলরব ক'রে উল্লাস ক'রে দুঃখ সুখের কথা বলতে পারব না। আমি সাধারণ

মানুষ, আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সচেতন, আমার মর্যাদা সম্বন্ধে সজ্ঞান। তাই আমার নিজের কথা বলব শুধু নিজেকে, নিজেই দাঁড়াব নিজের কাছে বিচারপ্রার্থীর মত এবং বিচারকের মত, সান্ত্বনাপ্রার্থীর মত—সান্ত্বনাদাতার মত। তবে—

—তবে?

—তবে হ্যাঁ, বলতে পারি কিছু কথা। বলতে পারি পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা। এই পঞ্চাশটা বছর—পঞ্চাশটা মাইল-পোস্টের কথা বলতে পারি।

—তাতেও কি আপনার কথা বলা হবে না? হাসলে অনুজ-দের একজন।

—না।

—না?

—হ্যাঁ ভাই, না।

—কালের কথায় আপনি আসবেন না? আপনার কথা থাকবে না?

—আসব। থাকবে। তবু সে আমার আসা হবে না, আমার বলা কথা হবে না।

উটপাখীতে শুনেছি বালির মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবে আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কথাটা সেই রকম হ'ল না দাদা?

—ভাই, ক্ষীর-সাগরের হংসের দল, উটপাখীর এ দৃষ্টান্ত ঠিক খাটে না। বিচার ক'রে ভেবে দেখ, ক্ষীর-সাগরের রসপরিপূর্ণ-তার হানি না ঘটিয়ে যেটুকু জল তার সঙ্গে থাকে, সেটুকু ন্যায্য অধিকারেই থাকে। জল বলে তাকে বাদ দিতে গেলে ক্ষীর-সাগর ক্ষোয়াক্ষীরের খটখটে চড়ায় পরিণত হবে ভাই। ঐতিহাসিক

●

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তীক্ষ্ণচঞ্চুতে তাকে বিদীর্ণ ক'রে মুক্তা-প্রবাল অনেক আবিষ্কার করবেন তার ভিতর থেকে, কিন্তু হংসের দলের—তোদের বিপদ হবে, সাঁতার দেওয়া চলবে না। ক্ষীরের মধ্যে যতটুকু অধিকার, সেই অধিকারটুকু জুড়ে থাকবে আমার কথা। তার বেশী নয়।

—বেশ মেনে নিলাম। এখন আরম্ভ করুন আপনার কথা।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ঠিক মাইল খানেক পিছনে—১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের পোস্টের উপর তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে। মাঝখানে তার অশোক-চক্র। ওই ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই আমি প্রবেশ করেছি পঞ্চাশের মাইলে। পিছনে উনপঞ্চাশটা মাইল-পোস্ট পার হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে—১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবনযাত্রার সুরু। আমাদের অঞ্চলে বলে, ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য উদিত হন নি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ। অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য একদিন আয়ু আমার হয় বেড়ে গেছে বা ক'মে গেছে।

১৮৯৮ সাল। ভারতবর্ষের দিকে দিগন্তে উড়ত তখন ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতেশ্বরী তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত—মহারাণীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায়-থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলে ছাঁদে ছাঁদে বাঁধা এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সবখানে সব কড়া ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে। প্রাচীন রাঢ় বরেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের এক প্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম। আমার সূতিকাগৃহ আজও আছে।

মাটির মেঝে, শক্ত পাথুরে রাঙা মাটির দেওয়াল দিয়ে গড়া উত্তর-দুয়ারী কোঠাঘর আজও অটুট আছে। শুধু অটুট বললেই বোধ হয় সব বলা হয় না। ঘরখানির সামান্য পরিবর্তনের জন্য বছর কয়েক আগে খানিকটা দেওয়াল ভাঙার প্রয়োজন হয়েছিল, কোদাল টামনা শাবল হার মানলে, শেষে গাঁইতি আনা হ'ল; দেওয়াল ভাঙল বটে, কিন্তু সেদিন যে আগুনের ফুলকি ছড়িয়েছিল গাঁইতির আঘাতে আঘাতে তা আজও আমার চোখে ভাসছে। গাঁইতির একটা দিক ভোঁতা হয়েছিল, একটা দিক ভেঙেছিল। এরই নিচের তলা ধ'রে আমি প্রথম পৃথিবীর মৃত্তিকার আলিঙ্গন পেয়েছিলাম।

ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমি নাকি খুব উচ্চ চীৎকারে কেঁদেছিলাম। আমার জীবনের কর্ম ও সাধন ফলের মধ্যে তার চিহ্ন আছে কি-না মাঝে মাঝে আজ ভেবে দেখি আমি। সে কথা থাক্। সেদিন যাঁরা সূতিকা-গৃহের দুয়ারে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অপেক্ষাকৃত বিষণ্ণ হয়ে বলেছিলেন—যাঃ, মেয়ে হ'ল! এত উঁচু গলা এ মেয়ের! আজও আমাদের দেশে বাড়ীর গিন্নীরা বলেন—ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কম কাঁদে। মেয়েরা আসে জীবনে যে কান্না তারা কাঁদবে তারই সুর ধ'রে! কাঁদতেই তাদের জন্ম!

লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান—আমার মাতৃভূমি—আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি ব'লে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপমহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না-মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি ব'লে নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করি।

১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। জমিদারপ্রধান গ্রাম। নবাবী আমল থেকে সরকার-

বংশীয়েরা ছিলেন জমিদার। তাঁরা তখন বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের ভাঙনের উপর উঠেছে আরও ছুটি বংশ, ওই সরকারবাবুদেরই দৌহিত্র-বংশ। এদের এক বংশ হ'ল আমার পিতৃবংশ, দ্বিতীয়টি অন্য এক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় বংশই তখন গ্রামের মধ্যে প্রধান। ঠিক এই সময়ে—গ্রামের এক দরিদ্রসন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠীতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন। বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাঁদের সংখ্যার বাহুল্য। দশ হাজার টাকা আয় যাঁদের, তাঁরা রাজাতুল্য ব্যক্তি। আমাদের গ্রামের জমিদারের আয় পাঁচ থেকে সাত-আট হাজার। কিন্তু তাতেই তাঁদের প্রবল পরাক্রম। সমারোহ প্রচুর। এ ছাড়া চাষের জমির সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো হাজার-টাকা বাৎসরিক আয়ের জমিদার অনেক, হাতপায়ের আঙুলে গণা যায় না। তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন—'মাটি বাপের নয়, দাপের; দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবি ঘোষণা ক'রে বলতেন—'আমি জমিদার।' এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ। আশ্চর্য সাহস ছিল তাঁদের। সাহসের কথায় একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল। এমনি এক শ-চারেক টাকা আয়ের জমিদারের বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে। বৈষয়িক স্বত্ব নিয়ে ফৌজদারী, পরে দেওয়ানী মামলা চলল। মুন্সেফ-কোর্ট, জজ-কোর্ট, শেষে হাইকোর্ট। একদা

এক চাকুরে বন্ধু দেশে এসে সব বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে তিরস্কার ক'রে বললেন—তুই কার সঙ্গে মামলা করছিস ?

—কেন ? বর্ধমানের রাজার সঙ্গে।

—তাঁকে তুই চোখে দেখেছিস যে মামলা করছিস ? তাঁর বাড়ী দেখেছিস ?

মামলাকারী হা-হা ক'রে হেসে বলেছিলেন—বাড়ী দেখেছি, তাঁকে দেখি নি।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? বর্ধমানের মহারাজা তো বর্ধমানের মহারাজা রে, ভগবান যে ভগবান সে অন্যায় দাবি করলে তাই মানি না। বিশ বছরের বেটা মরে গেল, পরমায়ু দেয় নি ভগবান, তাই তার চিকিৎসায় টাকার শ্রাদ্ধ ক'রে লড়াই করেছি, রাত জেগেছি; যম একদিকে টেনেছে, আমি একদিকে টেনেছি। হেরেছি। তাতে কি ? এক ফোঁটা চোখের জল ফেলি নি।

লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানা স্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ককালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।

প্রধান জমিদার-বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাইনর স্কুলের।

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন হাই ইংলিশ স্কুলের। মাইনর ইস্কুলটি উঠে গেল।

আমাদের গ্রামের গ্রামদেবতা ফুল্লরা দেবী। একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। আসল নাম নাকি অট্টহাস। ব্যবসায়ী ধনী দেবীর প্রাচীন মন্দির ভেঙে নূতন মন্দির ক'রে দিলেন। জমিদার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়ে দিলেন দেবীর মন্দিরের সম্মুখে দীঘির উপর প্রশস্ত ঘাট।

জমিদার-বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার সমারোহ।

ব্যবসায়ী বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ক'রে রাম-যাত্রায় সমারোহ করলেন।

জগদ্ধাত্রী-পূজায় পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র হরিজন ভোজন হ'ত। মনে আছে, চারটে হিসেবে বড় বড় ছানাবড়া—আজকাল যার একটার দাম অন্তত আট আনা, প্রচুর মাছ, প্রচুর মাংস। খাইয়েদের ব্যবস্থা ধরাবাঁধা নয়, যে যত পারে, সে এক 'নাও নাও' এবং 'আর না, আর না' শব্দ। তারপর বিসর্জনের দিন বারুদের কারখানা, লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা, প্রতিমা নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা; ছেলেবেলায় সে এক পরম কামনার দিন ছিল। 'দুই পুরুষ' নাটকের প্রথমেই কঙ্কনার বাবুদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী

পূজার ধূমের কথাটা সেই স্মৃতি থেকেই এসেছে। কিন্তু কঙ্কনার বাবুদের সঙ্গে এই জমিদারবাবুদের কোন সম্পর্ক নাই। সে কথা থাক্।

কার্তিকের শুক্লা-নবমীতে জগদ্ধাত্রী-পূজার কয়েক দিন পরেই রাস-পূর্ণিমা। ব্যবসায়ীর বাড়ীতে পঞ্চগ্রাম সপ্তগ্রামের লোকদের নিমন্ত্রণ, ব্যঞ্জনের সংখ্যা এবং স্বাদুতা নিয়ে প্রতিযোগিতা। পাতায় কুলাত না, ব্যঞ্জনের তেলে নাটমন্দিরের বাঁধানো মেঝে পিচ্ছিল হয়ে যেত। সোডা ক্ষার দিয়ে মাজতে হ'ত। মিষ্টান্নও এখানে বেশী এবং আকারেও বড় হ'ত। তবু ব্যবসায়ী ভোজের ব্যবস্থায় এঁটে উঠতেন না। হার মানতে হ'ত শাক্ত ব্যবস্থার কাছে বৈষ্ণব ব্যবস্থার আয়োজনকে। জগদ্ধাত্রী পূজায় পাঁঠা বলি হ'ত। বৎসর ধ'রে পোষা বড় বড় পাঁঠার মাংসের কালিয়ার ব্যবস্থায় জমিদার-বাড়ী টেক্কা মেরে থাকত। শুধু মাংসের ব্যবস্থাতেই নয়, আয়োজনের সঙ্গে রন্ধন-শিল্পের যে মুন্সিয়ানা এবং যত্নের পরিপাট্য থাকলে সামান্যকে অসামান্য ক'রে তোলা যায়, তা যেমন জমিদার-বাড়ীতে ছিল, ব্যবসায়ীর বাড়ীতে তা তেমনটি ছিল না। জমিদার-কর্তা নিজে নুন মিষ্টির পরিমাণ দেখতেন, চেয়ার নিয়ে রন্ধনশালায় ব'সে পাচকের সঙ্গে সারারাত্রি জাগতেন, শেষ রাত্রে চাকর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নিজেই তামাক সেজে খাওয়াতেন। উনানে কাঠ ঠেলতেন। সকালে মুখ ধুয়ে পূজারম্ভের পরেই বসতেন দই নিয়ে। দইকে তিনি 'আমদইয়ে' পরিণত করতেন। আম আদা বেঁটে মিশিয়ে তাকে আম সন্দেশের মত এমন সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু বস্তুতে পরিণত করতে জানতেন যে লোকে ওই আমদই

খাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে তার পালা গুণত; কখন আসবে আমদই? দীর্ঘদিনের রোগীও আসত, বলত, মুখটা একটু ছাড়িয়ে আসি। সে স্বাদ আজও মনে হ'লে আমার রসনাও সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

রাধাগোবিন্দের ধাতু ও শিলাবিগ্রহ, তার বিসর্জন নাই। তাঁর ছিল রাসপূর্ণিমার পরদিন বনভোজনের ব্যবস্থা। চতুর্দোলায় যেতেন যুগল বিগ্রহ, মশালে মশালে গ্রামের আকাশ রাঙা ক'রে চলত মশালধারীরা, আসাসোঁটা নিয়ে চলত বরকন্দাজ, গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে গ্রামের বাইরে তাঁদের বিস্তীর্ণ বাগানে বিগ্রহ নামাতেন। বাজি পুড়ত, লাঠিখেলা হ'ত, সাঁওতালরা নাচত। দুই তরফের সমারোহেই দশ-বিশখানা গ্রামের লোক ভেঙে আসত। দশ-পনের হাজার লোক। আসলে এটা বিসর্জন উৎসবের প্রতিযোগী উৎসব বলতে ভুলেছি। জগদ্ধাত্রী-পূজায় জমিদার-বাড়ীতে দুদিন যাত্রা হ'ত।

এদিকে ব্যবসায়ীর বাড়ীতে রাসে হ'ত মাসখানেক ধ'রে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রা। অনেক বার দুই বাড়িতেই হয়েছে খেমটা নাচ। খেমটা নাচের তখন খুব চলন। বিয়েতে খেমটা নাচ না হ'লেই চলত না। পূজা-পার্বণে হ'ত, অন্নপ্রাশন-উপনয়নে হ'ত, এমন কি আমাদের গ্রামের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময় স্কুলের হলে কলকাতার মোটা দক্ষিণার খেমটা নাচ হয়েছিল।

এই ব্যবসায়ী ধনীর বাড়ীতে আসত বড় বড় যাত্রার দল। সে কালের নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ সিতিকণ্ঠ তিন ভাই আসতেন, মতি রায়ও আসতেন। অধিকাংশ সময় আসতেন আমাদের জেলার খ্যাতনামা কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী যোগীন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর দল নিয়ে। আমাদের গ্রাম তখন জমজমাট গ্রাম। স্বচ্ছল গৃহস্থ বাড়ীর

যুবকের দল তখন প্রকাণ্ড। ব্যবসায়ীটির কল্যাণে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার নবজীবনের সংস্কৃতির অমৃত কেউ ভৃঙ্গারে পুরে আনতে না পারলেও, ফ্যাশানের হুইস্কির বোতল কেস-বন্দী হয়ে গ্রামে অনায়াসে পৌঁচেছে। তারই ফলে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল। শ্রীকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ এসেছেন রাসের বাড়ীতে গাওনা করতে। লোকে লোকারণ্য, গান চলছে। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন যুবকের গান মনঃপূত হয় নি। তাঁরা আগেই কৃষ্ণযাত্রায় অমত জানিয়েছিলেন। বলহরি-হরিবোল অর্থাৎ যাত্রাকে গঙ্গাযাত্রা ব'লে ব্যঙ্গ ক'রে আসর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই তাঁরা অকস্মাৎ চিৎকার ক'রে উঠলেন—আগুন! আগুন! আগুন!

মাটির ঘরের দেশ, ঘনসন্নিবদ্ধ খড়ের চাল। চিৎকার শুনে মুহূর্তের মধ্যে আসর গেল ভেঙে। আতঙ্কিত গ্রাম্য শ্রোতার দল ছুটল আপন আপন বাড়ীর দিকে।

যুবকের দল আবার হরিবোল দিয়ে উঠল—বল হরি হরিবোল!

নীলকণ্ঠের সহোদর—শ্রীকণ্ঠ এবং সিতিকণ্ঠ উভয়েই ছিলেন মানী লোক। তাঁরা সমস্ত বুঝলেন। এবং মাথা নীচু ক'রে আসর ভেঙে লাভপুর থেকে বিদায় নিলেন। পরবৎসর উপযাচক হয়ে নীলকণ্ঠ, লোকে বলত 'কণ্ঠ মহাশয়', এলেন তাঁর দল নিয়ে, সঙ্গে তাঁর দুই ভাই। সেবার তিনি গান করলেন। সে কি গান! আর সে কি জনতা! সে কি স্তব্ধতা! মানুষ হাসল, বুক ভাসিয়ে কাঁদল। কিন্তু এত অসুবিধাতেও কেউ 'আঃ' শব্দ করলে না! লাভপুরের যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে জয় ক'রে নীলকণ্ঠ সেবার ফিরে গেলেন।

এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।

৩

আমাদের রাঢ় দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, 'লক্ষ্মী যখন ছেড়ে যান তার আগে তিনি গৃহস্থকে বলেন—হয় চাল ছাড়, নয় আমাকে ছাড়।' গৃহস্থ চাল ছাড়তে পারে না। লক্ষ্মীই ছেড়ে যান। 'চাল' কথাটা শুনতে খারাপ, চাল কথাটার বাইরের অর্থ হয় তো বাইরের ভড়ং, কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে জীবনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, জীবনের ভিত্তির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কার করা যায়। তাই প্রতিষ্ঠা যে-কালে সমাজে সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেউলের মাথায় চূড়ার মত সে-কালে সম্পদরূপী ভিত নড়লে চূড়া বা চাল আপনি খ'সে পড়ে প্রতিষ্ঠায় আবার চূড়ার উচ্চতার প্রতিযোগিতায় চূড়া যখন বিন্ধ্যগিরির মত বাড়তে থাকে তখন চূড়ার ভারে ভিতও আপনি বসে পড়ে। ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির জড়বস্তু, কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার মন্দির সজীব, তাই কোন নূতন প্রতিষ্ঠাবান যখন অপর সকল প্রতিষ্ঠাবানের প্রতিষ্ঠার মন্দিরকে ছাড়িয়ে নিজের ইমারৎ গড়ে, তখন পুরানো প্রতিষ্ঠার মন্দিরগুলি স্বাভাবিক ভাবে সজীব বিন্ধ্যগিরির মত থাকে। আমরাও ছিলাম স্বল্প আয়ের জমিদার, পাখী-পর্যায়ভুক্ত হবার যোগত্যা না থাকলেও পাখা ছিল। সুতরাং আকাশের উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায় দুর্বল

ডানায় ভর দিয়েও মেতে ওঠাই এ ক্ষেত্রে ছিল স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম। এই স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম বলেই এই দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকেও স্পর্শ করেছিল। এই ব্যবসায়ী বাল্যজীবনে ছিলেন দরিদ্রের সন্তান; তখন আমাদের বাড়ী থেকে তাঁদের বৃত্তি বরাদ্দ ছিল। পূজার সময় আমার পিতামহদের বিচিত্র গোপন দানের একটি বিচিত্র পদ্ধতি ছিল; তাঁরা অপরিচিত মজুর শ্রেণীর লোকের মাথায় কাপড় মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজিয়ে অভাবী গৃহস্থদের বাড়ী পাঠাতেন। সঙ্গে থাকত জাল চিঠি—গৃহস্থদের দূর-আত্মীয়েরা যেন তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। এবং লিখছেন, 'কিছু তত্ত্ব পাঠাইলাম। তোমাদের সদা সর্বদা খোঁজ লইতে পারি না বলিয়া লজ্জা পাই। যাহা হউক যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবা।' সেই তত্ত্ব এদের বাড়ীও যেত। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব আমাদের সংসারকে টেনেছিল স্বভাবিক ভাবেই।

আমার পিতামহ ছিলেন উকীল। সিউড়িতে ওকালতি করতেন। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। আমার পিতামহ ছোট। দুই ভাই-ই ছিলেন উকিল। সেকালে প্রতিষ্ঠা এবং উপার্জন করেছিলেন যথেষ্ট। বড় ভাই ছিলেন সে আমলের বিখ্যাত উকীল। মানুষও ছিলেন বিচিত্র। একবার এক স্বত্বের মামলায় তাঁর মক্কেলের হ'ল পরাজয়। ইংরেজ জজ। জজ বলেছিলেন—ভুয়া মামলা তুমি মুখের জোরে জিতবে ব্যানার্জী? তা হয় না। তিনি অনেক বুঝিয়েছিলেন—সাহেব, এই পয়েণ্ট আপনি বুঝে দেখুন। সাহেব বুঝতে চান নি। অপমানজনক কথা বলেছিলেন। তিনি অপমানিত হয়ে নিজে হাইকোর্টে আপীল ক'রে সেই মামলা ডিগ্রী করেছিলেন। যেদিন

খবর পেলেন, সেদিন তিনি ঢাকীকে পয়সা দিয়ে গোটা শহরে ঢাক পিটিয়ে খবরটা জানিয়েছিলেন। সেই জজ সাহেব তখন অন্য জেলায়। তাঁকেও চিঠি লিখে খবরটা জানিয়ে তবে শান্ত হয়েছিলেন।

আমার বাবা ছিলেন পিতার এক সন্তান এবং প্রৌঢ় বয়সের সন্তান। পিতামহ বিবাহ করেছিলেন তিনবার। আমার প্রথম পিতামহী ছিলেন বন্ধ্যা। গল্প শুনেছি, তিনি নাকি অপরূপ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জীবনে তাঁর কোন মানুষের সঙ্গে কোন দিন বিরোধ ঘটে নি। গড়গড়ায় তিনি নাকি তামাক খেতেন। সে গড়গড়াটী আজও আছে। আমার পিতামহ দ্বিতীয় বিবাহ করেন বাহান্ন-তেপ্পান্ন বৎসর বয়সে। বিবাহ করবার সঙ্কল্প প্রথম স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতে পারেন নি। বিবাহের পর যখন বধূ নিয়ে এলেন তার প্রথমা স্ত্রীই হাসিমুখে বরণ ক'রে ঘরে তুলে বলেছিলেন– আমায় আগে বললে যে বিয়েতে কত ধুমধাম করতাম বাবু! পিতামহ লজ্জিত হয়েছিলেন, কোন কথা বলতে পারেন নি। কয়েক দিন পর তিনি প্রথমা স্ত্রীকে ডেকে একটি টাকার থলি দিয়ে বলেছিলেন—এইটি তোমাকে দিলাম। এতে এক হাজার টাকা আছে।

তিনি বলেছিলেন—টাকা নিয়ে কি করব?

—যা খুশি তোমার। গয়না গড়িয়ো।

—গয়না তো আছে।

—আরও গড়িয়ো। কিংবা মেয়ে-মহলে মহাজনী ক'রো। অর্থাৎ স্ত্রীলোক-মহলে টাকা ধার দিয়ো। ইচ্ছে হয় কাউকে দিয়ো। আমি দিচ্ছি, 'না' বলতে নেই।

তিনি আর কোন কথা না ব'লে টাকার থলিটি নিয়েছিলেন। এর দশ-এগারো মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। মারা যাবার পর তাঁর গয়নার বাক্স খুলে সোনা রূপাও নগদ সঞ্চয়ের হিসাব করতে গিয়ে সে থলিটিও পাওয়া যায়। পিতামহ থলিটি বেঁধে দিয়েছিলেন পাটের অর্থাৎ রেশমের গুচ্ছ দিয়ে। দেখা যায় সেই রেশমের গুচ্ছ, তাঁর বেঁধে দেওয়া বাঁধনটি ঠিক তেমনিই আছে। খুলে দেখা যায় এক হাজার টাকার একটি টাকা খরচ হয় নি অথবা একটি টাকা তাতে যোগ হয় নি।

তাঁর মৃত্যুর বৎসর খানেক পরে আমার বাবার জন্ম। বেশী-বয়সের একমাত্র সন্তানের প্রতি আমার পিতামহের স্নেহের দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। দুর্বলতার আরও অবশ্য একটি কারণ ছিল। আমার পিতামহী অতি অল্পবয়সেই মারা যান। আমার বাবার বয়স তখন চার-পাঁচ। মাতৃহীন একমাত্র সন্তান অত্যন্ত আবদারে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার উপর আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল প্রচণ্ড সবল। সিউড়ীতে জেলা-স্কুল তখন স্থাপিত হয়েছে। সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। পড়াশুনায় বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তবুও তিনি অত্যন্ত অল্পবয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেন। এর জন্য তিনি পরে বহু অনুতাপ করেছেন। তিনি স্কুলে লেখাপড়া অবশ্য করেন নি, কিন্তু পরে ঘরে যথেষ্ট শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। নিজে তিনি নিয়মিতভাবে সেকালে নিজের ডায়রী রেখে গেছেন। তাঁর ডায়রী থেকেই খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিলাম, তা থেকেই তাঁর স্কুল ছাড়ার বিবরণ এবং পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে তাঁর মর্মপীড়ার আভাস পাওয়া যাবে। তা থেকেই পরিস্ফুট হবে—সেকালের খানিকটা যে খানিকটার পটভূমিতে আমি বেড়ে উঠেছি।—

"আমার বয়স পাঁচ বৎসর হইলে পিতা আমার হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মাতৃহীন বালক এবং বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া বিদ্যার জন্য বা কোন বিষয়ের জন্য কখনও কোন শাসন করিতেন না। আপন বক্ষে রাখিয়া পালন করিতেন। আমার সাত আট বৎসর বয়সে প্রথম বাংলা স্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়া দেন; একখানি ঠেলাগাড়ী করিয়া স্কুলে যাইতাম। ক্রমে বীরভূম গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলে ভর্তি হইলাম। বাল্য-কালে আমার বুদ্ধি এরূপ সুতীক্ষ্ণ ছিল যে একবার মাত্র পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যাইত। ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান আমার নির্দিষ্ট ছিল। পরে ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডবল প্রমোশন পাইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। এই সময় আমার বয়স ষোল এবং এই বৎসরই—১২৮৬ সালে আমার প্রথম পরিণয় হয়।...

"ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে, ডবল প্রমোশন লইয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিয়া আমার বিশেষ পড়ার আবশ্যক ছিল। কিন্তু প্রমোশনের ২।১ মাসের মধ্যেই আমার ইস্কুলে অনেক কামাই হয়, পড়াশুনাও করা হয় না। তাহাতে আমার ক্লাসের পড়া পড়িতে একটু কষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি বলিয়া কোনরূপে পড়া চালাইতেছিলাম, কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রথম বা দ্বিতীয় আসন রাখিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য মনে বড় কষ্ট ছিল। এই সময়ে আবার একটি কাণ্ড ঘটিল। সামার ভেকেশনে লাভপুর আসিলাম কিন্তু ইস্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে সিউড়ী যাওয়া হইল না। নবীন ভাইপোর বিবাহ মঙ্গলডিহি গ্রামে, ওই বিবাহ জন্য থাকিয়া গেলাম। ১০।১২ দিন কামাই হইয়া গেল। এই আমার জীবনের সুখ বা উন্নতির পথে কাঁটা পড়িল। এই দশ বারো দিন কামাই আমার বিদ্যাশিক্ষার মূলে চির-কুঠারাঘাত করিল

কামাইয়ের পর ইস্কুলে গেলে গদাই গরাঞী নামে একজন মাস্টার আমার উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠিল। আমাকে নিত্যই তিন বার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'বাবুর বেটা বাবু—তার ওপর কুলীন, ফাল্গুন মাসে একটা বিয়ে, জ্যৈষ্ঠ মাসে একটা বিয়ে, তোমার আর লেখাপড়ার প্রয়োজন কি? যাও, লেখাপড়া ছাড়িয়া আরও দশটা বিবাহ কর না কেন!' নবীনের বিবাহের কথাটা সে কোনমতেই বিশ্বাস করিত না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবাহ আমিই করিয়াছি। এই বিদ্রূপ ক্রমে আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখ দিয়া জল পড়িত। অন্য ছেলেরা হাসিত। একদিন দুর্দান্ত ক্রোধ হইল, সে দিন গদাই মাস্টার এই ঠাট্টাটি করিবামাত্র বই বগলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—'হাঁ, বিবাহের ব্যবসা করাই আজ স্থির করিলাম, তোমার যদি কন্যা থাকে—তবে তাহাকেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।' এই বলিয়া এক দৌড় দিয়া ইস্কুল হইতে পলাইয়া আসিলাম। বাবাকে বলিলাম—'আমাকে অন্যত্র ইস্কুলে ভরতি করিয়া দিন।' বাবা একমাত্র সন্তানকে বিদেশে পাঠাইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন—'এখানে আমার নিকট থাকিয়া তোমার লেখাপড়া হইল না, তখন বিদেশে পাঠাইয়া কি হইবে? বাহিরে পাঠাইয়া আমিও থাকিতে পারিব না, তুমিও নষ্ট হইবে। তুমি আমার নিকট থাক, নিজেকে সংশোধন কর।'

"বুদ্ধি অর্থ অনুরাগ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও পূর্বজন্মের কর্মফল আমাকে কৌশলে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার জীবনকে সুখশূন্য করিয়া দিল। হায়, বিদ্যাহীন জীবনে ও পশুজীবনে প্রভেদ কি? জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীব যদি স্বীয় বংশোচিত সম্মান প্রতিষ্ঠা

রক্ষা করিতে না পারে তবে তাহার তুল্য দুঃখ কাহার? আমি সেই দুঃখ অহরহ ভোগ করিতেছি।..."।

আমার বাবার ডায়রীর আরও খানিকটা অংশ তুলে দিলেই আমার জীবনের পটভূমি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বাংলা ১৩১০ সালের মাঘ মাসে ৮ই মাঘ ছিল সরস্বতী-পূজা। এ অংশটুকুও ওই দিনের, এবং অংশটুকু আমাকে নিয়েই। বাড়ীতে সরস্বতী-পূজা আছে। সেবার বারবেলার জন্য পূজা আরম্ভ হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল। বাবা ডায়রীতে লিখেছেন—

"বারবেলার জন্য দুই প্রহরের পর ঘট আনাইয়া ৺সরস্বতী মাতার অর্চনা আরম্ভ হইল। বেলা বেশী হওয়ার জন্য তারাশঙ্করকে বলিলাম—'বাবা জল খাও, জল খাইয়া অঞ্জলি দিলে দোষ হইবে না।' বালক বলিল—'কই, আমার তো পিপাসা পায় নাই।' বালকের দেবভক্তি—বিদ্যানুরাগ দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তারাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাবা, মাকে প্রণাম করিবার সময় কি বলিলে?' তাহাতে সে বলিল—'আমি বলিলাম—মা, আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি ডাইনে বাঁয়ে ঢোল দিয়া পূজা দিব—বড় হইয়া পূজায় যাত্রা করাইব—ধুম করিব।' শুনিয়া পুলকিত হইলাম! দেখ বাবা তারাশঙ্কর—জীবনে এ কথা যেন কোন দিন ভুলিয়ো না। অর্থের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছি। পৈতৃক সম্পত্তি সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা সম্মান রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পৈতৃক সম্মান বংশপ্রতিষ্ঠাকে তুমি ফিরাইয়া আনিবে। বহু কীর্তি করিবে। এবং সরস্বতী মায়ের কাছে যে সঙ্কল্প করিলে তাহা বজায় রাখিবে। ব্যবসা করিয়া অর্থ প্রচুর হয়, কিন্তু তাহার মূল্য তত নয়—যত মূল্য বিদ্যাবলে উপার্জন করা অর্থের। আমার বাবার

পাট তোমাকে বজায় রাখিতে হইবে। তুমি উকীল হইবে। আমার বাবা শেষ জীবনে শখ করিয়া শালের সামলা কিনিয়াছিলেন। ঐ সামলা আমি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি—ওই সামলা তোমাকে পরিতে হইবে। এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।"

আরও খানিকটা তুলে দেব। তা হ'লেই আমার জীবনের পটভূমির একাংশ স্পষ্ট হবে। ইংরেজ রাজত্বে যাঁরা ইংরেজী শিখেছিলেন, তাঁরা ইংরেজী-না-জানা লোককে মূর্খ ভাবতেন। ইংরেজী না-জানা লোকরাও ভাবনা-অনুভূতি আচার-ব্যবহার, এমন কি ভারতীয় শাস্ত্র ও তত্ত্বে গভীর অধিকার সত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে এই অপবাদ স্বীকার ক'রে নিতেন। না হ'লে আমার বাবা ইস্কুল ছেড়ে ঘরে শাস্ত্রাদি পাঠ ক'রে সাংস্কৃতিক জীবনকে আয়ত্ত করেছিলেন, তাতে তাঁর বিদ্যার জন্য আক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন। সেকালের সাপ্তাহিক কাগজ—'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী'র তখন প্রবল প্রসার। প্রকাণ্ড সাইজের কাগজ, এক পৃষ্ঠায় শুয়ে অপর পৃষ্ঠা পড়া যেত! দুখানা কাগজই আসত আমাদের বাড়ী। এ ছাড়া সে আমলে তিনি একখানি মাসিক-পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। পত্রিকাখানির নাম ছিল 'হিন্দু পত্রিকা।' তা ছাড়া তাঁর ছোটখাট একটি পুস্তক-সংগ্রহ ছিল। অধিকাংশই ধর্মগ্রন্থ। সংস্কৃত বাংলা দুই ভাষায় লিখিত শাস্ত্র তিনি পাঠ করতেন। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও নানা তন্ত্র তিনি কিনে সংগ্রহ করতেন এবং নিয়মিত পড়তেন। কাব্যে এবং উপন্যাসেও তাঁর অনুরাগ কম ছিল না। তাঁর আমলের কালিদাসের গ্রন্থাবলী আমার কাছে আছে তাঁর সংগ্রহ থেকেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আস্বাদন পাই। তাঁর দিনলিপির মধ্যে প্রত্যহ দুই

লাইন পুনরুক্ত হয়েছে। "স্নানান্তে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আহার করিলাম—পরে বৈঠকখানায় খবরের কাগজ 'হিন্দু পত্রিকা'দি পাঠ করিলাম।" এর পরই কোন দিন পাই—"মহানির্বাণতন্ত্র পাঠ করিলাম" অথবা "যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করিলাম" অথবা "রাণীভবানী নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিলাম" অথবা "আজ কালিদাসের কাব্যরসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইলাম।" জীবনে তাঁর একটি দার্শনিক দৃষ্টিও স্পষ্ট এবং পরিস্ফুট হয়েছিল। আমাদের গ্রামের নূতন ধনী ব্যবসায়ী একটি মজা দীঘি কাটাচ্ছিলেন, সেই দীঘিতে উঠল এক অক্ষত শিলামূর্তি। বাসুদেব দেবতা। এই উপলক্ষ্যে সে দিন দশখানা গ্রামের লোক—কেউ বললে—"এই ঠাকুরই সর্বনাশ করবে, জল-শয়নে ছিলেন—মাছের লোভে ঘুম ভাঙালে, এইবার—" এই সুরের কথাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। যারা অন্য সুরে কথা বলেছিল, তারা বলেছিল—সৌভাগ্য ষোল কলায় পূর্ণ হ'ল। কিন্তু তার পরই মৃদুস্বরে বলেছিল—কলা পাকল।

আমার বাবার ডায়রীতে পাই—"শত শত বৎসর পূর্বে যে দেবতা সে আমলের সেবক প্রতিষ্ঠাতার পরাজয়ের দুর্ভাগ্যের নিয়তিকে স্বীকার করিয়া নিজেও অপমানিত হইয়া পুষ্করিণীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন—তিনি এতকাল পরে উঠিলেন। যখন উঠিলেন তখন নূতন লীলায় প্রকট হইবেন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিতহস্ত ত্রিলোকের পালক বিষ্ণু—বাবুর কীর্তির মধ্যে দিয়া উদিত হইলেন। মনে হইতেছে এ গ্রামে ছোটবড় লইয়া যে বিবাদ-কলহ চলিতেছে —তাহার চরম মীমাংসা হইয়া গেল। ত্রিলোকপালক—কে আশ্রয় করিয়া রায় দিয়া দিলেন যে তিনিই এখানকার লোকপালক হইবেন।"

আর এক স্থানে একদিন—নূতন ধনীর আলোকোজ্জ্বল এক সমারোহের আসর থেকে নিজের অন্ধকার-স্তব্ধ বাড়ীর দিকে এসে তিনি রাত্রির অন্ধকারের গাঢ়তার দিকে চেয়ে যা ভেবেছিলেন তাই লিখেছেন—

"রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে পাই—কালরাত্রিরূপা মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়েছিলেন। আজিকার অমাবস্যার অন্ধকার—আমাদের চারিদিকে যেন তেমনি রাত্রির ছায়া ফেলিয়াছে।"

মোট কথা—বাস্তব সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার ক'রেই জীবনতত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মারা যান অল্প বয়সে। আমার বয়স তখন আট বৎসর। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত ক'রে গিয়েছে। তাঁর মূর্তি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। অত্যন্ত বলশালী দেহ ছিল তাঁর। ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। স্পষ্টভাষী ছিলেন। আমার প্রতি স্নেহ ছিল মাত্রাতিরিক্ত, সর্বদা কাছে রেখে এই ধরনের কথা ব'লে যেতেন। অধিকাংশ বুঝতাম না, কিন্তু সে কথা তিনি ভাবতেন না। তাঁর ডায়রীখানির প্রায় প্রতিটি পৃ ায় আমার নাম আছে। আমাকে সম্বোধন ক'রে কিছু-না-কিছু লিখে গেছেন। চোদ্দ-পনের বৎসর বয়স থেকে ঐ ডায়রী আমি প'ড়ে আসছি। আজকের দৃষ্টি দিয়ে সেকালকে বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমার বাবার ঐ ডায়রী। এই ডায়রী আরও একটা পরিচর বহন ক'রে রয়েছে।

সেটা হ'ল সেকালের ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইয়োরোপের সভ্যতার প্রভাব পড়ার পরিচয়। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের মানুষেরা জীবনের পরিচয় বহন ক'রে আসছে স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে। রাজসিক রুচিতে শিলালিপি তাম্রশাসন রেখে গেছেন রাজন্যবর্গ— গৃহচ্ছদে, মন্দিরে, পোড়ামাটির ফলকের লেখায় বা ঘরের কাঠের ষড়দলে সন তারিখ নাম আছে, তবু এ দেশে জীবনান্তে দেহকে ছাই ক'রে সমস্ত কিছু মুছে দিয়ে যাওয়ারই রীতি। কবিদের কাব্যে নিজের পরিচয় দেওয়া আছে, দীঘির নামেও কীর্তিমানেরা নাম জুড়ে রেখে গেছেন, কিন্তু আত্মজীবনের কথা লেখার রেওয়াজ ছিল না। ভাল-মন্দর বিচার করছি না। সত্য স্বভাবের কথা বলছি। ইংরিজী সভ্যতার প্রভাবেই ডায়রী লেখার রেওয়াজ এসেছিল। ইংরিজী শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ না করলেও আমার বাবার উপর তা পড়েছিল। আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে কীর্ণাহার। সেখানকার জমিদার স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সরকার মহাশয় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু, পুণ্যাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈবাহিক। তিনি আমার পিতামহের বয়সী। তিনি ডায়রী রাখতেন। বোধ হয় আমাদের অঞ্চলে ডায়রী-লেখক হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। শিবচন্দ্রবাবুই আমাদের অঞ্চলে প্রথম হাইস্কুল স্থাপন করেন— জেলার মধ্যে বোধ হয় দ্বিতীয় হাইস্কুল। প্রথম হাইস্কুল সিউড়ী শহরের গবর্ণমেণ্ট স্কুল।

বাবার ডায়রীতেও স্পষ্ট এবং সেকালের শ্রুতি ও স্মৃতিতেও প্রমাণ রয়েছে যে, তখনকার কালের মানুষ ইংরাজের রাজত্বে ইংরিজী সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদরে গভীর বেদনার সঙ্গে ভাল-মন্দ যা কিছু অতীত কালের সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুরানো পুঁথির

দপ্তরে বেঁধে ভাঙা পেঁটরায় পুরে নূতনকে গ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

মন্দ ছিল প্রচুর।

বিশেষ ক'রে মেয়েদের জীবনে। কৌলীন্যের দোর্দণ্ড প্রতাপে তখনও ঘরে ঘরে কন্যারা বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকেন। পিতৃগৃহে তাঁদের অবশ্য দোর্দণ্ড প্রতাপ। আমার 'তুই পুরুষে' নুটুর মুখে আছে, 'ব্রাহ্মণের ভগ্নী উপবীতের চেয়েও বড়, উপবীত থাকে গলায়, ভগ্নীর স্থান মাথায়।' এ সেই আমলের কথা। এক এক কুলীন তখনও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বিবাহ ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে এ রেওয়াজ তখন কমেছে। বিবাহ পেশা যাঁদের, তাঁদের অধিকাংশেরই বাস ছিল পূর্ববঙ্গে—যশোর, খুলনা, বিক্রমপুর। আমরাও কুলীন। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে বিবাহ তখন নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সন্তান না হ'লে দু-তিন বিবাহরীতি অবশ্য তখনও বর্তমান। তখনকার দিনে সন্তানহীনা স্ত্রী বংশরক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিতেন, তার পিছনে ছিল সমাজের উৎসাহ; এমন স্ত্রী সমাজে অজস্র প্রশংসায় ধন্য হতেন। এ সব অবশ্য সম্পত্তিশালী লোকের ঘরেই ঘটত।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আমাদের গ্রামের কুটুম্ব ছিলেন। আমাদের গ্রামে মধ্যে মধ্যে যেতেনও। তিনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লিখে যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, আমাদের ওখানে সে প্রশংসা উপলব্ধি করার মত লোক ছিল না এমন নয়, ছিল; কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নি বা এমন লোক কখনও আর বিবাহ করবেন না—এই উপলব্ধির প্রশংসাটাই ছিল বড়। তাই তিনি যখন আবার বিবাহ করেন, তখন লোক তাঁকে

আর সে প্রশংসা দিত না। তিনিও দ্বিতীয় বিবাহের পর আর বড় একটা সম্পর্ক রাখেন নি লাভপুরের সঙ্গে।

এমনি যখন দেশের পটভূমি পরিবর্তনমুখী, তখন আমাদের ঘরের পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে গেল খানিকটা দ্রুততর গতিতে। আমাদের ঘরে এলেন আমার মা। তখন আমাদের সংসারের উপর দিয়ে একটা বিপর্যয় চ'লে গেছে সদ্য-সদ্য। আমার পিসীমা ছিলেন পাঁচজন। তাঁদের তিনজন মারা গেছেন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। এক পিসীমা একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্রকে হারিয়ে ঘরে এসেছেন। আমার বড় মা মারা গেলেন। তারপরই এলেন আমার মা। পাটনা শহরের প্রবাসী বাঙালী ঘরের মেয়ে, বাপ ইংরিজী-নবিস সরকারী চাকুরে। শুধু এইটুকু বললেই বলা হ'ল না। তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে। তখনও পিতার এক পুত্র আমার বাবা মদ্যপানে মাত্রা ছাড়ান, ক্রোধে আত্মহারা হন। আমার পিসীমা একদিনে স্বামীপুত্র হারানোর বেদনায় ক্ষোভে অধীর-চিত্ত, অসহিষ্ণু প্রকৃতি, অনির্বাণ চিতার মত উত্তপ্ত। আমাদের সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আছে সবই, কিন্তু শ্রী নাই, মাধুর্য নাই, এমন কি সেবাও নাই—কেউ অসুস্থ হ'লে সে একা বিছানায় রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, ঝি-চাকরে এক গ্লাস জল রেখে যায়, কবিরাজ-বাড়ী থেকে ওষুধ আসে কিন্তু অনুপানের অভাবে, ওষুধ মেড়ে তৈরি করার অভাবে নিয়মিত খাওয়া হয় না। রোগীর যন্ত্রণা তার পীড়িত মনের ক্ষুব্ধ চীৎকারে গোটা বাড়ীতেই নিজের রোগটা সংক্রামিত ক'রে দেয়, এমনি অবস্থা।

আমার মা এলেন আমাদের বাড়ীতে। বয়স তখন পনেরো। পনেরো বছরের মেয়েটি বাড়ীতে পা দেবা মাত্র গোটা বাড়ীটার চেহারা ফিরে গেল। বাবার সমস্ত ঔদ্ধত্য মহিমময় গাম্ভীর্যে পরিণত হ'ল; পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি যেন শান্ত হয়ে সাধনা-মগ্ন হলেন। কৌলিক এবং দেশের মাটির যে সাধনা ও ঐতিহ্য রক্তের মধ্যে মানুষ বহন করে, তাঁর মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করল; বর্ষার ভাঙনের খেলায় উন্মত্ত, ভাঙা মাটির রক্তের বন্যার উচ্ছ্বাসে ভরা ভৈরব নদ যেন শরৎকালের ব্রহ্মপুত্রে রূপান্তরিত হ'ল। পিসীমা সেবায় স্নেহে ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে এলেন। বাড়ীর শ্রী ফিরল। নিজের রুচিমত তিনি ঘরগুলি সাজালেন।

বাড়ীতে আমাদের কাঁঠালকাঠের আলমারি খাট চেয়ার টেবিলের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাতে কোন রঙ দেওয়া ছিল না। দেশে তখনও রঙের চলন হয় নি। বড় বড় দালান-বাড়ীর দরজায় জানলায় আলকাতরা দেওয়া হ'ত। ব্যবসায়ী ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর বাড়ীর দরজায় জানলায় সবুজ রঙ এসেছে এবং কলকাতার দোকানের বার্নিশ-করা ফার্নিচারও কিছু কিছু এসেছে। আমার মা এসে বাবাকে বললেন, এই খাট আলমারিগুলিতে বার্নিশ দিলে বড় ভাল হয়।

—বার্নিশ? সে দেবে কে?

—দেবে ছুতোর মিস্ত্রীতেই; তুমি কিছু শিরীষ কাগজ আর ফ্রেঞ্চ বার্নিশ সিউড়ী বা কলকাতা থেকে আনিয়ে দাও।

—আমাদের এখানকার মিস্ত্রীরা ও কাজ পারবে না।

—পারবে। আমাদের পাটনার বাড়ীতে বার্নিশ করানো হয়। মিস্ত্রীদের বার্নিশ করা দেখেছি আমি। আমি ব'লে দেব। তোমাকে ব'লে দেব—তুমি মিস্ত্রীদের বুঝিয়ে দিয়ো।

তাই হ'ল। সাজিমাটি দিয়ে আসবাবগুলি ধোবার সময় অনেকে বললে, গেল—কাঠগুলোর দফা গয়া হ'ল।

কিন্তু বার্নিশ শেষ হ'লে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল, বললে—কে বলবে সেই জিনিস? গয়ায় পিণ্ড পেয়ে প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়ে নবজন্ম নবকলেবর লাভ করলে জিনিসগুলি। তারপর ঘরে রঙ দেওয়ালেন। বাবার বইগুলিকে পাঠালেন সিউড়ীতে দপ্তরী-বাড়ী। বেঁধে এল সেগুলি। পুরানো ছবিগুলির সঙ্গে কিছু নতুন রবিবর্মার ছবি কিনে নতুন ক'রে পেরেক পু'তে টাঙালেন সেগুলি, ব্রাকেটগুলিও নতুন বন্দোবস্তে টাঙালেন। ঘরে দেওয়ালে আলমারির তাক ছিল—দরজা ছিল না। সে তৈরী করালেন, কাচ বসালেন। বালিশে ঝালর-দেওয়া ওয়াড় তৈরী ক'রে পরালেন। বাক্সের ঘেরাটোপ হ'ল। বাবার বাগানের শখ ছিল, ফুল হ'ত প্রচুর। পূজার জন্য তোলা হ'ত, এখন থেকে ফুলের মালা হতে শুরু হ'ল, বিগ্রহের জন্য আগে—তারপর মানুষের জন্য। রূপার ডিসে লম্বা গেলাসে সাজানো হতে লাগল।

বাড়ীখানিতে যেন তাঁর প্রতিবিম্ব ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ায় খবর রটল। মেয়েরা এসে দেখে গেলেন। এমন কি স্বর্গীয় যাদবলাল-বাবু একদা বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলেন—হরিমামা, আমি আপনার ঘর দেখতে এলাম। শুনলাম বাঁকীপুরের মামী নাকি চমৎকার ঘর সাজিয়েছেন। আমি দেখব।

তিনি দেখে গেলেন।

তাঁর বাড়ীও নতুন ছাঁদে সাজল। অনেক উজ্জ্বলতর শ্রী এবং শোভা হ'ল অবশ্য আয়োজনের মহার্ঘতায়, ঝাড়-লণ্ঠনের শতেক বাতির আলো সেখানে জ্বলল। কিন্তু কেরোসিনের কালি-পড়া ডিবের বদলে ঘরে মোমবাতির আলোর প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন আমার মা।

আমার মায়ের আগে আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন মায়েরই মামাতো দিদি। আরা শহরের বিখ্যাত উকিলের মেয়ে। তিনিই করতে পারতেন এ রেওয়াজের প্রবর্তন ; তাঁরও ছিল অনেক গুণ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁর গুণপনা কার্যকরী হয় নি। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আমাদের গ্রামের এক অতি দরিদ্র-সন্তানের সঙ্গে। দরিদ্র-সন্তানটি নিজের শক্তিতে অধ্যবসায়ে এবং যাদবলালবাবুর আনুকূল্যে (যাদবলালবাবুর উপর নির্ভরশীল আত্মীয় ছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। আবার এই উকীলটি সন্ধান ক'রে ছেলেটিকে বের ক'রে তারই সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু অকালে তিনি মারা গেলেন ; শুনেছি মৃত্যুর দু-তিন দিন পরেই ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর নিয়োগপত্র এসেছিল অদৃষ্টের পরিহাসের মত। তারই ফলে তিনি তাঁর গুণপনার প্রভাব ছড়াতে পারেন নি ; দারিদ্র্যদোষ গুণরাশিকে নাশ করে, এর চেয়ে সাধারণ সত্য আর নাই। শুধু তাই নয়, তিনি অকালবৈধব্যের বেদনায় বোধ করি তাঁর প্রভাব ছড়াতেও চান নি।

মোট কথা, কাল-পরিবর্তনের ক্ষণে আমার মা আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে প্রসন্না শক্তির মত কাজ করেছেন। শুধু রুচির দিক থেকেই নয়, ভাবের দিক থেকেও তাঁর মধ্যে তিনি এনেছিলেন নূতন কালকে। আমার জীবনে মা-ই আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করে নি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে। ওই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, 'আকাশলোকে বেড়ে চল, সূর্য-আরাধনায় যাত্রা কর। তুলে ধর তোমার জীবন-পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য।'

আমার মায়ের দেহবর্ণ ছিল উজ্জ্বল শুভ্র। আর তাতে ছিল একটি দীপ্তি! চোখ দুটি স্বচ্ছ, তারা দুটি নীলাভ। কথাবার্তা অত্যন্ত মিষ্ট, প্রকৃতি অনমনীয় দৃঢ়, অথচ শান্ত। আর আছে জীবন-জোড়া একটি প্রসন্ন বিষণ্ণতা। সেটা তাঁর অনাসক্ত প্রকৃতির বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। আমার মা যদি উপযুক্ত বেদীতে দাঁড়াবার সুযোগ পেতেন তবে তিনি দেশে বরণীয়াদের অন্যতমা হতেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পড়াশুনা তিনি যথেষ্ট করেছেন। পিত্রালয়ে পাটনার স্কুলে নিচের ক্লাসে—বোধ হয় আপার প্রাইমারি ক্লাসে পড়ার সময় বিবাহ হয়; পল্লীগ্রামে রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হয়ে সংসারের শত সহস্র কর্মের মধ্যেও তিনি তাঁর পড়াশুনা ক'রে গেছেন। আমার বাবার বয়স তখন সাতাশ, মায়ের বয়স পনের, এই দিক দিয়ে অর্থাৎ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়েই তাঁদের মানসিক মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। এই কারণেই আমার বাবার মত প্রবল-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে শান্ত সংযত বেগবান প্রবাহে পরিণতি তিনি দিতে পেরেছিলেন। তিনি শিষ্যার মত স্বামীর কাছে ধর্মশাস্ত্র পড়েছিলেন। সেকালের উপন্যাসগুলি সবই পড়েছিলেন; পুরাণ রামায়ণ মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ; কবিকঙ্কণ চণ্ডী-মঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল পড়েছেন। হরিবংশ, ভাগবতের অনুবাদ, কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, কল্কিপুরাণ,—এ সবও পড়েছেন। মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমাসম্ভব, পলাসীর যুদ্ধ, রৈবতক, বৃত্রসংহার—এগুলিও সে আমলে পড়েছেন তিনি। আজ তাঁর বয়স সত্তর। ছেলে সাহিত্যিক হওয়ায় এ আমলে কিছু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, সরোজ রায়চৌধুরী এবং আমার লেখাও পড়েছেন। সেদিন নারায়ণ গাঙ্গুলীর বই পড়ছিলেন দেখেছি।

আজও তাঁর পড়াশুনার অভ্যাস অটুট আছে। এবং সে অভ্যাস বিচিত্র। অম্বলের ব্যাধির জন্য আফিং খান। সন্ধ্যার সময় আফিঙের ঝোঁকে একবার শুয়ে পড়েন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ওঠেন, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে নিজে বসেন একটি হ্যারিকেন সামনে রেখে একখানি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। রাত্রের এ পাঠই তাঁর সত্যকার পাঠ। এবং এ সময়ে রামকৃষ্ণকথামৃত বা অন্য কোন শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু পড়েন না। এমনও দেখেছি যে, রাত্রি দুটো, আলো জ্বলছে, মা পড়ছেন। কোন কোন দিন দেখেছি, সেই রাত্রে ভাঁড়ার ঘরে আলো জ্বলছে, মা ঘুরছেন ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর পেয়েছি, 'বইখানা শেষ হ'ল; শুলাম, ঘুম এল না, তাই কি করব? কাজ সেরে রাখছি।' কোন দিন দেখেছি বই বন্ধ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন! বলছেন, 'বইখানা এই শেষ হ'ল। ভাবছি।'

তাঁর হস্তাক্ষরও অতি সুন্দর। বানান নির্ভুল, ব্যাকরণেও ভুল করতেন না। আজকাল লেখার পাট প্রায় তুলে দিয়েছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল প্রায় বার-চোদ্দ বৎসর আমাদের বাড়ীর খসড়া জমাখরচের খাতা তিনি নিজে হাতে লিখেছেন; সে খাতাগুলি আজও আছে। পৃষ্ঠাগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কত-বার মামলার দাখিল কাগজে তাঁর সই বা লেখা দেখে বিচারক সন্দেহ প্রকাশ করছেন, এ কোন মেয়ের হাতে লেখা হতে পারে না। তেমনি তাঁর সাহস। অনুরূপ স্থৈর্য।

আমাদের বাড়ীর পশ্চিম ভাগে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ। ছটি শিবালয়, নাটমন্দির, দুর্গামণ্ডপ, কালীমণ্ডপ, নারায়ণের মন্দির, তার মধ্যে অনেকটা খোলা জায়গা। শিবালয়গুলির কোণে একটি

বুড়া কামিনীফুলের গাছ, গাছটিতে চ'ড়ে আমরা ছেলেবেলায় সমবেত জনতার মাথার উপর দিয়ে বলিদান দেখতাম। একদা রাত্রে আমার শোবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি—মা দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। প্রশ্ন করতেই নীরবে দেখিয়ে দিলেন কামিনীগাছটাকে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দেখলাম —কামিনীগাছের গুঁড়িটির যেখান থেকে ছুটি ডাল বেরিয়ে পৃথক হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্তি। মধ্যে মধ্যে গাছের ডাল ছুটিকে নাড়া দিয়ে দোলাচ্ছে। শিউরে উঠলাম। তারপর তিনি নিচে নামলেন। প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাবে? তিনি আঙুল বাড়িয়ে ওই ছায়ামূর্তি দেখিয়ে দিলেন।

—সে কি?

—দেখে আসি।

তিনি বাইরের দরজা খুলে তখন এগিয়েছেন। আমাকে অগত্যা অনুসরণ করতে হ'ল। খানিকটা গিয়ে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—জ্যোৎস্না। কালো গাছের ফাঁকটায় জ্যোৎস্না পড়েছে।

সত্যিই তাই। কাছে গিয়ে দেখলাম, গাছের ফাঁকটি এই রাত্রে পল্লবের কালো রূপের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক মানুষের আকার নিয়েছে।

একবার আমাদের খিড়কিতে একটি শেওড়াগাছের মধ্যে ছুটো জ্বলন্ত চোখ দেখে এগিয়ে গেলেন তার তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য।

সবচেয়ে তাঁর সাহস এবং স্থৈর্য দেখেছি সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সাপের সম্মুখে। আমাদের বাড়ীতে অর্থাৎ জ্যেঠ পিতামহের বাড়ীতে ও আমাদের বাড়ীতে গোখুরা সাপের প্রাচুর্ভাব বেশি। আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রেই দেখে আসছি। গ্রীষ্মকাল থেকে শীতের

প্রারম্ভ পর্যন্ত অন্ততঃ চার-পাঁচটা বড় বড় গোখুরা মারা পড়েই প্রতি বার। এর সঙ্গে কয়েকটা চিতি, মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর দু-একটা চন্দ্রবোড়া। এক এক বৎসর বাড়ীর কাছেপিঠে বাচ্চা হ'লে বিশ-ত্রিশটা গোখুরার আধ হাত থেকে হাতখানেক লম্বা বাচ্চাও মারা পড়ে। একবার তিন-চার দিনে তেতাল্লিশটা বাচ্চা বেরিয়েছিল। সেবার প্রথম বাচ্চাটা দেখা দিয়েছিল মায়ের পায়ের উপর। রোয়াকে উঠানে পা ঝুলিয়ে মা ব'সে আছেন, গরমের সময়, এখানে ওখানে ব'সে আছেন আরও সকলে। মা কথা বলতে বলতে স্থির হয়ে গেলেন। কথাও বলেন না' নড়েন না, মাটির মূর্তি যেন।

পিসীমা ডাকেন—বউ!

উত্তর নাই।

—মা!

উত্তর নাই।

কে যেন শঙ্কিত হয়ে তাঁর গায়ে হাত দিতে উদ্যত হতেই তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন—সাপ।

কোথায়?

—আমার পায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে। চুপ কর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বলেন—আলো। পা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুতপদে একটা আলো নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, উঠান এবং রোয়াকের কোলের নালা বেয়ে চলেছে গোখুরা সাপের শিশু; আলো এবং মানুষের চাঞ্চল্যে তার মনোহর চক্র প্রসারিত ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াল। মা হাসলেন, কিছু বললেন না।

আশ্চর্য তাঁর এই সাপ সম্পর্কে সজাগবোধ। ঘরে সাপ বের হ'লে তিনি ঘরে ঢুকবা মাত্র বুঝতে পারেন। মাটির উপর

সাপের বুকে হাঁটার একটা শব্দ আছে। সে শব্দ যত মৃদুই হোক তাঁর কানে ধরা পড়তই। পড়ত এই কারণে বলছি যে, আজকাল মায়ের কানের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। তাতেও তিনি বুঝতে পারেন বিচিত্র পর্যবেক্ষণশক্তিতে। ভাঁড়ার ঘরেই সাপ বের হয় বেশি। সাপ ঘরে স্থির হয়ে থাকলেও তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বলেন—আলোটা দেখি। ঘরে বোধ হয় সাপ রয়েছে।

আলো না নিয়ে ঘরে ঢোকাটাই তাঁর অভ্যাস। হাজার ব'লেও আলো নেওয়ার অভ্যাস তাঁর হয় নি। আলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি সাপের সন্ধান করেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বের করেন—ওই, ওই। কোন ক্ষেত্রে চ'লে যায় সাপ আলোর ছটা পেয়ে, কোন ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ে, মা আলো সামনে রেখে গতিরোধ ক'রে আমাদের বলেন—লাঠি আনো, মারো। ক্ষেত্রবিশেষে বেদে ডাকানো হয়। বেদে ধ'রে নিয়ে যায়।

যে সাপ স্থির হয়ে থেকে গর্জন না ক'রে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে চায়, অন্ধকারেও তার অস্তিত্ব কেমন ক'রে তিনি বুঝলেন, এ প্রশ্ন প্রথম জীবনে সবিস্ময়ে একদিন করেছিলাম—কি ক'রে বুঝলে তুমি ?

হেসে বলেছিলেন—ঘরে ঢুকেই দেখলাম সব স্থির। আরসুলারা উড়ছে না, ইঁদুর দলের নাচের আসর বসে নি; বুঝলাম, ঘরে নিশ্চয় এমন কেউ এসেছেন যাঁর সামনে এ সব বেয়াদপি চলে না। ভীষণ শাসন তাঁর।

আরও তত্ত্ব আছে, সে তত্ত্বটি সকল সময় ধরা পড়ে না। সাপ ও সাপিনীর মিলনের সময় সাপিনীর গায়ের কাঁঠালীচাঁপার

গন্ধের মত গন্ধ বের হয়। এই গন্ধের তথ্যও তিনিই আমাকে বলেছিলেন। বেদেদের কাছে তথ্যের তত্ত্ব অবগত হয়েছিলাম পরে। এর সমর্থনও পেয়েছি সাপের সম্পর্কে যাঁরা বই লিখেছেন তাঁদের বইয়ে।

এই দিক দিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সাহসের আর দুটি কথা বলব। যদি নিজের মায়ের কথা কিছু বেশীই বলা হয়, তবু মার্জনা পাব ভরসা আছে।

আমার আট বছর বয়সের সময় আমার বাবা মারা যান। তারপর আমাদের বাড়ীর অভিভাবক হয়ে আসেন আমার বাবার মাতুল। তাঁরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না—তাঁর ওই ভাগিনেয়টি ছাড়া। আমাদের ভাগ্য—বৎসর চারেক পরে তিনিও মারা গেলেন এবং আমরা সংসারে হলাম একান্তভাবে পুরুষ-অভিভাবকহীন। বাড়ীতে নায়েব একজন এবং আমার ভাইদের পড়াবার জন্য একজন মাস্টার গৌর ঘোষ, তা ছাড়া চাকর ও চাপরাসী। এ ছাড়াও গরু বাছুরদের পরিচর্যার জন্য দু তিন জন বাউরী জাতীয় চাকর। বৈঠকখানার উঠানে ধানে বোঝাই মরাই তিন চারটি। কয়েকদিন পরেই চাপরাসী, নায়েব, চাকর এবং গৌর ঘোষদের মুখপাত্র হিসাবে গৌর ঘোষ সবিনয়ে মাকে বললেন—মা, অপরাধ নেবেন না; একটি কথা বলব। পিসীমাকে বলতে সাহস হয় না, উনি রেগে উঠে হয়তো—

—কি বল?

—বৈঠকখানায় তো টেঁকা কঠিন হ'ল মা।

—কেন? ব'লেই মা বললেন—ও! ভয় পাচ্ছ তোমরা?

—হ্যাঁ মা। কর্তা বোধ হয়—

অর্থাৎ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

এতক্ষণে নায়েব বললেন—সমস্ত রাত্রি, যে ঘরে তিনি মারা গিয়েছেন, সেই ঘরে হট-হট শব্দ হয়, চেয়ার খাটে যেন কেউ বসেন উঠেন। ভয়ে মা শরীর হিম হয়ে যায়।

পিসীমা শুনেছিলেন কথাটা। তিনি প্রথমটা রাগই করলেন।

তাঁরা সভয়ে চ'লে গেলেন। আধ ঘন্টা পরে ফিরে এসে চুপি-চুপি ডাকলেন—মা! পিসীমা!

—কি?

—দয়া ক'রে একবার আসুন, নিজের কানে শুনে যান।

মা উঠলেন, পিসীমাকেও উঠতে হ'ল।

বৈঠকখানার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কান পেতে রইলেন।

হট্-হট্! খট্-খট্। তার পর দুম শব্দ উঠল।

যে ঘরে বাবার মাতুল মারা গিয়েছিলেন, সেই ঘরের মধ্যে। সকলে আঁতকে উঠলেন। মা কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ঘরটার তালা খুললেন। আলো নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। দেখলেন, সত্য সত্য চেয়ার টেবিল স'রে ন'ড়ে গিয়েছে। একটা চেয়ার উল্টে প'ড়ে আছে।

পিসীমা সকাতরে বললেন—বউ, কি হবে?

মা কোনও উত্তর দিলেন না। চারিদিক দেখলেন—তার পর আবিষ্কার করলেন একটি জানালা একটু খোলা রয়েছে। তিনি এগিয়ে গেলেন, জানালাটি বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে খিল এঁটে দিয়ে বললেন, সমস্ত জানালার খিলে একটা ক'রে পেরেক এঁটে দিন দেখি।

দেওয়া হ'ল। তারপর বললেন—এইবার দেখুন।

দুদিন পর আবার তাঁরা বললেন—মা, ওই ক'রে কি অশরীরীর উপদ্রব বন্ধ হয়?

—আবার হচ্ছে ?

—ঘরে অবশ্য কিছু হচ্ছে না। সমস্ত রাত্রি চালের উপর চ'লে বেড়াচ্ছেন। মচ মচ শব্দ হচ্ছে! ,পরের দিন মা একটা পেয়ারা গাছ কাটিয়ে দিলেন। গাছটা ছিঃ: বাড়ীর বাইরে। কিন্তু ডাল এসে পড়েছিল চালের উপর।

এবার সবই বন্ধ হ'ল। তাঁরা বললেন—বুঝতে পারি নি মা। ওই মরাইয়ের ধান নেবার উদ্যোগ পর্ব হচ্ছিল। যাতে ভয় পাই শব্দ হ'লেও না উঠি।

কিন্তু সেই দিন রাত্রেই বাড়ী থেকে খেয়ে বৈঠকখানায় ফিরেই তাঁরা সদলে চাৎকার ক'রে উঠলেন। গৌর ঘোষ খুব উঁচু দরের ভূতের গল্প বলিয়ে ছিল—সে বাড়ীর ভেতর পর্যন্ত ছুটে এসে প'ড়ে গেল।

—কি হ'ল ?

—প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গাছের উপর কর্তা 'ধাঁপ' ব'লে লাফিয়ে পড়লেন।

—বল কি ? মা বের হ'লেন।

—বউ, যেয়ো না। বউ! পিসিমা ডাকলেন।

বউ শুনলেন না। গিয়ে যে কাঁঠাল গাছটার উপর কর্তা লাফিয়ে পড়েছিলেন, মাথার উপর আলোটা তুলে সেই গাছটার উপর আলো ফেললেন।

'ধাঁপ' শব্দ ক'রে এবার লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লেন তিনি। তিনি কর্তা নন। পাউষ বিড়াল একটা। এক ধরণের বন্য বিড়াল। অবিকল 'ধাঁপ' ব'লে চিৎকার করে। সকলেই তখন বললে—বললাম গৌর, ভাল ক'রে দেখ। তা না, ছুটে চ'লে গেলে বাড়ী।

গৌর বেচারা তখন একপাটি চটির অন্বেষণে ব্যস্ত থেকে

লজ্জা থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করছে—এক পাটি আবার কোথায় গেল? কি বিপদ।

বিপদই বটে। ছুটে পালাবার সময় ছটকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে হাত দশেক দূরে মালতী লতার ঝোপের মধ্যে।

মায়ের এই সাহস আমার পক্ষে বিপদের হেতু হয়েছিল এক সময়। প্রথম সিগারেট খেতে শিখি তখন। রাত্রে বৈঠকখানায় অন্ধকারে আরাম ক'রে সিগারেট খাচ্ছি। হঠাৎ হাত পড়ল পিঠে। ফিরে দেখি মা দাঁড়িয়ে। কখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছেন। চমকে উঠলাম। হাত থেকে সিগারেট প'ড়ে গেল। মা বললেন—ছি!

তারপর চ'লে গেলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে তিনি যেন আগলে ফিরতেন আমাকে। সর্বাপেক্ষা রাগ হ'ত এবং বিপদ হ'ত আমার উপন্যাস পড়া নিয়ে। তখন যা পাই পড়ি। পড়ি না শুধু পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু প্রতি বই পড়তে গিয়েই ধরা পড়ি তাঁর কাছে। তাঁরও ক্লান্তি নেই, আমারও ক্লান্তি নেই। অথচ এই গল্পের প্রতি আমার অসাধারণ আসক্তির মূল তিনি। তিনি আমার গল্পের আসক্তি জন্মিয়েছেন। অসাধারণ তাঁর গল্প বলার শক্তি ছিল। আমি আমার জীবনে চার জন প্রথম শ্রেণীর গল্প বলিয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথম আমার মা। যেমন বলতে পারতেন গল্প, তেমনি অফুরন্ত ছিল তাঁর ভাণ্ডার। অনেক গল্প আজও মনে আছে। আজও কানে বাজছে—

“কোথা গো মা কাজলহারা
মুছাও আমার অশ্রুধারা

প্রাণে মারবে মুক্তাহারা
আসবে রাজা মিনকোহারা
পত্নীহারা কন্যাহারা—
চোখের জলে ভাসবে ধরা।”

“রাজা মিন্‌কোহারা মস্ত রাজা। দুই রাণী তাঁর, মুক্তাহারা আর কাজলহারা। মুক্তাহারা বন্ধ্যা, কাজলহারার একটি মাত্র কন্যা—ননীর পুতলী, যেমন লাবণ্য তেমনি রূপ। মিন্‌কোহারা গেলেন দিগ্বিজয়ে। সুযোগ পেলেন মুক্তাহারা তাঁর সতীনের উপর হিংসা চরিতার্থ করবার। কাজলহারা কিন্তু অত্যন্ত সরলা। তিনি দিদি বলেন মুক্তাহারাকে। ভক্তি করেন, বিশ্বাস করেন। সুযোগ নিলেন মুক্তাহারা, মিষ্ট কথায় কাজলহারাকে ডেকে বললেন—আয় কাজল. তোর চুল বেঁধে দি। কাজলহারা দিদির সমাদরে উৎফুল্ল হয়ে চুলের গুছি দড়ি নিয়ে ছুটে এসে বসলেন ছোট আদুরে মেয়েটির মত। মুক্তাহারা অবিকল সাপের মত আকার দিয়ে বাঁধলেন বেণী, তারপর একটি মন্ত্রপূত শিকড় তাঁর খোঁপায় গুঁজে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজলহারা হয়ে গেলেন এক অজগর সাপ। হয়ে তিনি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে নগরের প্রান্তে একটি গাছের কোটরে আশ্রয় নিলেন। পিছন পিছন তাঁর মেয়েটি এসে—সেই কোটরের ধারে ব’সে ঐ ব’লে কাঁদতে লাগল।” এই গল্প। কিন্তু ওই যে রাজকন্যার কান্না—সে কান্নায় শ্রোতারা সকলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলত, আমি কাঁদতাম। আজও আমার মনে আছে, তার সেই বিলাপের অবিকল শব্দবিন্যাস।

গল্প শেষে মা হেসে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে একটি হিন্দী প্রবাদবাক্য বলতেন—বলনেওয়ালা ঝুটা, শুননেওয়ালা

সাচ্চা, অর্থাৎ গল্প যে বলে সে বলে মিথ্যে কিন্তু যে শোনে সে শোনে সত্য।

আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর ডায়রীতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রী—"বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞাপন দ্বারা বঙ্গবাসীকে পরস্পরের হস্তে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বাঁধিতে বলিয়াছেন। সকল বঙ্গবাসীই তাহা পালন করিবে। ইহা দ্বারাই আমরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব। হায়, আজ ৯৫০ বৎসর পরে ঈশ্বরের কি মহিমা যে ভারতের দরিদ্র সন্তানগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে সংকল্প করিয়াছে? হে বিশ্বপিতা, বিশ্বপতি, জগদীশ্বর—হে জগজ্জননী, অসুরদর্পদলনী মা—একবার তোমাদের চির আশ্রিত শরাণাগত ভারতসন্তানগণকে—যাহাদের জন্য তোমরা যুগে যুগে এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া পাপের নাশ করিয়াছ—পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ—অসুর প্রাদুর্ভাব দলন করিয়াছ—তাহাদের শক্তি দাও, তাহাদের হৃদয়ে পুণ্যের আলোক প্রজ্জ্বলিত কর। সত্যধর্ম—হিন্দুধর্মকে গৌরবান্বিত কর। দীনবন্ধো, কৃপা কর—কৃপা কর—কৃপা কর।" অন্যত্র পাই তিনি দেশপ্রেমোদ্দীপক 'পদ' রচনা করেছেন।

আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল অ বাস্তব। তিনি পাটনার মেয়ে। বাস্তব রাজনীতিবোধ তাঁর শুদ্ধমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপরে

নির্ভরশীল ছিল না। আমার বড় মামার মধ্যে মাণিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তী কালে আমার সেজ মামা—তিনি আমার থেকে চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন—তিনি উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদলের দলভুক্ত হয়েছিলেন। অকালে বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্লেগ রোগে মারা যান। পরে বেনারস কন্‌স্‌পিরেসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লিখিত হয়েছে- তাঁর পরবর্তী ছোট ভাইকে তাতে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে।

ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমার বড় মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়ছিলেন—বাংলার মাটি—বাংলার জল---

এই ঘটনাটির উল্লেখ 'ধাত্রীদেবতা'য় আছে। 'ধাত্রীদেবতা'র মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। আমার আত্মীয়া একটি কলেজে-পড়া মেয়ে 'ধাত্রীদেবতা' প'ড়ে বলেছিল—'আপনি নিজের মাকে একেবারে মহিমময়ী ক'রে বই লিখেছেন।' আমার মা সত্যই মহিমময়ী।

আজ তিনি বৃদ্ধা, জীবনের দীপ্তি হ্রাস পেয়ে আসছে। সে আমলের সে দীপ্তিময়ীকে প্রথম দর্শনে চেনা যায় না, তার বদলে দেখা যায় এক অপরিসীম করুণাময়ী নারীকে, যাঁর বুকে আজ সকল আগুন জল হয়ে অক্ষয় সরোবরের সৃষ্টি করেছে। সামান্য জীবজন্তুর কষ্ট দেখা দূরের কথা—শুনলেও সে সরোবরে উচ্ছ্বাস উঠে। আছে শুধু আত্মার সেই আকুতি। সেই আকুতিতে তিনি প্রতীক্ষা ক'রে আছেন মৃত্যু কবে আসবে সেই দিনের। এ প্রতীক্ষা জীবনের পরাজয়ের তিতিক্ষায় নয়, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতময়ের সাক্ষাতের প্রত্যাশায়

মা আমার মহিমময়ী। কালের নূতন পদপাতে আলপনায় পদশোভা আঁকবার শক্তি এবং নৈপুণ্য নিয়ে জন্মেছিলেন বা অর্জন করেছিলেন ব'লেই তিনি শুধু মহিমময়ী নন। আরও কিছু আছে। সেটা হ'ল—নূতন পদপাত ক'রে কাল যে নবযুগ-ভঙ্গিতে প্রকট হলেন, তাতেই তাঁর জীবনদর্শন বা ভাবনা গণ্ডীবদ্ধ নয়। যুগভঙ্গিমায় প্রকট কালের মহাকালরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা তাঁর অসীম। নূতনকে আসন ও অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করেছেন; যুগ-ধর্মকে যুগের প্রভাবকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু জীবন-ভাবনায় মানুষ যা চিরদিন ভেবে এসেছে, সে ভাবনা তাঁর গভীর; সেই ভাবনাতেই আজ বৃদ্ধ বয়সে তিনি তন্ময়, তাই সমস্ত কিছুর মধ্যে মানব-জীবনের অমোঘ নীতিবোধটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবন-মন্ত্র; এবং তাঁর আটষট্টি বৎসরের জীবন গঙ্গাধারার মত পবিত্র নিরাসক্তির স্রোতোধারায় অহরহই যেন সদ্যস্নাত। পৃথিবীর সম্পদকে, সুখকে তিনি তুচ্ছ বলেন না, লক্ষ্মীকেই তিনি শক্তিরূপা ব'লে থাকেন, পূজাও দেন, প্রণামও করেন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবতা হলেন বৈরাগ্যের দেবতা শিব।

মায়ের প্রসঙ্গে এই কথা বলছি যখন তখন এ কথাটিও বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে যে, সেকালে এই ভাবনাটি প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছিল। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন, তাঁরা বলেন—এই বোধ বা আধ্যাত্মিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে এ দেশের মানুষের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঐহিক

সমস্যার সমাধানে সমগ্র জাতিটাকেই ক্লীব ক'রে তুলেছিল। ইতিহাসে তার নজীর আছে। হিন্দুর পরাজয়ের আর অবধি নাই, যে এসেছে —শক-হূন, চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, পাঠান মোগল ইংরেজ—সবার কাছেই তাকে হারতে হয়েছে। শুধু কি মানুষেরই কাছে হেরেছে? সরীসৃপ পশু—এর কাছেও হার মেনে এদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করেছে। মনসা পূজা, দক্ষিণরায় পূজা আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। সত্যসত্যই জীবনদর্শন তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল। আধ্যাত্মিকতা পরিণত হয়েছিল তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা-সমারোহে—কোটী কোটী অক্ষম মানুষের 'দেহি দেহি' প্রার্থনা কোলাহলে; ভাবনাও মন থেকে নির্বাসিত হয়ে বাইরে এসে নিয়েছিল অর্থহীন আকার ও অন্ধ সংস্কারের চেহারা।

এ সব স্বীকার ক'রেও কিন্তু আমার মন সেকালকে—কালাপাহাড়ের ভাঙা প্রস্তর বিগ্রহের মত বিসর্জন দিতেও পারে না, শুধু পাথরের পুতুল ব'লে মিউজিয়ামের বস্তু ব'লেও ভাবতে পারে না! ওর মধ্যে কোথায় যেন কি আছে! বিচিত্র বিস্ময়কর কিছু। তেত্রিশ কোটী দেবপূজার শুকনো বা পচা ফুলের রাশির মধ্যে ওই বৈরাগ্যের দেবতা শিবের প্রসাদী নির্মাল্য, অম্লান বিল্বপত্রের মত কিছু। আমার পূজা তাকে না দিয়ে পারি না!

একটু খুলেই বলতে হবে। সে কালেও দেখেছি, আবার আজকের কালকেও দেখছি। সেকালের বিকৃতিকে স্বীকার আমি আগেই করেছি। আবারও করছি। বার বার স্বীকার করছি এবং যে আবর্জনার স্তূপ প'চে উঠে ওই চির-অম্লান দুর্লভ বস্তুটিকে চেপে রেখেছিল তা স্মরণ ক'রেও শিউরে উঠছি। মনে পড়ছে এই জঞ্জাল আমার মাথার চুলে বাসা গেড়েছিল ছেলেবেলায়। ছেলেবেলায়

আমার মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল ছিল। অন্নপ্রাশনের সময় চূড়াকরণের জন্য কয়েকটি দাগ কেটে ক্ষুর বুলানোর পর পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত চুলে আর কাঁচি ঠেকে নি। লম্বা পিঠ পর্যন্ত চুল অনেকে শখ ক'রে আজকাল রাখেন, শখের দায়ে অনেক কিছুই সহ্য হয়; কিন্তু আমার চুল শখের ছিল না। মাথার লম্বা চুলে আঠা বাঁধত, চুল শুকুতে হ'ত, মধ্যে মধ্যে উকুন হ'ত, সত্য সত্যই সে আমার মাথায় ছিল জঞ্জালের বোঝা। একদা চুলের এই জঞ্জাল-স্বরূপ এমন উৎকট ভাবে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করলে যে, সে কথা আর বলবার নয়। একদিন রাত্রে বিনুনি বাঁধা আমার মাথায় আমার তিন বছরের বোন বিষ্ঠা লেপন ক'রে দিলে। গভীর রাত্রে সে এক প্রায়শ্চিত্ত। বিনুনির ছাঁদের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকেছে ময়লা। সেই বিনুনি খুলে সেই রাত্রে স্নান করতে হ'ল। সেই রাত্রে মনে হ'ল আমার, কেন আমি চুল রাখব? কাটবই আমি চুল।

কিন্তু নিরুপায় অসহায় আমি। এ চুল দেবতার কাছে মানতের চুল!

একা আমার নয়, অনেকের মাথায় মানতের চুল থাকত। কারও পাঁচ বৎসর কারও দশ বৎসর, কারও উপনয়ন পর্যন্ত (ব্রাহ্মণদের) চুল বাড়ত, কারও কারও আবার চুলের সঙ্গে জটাও থাকত মানত, জটা তৈরি হ'ত সযত্ন পরিচর্যায়। ঠিক আমারই বয়সী আমার বাল্যসঙ্গী বদি বা বৈদ্যনাথের চুল এবং জটা ছিল তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত। তার উপনয়ন পর্যন্ত মানত ছিল, উপনয়ন হয়েছিল তের বৎসর বয়সে। বেচারী মাথায় রীতিমত খোঁপা বেঁধে ইস্কুল যেত। ওই সময়ে শুনতাম—যখন সে ছোট

ছিল, তখন বয়স্কেরা কৌতুক ক'রে বলতেন—কই, তেঁতুল পড়া দেখাও তো! ব'লেই বলতেন—জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে, জট নড়ে, তেঁতুল পড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে বদির মাথা ঘন ঘন নড়তে শুরু করত, জটা ছুটিও আন্দোলিত হ'ত তেঁতুলের সোঁটার মত। বড় হয়ে লজ্জা পেত বৈদ্যনাথ। হঠাৎ আমার সুযোগ এল এ জঞ্জাল মুক্ত হবার। সে দিন আনন্দের আমার সীমা ছিল না। ব্যক্তিগত জঞ্জাল-জ্বালার অসুখ অসুবিধা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল চুলের বেদনা। এ বয়সের কথা যত কিছু মনে আছে তার মধ্যে চুলের জন্য লজ্জা পাওয়ার কথা মনে আছে। বাইরের লোকে আমাকে দেখে প্রথমেই খুকী ব'লে সম্বোধন করত। একদিনের কথা আজও মনে আছে আমার। তখন আমার বয়স তিন বছর! প্রথম মামার বাড়ী যাচ্ছি পাটনায়। ট্রেনে চড়েছি প্রথম। আদমপুর স্টেশনে যখন ট্রেনখানা এসে প্রথম ঢুকল—সে ছবি আমার মনে জ্বলজ্বল করছে একটা টকটকে লাল ছবির মত। মনে পড়ছে ইঞ্জিনের মুখটায় টকটকে লাল রঙ দেওয়া ছিল আর ঝকমকে সোনার মত উজ্জ্বল পিতলের হরফে কিছু লেখা ছিল। সেই সঙ্গে মনে পড়ছে—কামরার ভিতর বাবা, মা, মায়ের কোলে কয়েক মাস বয়সের আমার বোন এবং আমি। আর মাথায় কালো টুপি পরা এক ভদ্রলোক ব'সে আছে। রেলিং দেওয়া ঘেরা ছোট্ট খোঁচার মত কামরা। ওই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি খোকী, মামা-বাড়ী যাচ্ছ? আমি যে কি লজ্জা পেয়েছিলাম—সে আর কি বলব। হাতে ধ'রে বিনুনি দুটোকে টানতে শুরু করেছিলাম।

গ্রামের অনেক প্রবীণ, যাঁরা নাকি সম্পর্কে ছিলেন ঠাকুরদাদা—

তাঁরা রহস্য ক'রে বলতেন তারাশঙ্করী। বাল্যবন্ধুরাও শুনে কথাটা শিখে নিয়েছিল।

তবুও কাটবার কোন উপায় ছিল না।

মনে মনে দারুণ ভয় ছিল বাবা বৈদ্যনাথের মানতের চুল। এর একগাছি চুল ছিঁড়ে গেলে দেবতা রাগ করবেন।

আজ ভাবি এই সব কথা। সে সব জঞ্জাল আজ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হতে শুরু হয়েছে ভেবে আশ্বাস পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আকুতিতে তাকে খুঁজে-পেতে দেখি। সে আমলকে চোখে দেখেছি—অন্তরে অন্তরেও অনুভব করেছি ব'লেই স্পষ্ট বুঝতে পারি জীবনের হবিকে ভস্মে ঢালার মর্মকথা। আমাদের সমাজের যে সব মানুষ স্বল্প আয়, কিছু কৃষিক্ষেত্র নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চালিয়ে আসছিলেন—তাঁরা অকস্মাৎ সম্মুখীন হলেন এক অভিনব সভ্যতার, যার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরম্ভ হয়ে গেল এক অর্থনৈতিক বিপ্লব। বিপ্লব উপস্থিত হ'লেই বিপর্যয়ের দুঃখ শুরু হয়। সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ ছিল বাইরের জগতে গিয়ে—যে জগৎ গ্রামের অর্থ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখান থেকে অর্থ উপার্জন ক'রে আনা। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল না, সাহসও ছিল না। সে আমলের সুখীর অন্যতম সংজ্ঞাই ছিল অপ্রবাসী। সেই কারণে প্রবাসবাস ছিল দুঃখদায়ক এবং সংসারে যা দুঃখদায়ক তাই ভীতির বস্তু। আর শুরু হয়েছিল শিক্ষা-বিপ্লব। যাঁরা ইংরিজী জানতেন না তাঁদের সম্মুখে বাইরের জগতের পথ ছিল রুদ্ধ; অন্তত তাঁরা তাই মনে করতেন। অথচ ব্যক্তিত্বের যোগ্যতায় তাঁরা আজকের দিনের উচ্চপদস্থের চেয়ে হীন কি অক্ষম ছিলেন না। একালের শিক্ষা তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত

হ'লে সমান কৃতিত্বের পরিচয় তাঁরা দিতে পারতেন। এই অবস্থার মধ্যে প'ড়ে এই সব মানুষই অসহায় হয়ে একমাত্র দৈব বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে ছিল। বিশ্বাস ছিল না নিজের উপর, ভরসা ছিল না রাজশক্তির উপর, সুতরাং একটা ভরসাস্থল ছাড়া মানুষ বাঁচে কি ক'রে? ধর্মের অবস্থা তখন বিকৃত। এই কালে ধর্মের বিকৃত অবস্থাটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই অসহায় মানুষ ক্ষুদ্রতম দুঃখের জন্য দেবতাকে মানত করেছে। এবং মানত করেছে বা করতে চেয়েছে তার সব কিছু। নখ থেকে চুল থেকে প্রিয় আহার্য এবং আরও অনেক কিছু। আমি হাত মানত রাখতে দেখেছি। ডান হাত এক বৎসরের জন্য মানত রেখেছিলেন আমার পিসীমা। ডান হাতখানি দেবতাকে দিয়ে সংসারের সকল কর্ম বাঁ হাত দিয়ে করতেন; প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ঘেমে সারা হচ্ছেন—বাঁ হাতে পাখা চালাচ্ছেন—বাঁ হাত ভেরে গিয়েছে, পাখা রেখে দিয়েছেন, তবু ডান হাতে পাখা স্পর্শ করেন নি।

এক কালের নগর ভেঙে পড়ল জীর্ণ হয়ে, তার চারিপাশের উপবনগুলি সংস্কারাভাবে হয়ে উঠল অরণ্য, সেই অরণ্য শিকড় গজিয়ে ফাটিয়ে ফেললে নগরীর বসতি, দেওয়ালের সেই ফাটলে ফাটলে উড়ে এসে পড়ল গাছের বীজ, প্রাসাদের বসতির মাথায় মাথায় জন্মাল বনস্পতি—তারই মধ্যে যে মানুষের দল বাস করছিল, তাদের চোখে একদা প্রখরতম আলো ফেলে এগিয়ে এল যখন নূতন কাল তখন চোখ তাদের ধেঁধে গেল। উপায়ান্তরহীন হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ ক'রে লুকাতে চাইল ওই ভাঙা নগরীর গহনতম প্রদেশে। ওইখানেই তাদের বাঁচবার আশ্বাস।

অসহায় মানুষেরা মানত করেছে, পূজা করেছে, ভাল করেছে, মন্দ করেছে, যা কিছু করেছে দেবতার নাম নিয়ে। তান্ত্রিক মদ

খেয়েছে কালীমার নাম ক'রে, শৈব গাঁজা মদ সিদ্ধি খেয়েছে শিবের নাম ক'রে, বৈষ্ণব গাঁজা খেয়েছে গোবিন্দের নাম ক'রে। তাদের জন্য বেদনা অনুভব করি। ঘৃণা করতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি। ওই নির্মাল্যের সন্ধান। এই স্তূপীকৃত মিথ্যার মধ্যে সত্য কিছু দেখেছি আমি। হঠাৎ সে সত্য আত্মপ্রকাশ করত। এই যে দেবতার পূজা, বিকৃত ধর্মাচরণের অন্তরালে এত পার্থিব কামনা—এই কামনা অকস্মাৎ দেখা যেত শেষ হয়ে গিয়েছে। সেকালের মানুষেরা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হতেন তখন এই সত্য আত্মপ্রকাশ করত। আজকের দিনে নিজেরাই প্রবীণ হয়ে এসেছি, এই বয়সে একালের অনেক প্রবীণের অন্তিম শয্যার পাশেও উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সেকালের মানুষদের মৃত্যু-সম্মুখীনতার সময়ের রূপ বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। প্রবীণদের কথা বাদই দিচ্ছি; যাঁরা নাকি পঞ্চান্ন ষাট বছর বয়সেও মহাপ্রয়াণ করেছেন, তাঁদেরও শতকরা আশীজনকে আশ্চর্য প্রশান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে দেখেছি; যেটা নাকি একালে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল বললেও অত্যুক্তি হবে না। রোগে যারা অজ্ঞান হয়ে যেতেন, জ্ঞানহীন অবস্থাতেই যাঁদের জীবনান্ত ঘটত, তাঁদের কথা বলছি না। সেকালে পল্লীগ্রামে টাইফয়েড বা ম্যানেনজাইটিস, আকস্মিক হার্টফেলের মৃত্যু বা সন্ন্যাস রোগ বিরল ছিল। মানুষের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পরমায়ুও স্বভাবতই ছিল দীর্ঘ। সজ্ঞানে প্রবীণেরা মৃত্যুকালে প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতেন, পরমাত্মীয়দের নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে যেতেন! একটি কথা সকলেই ব'লে যেতেন—'অধর্ম ক'রো না সংসারে। দুঃখ কাউকে দিয়ো না।' আর বলতেন কে তাঁর কাছে কি পাবে। সে পাওনা

শুধু আর্থিক পাওনাই নয়—অন্যবিধ পাওনাও বটে। বলতেন—'অমুক আমার এই বিপদের সময় মহৎ উপকার করেছিল; আমি তার কিছুই করতে পারি নি, তুমি এই উপকারের ঋণ শোধ ক'রো।' অনেকে আবার ছেলেদের দেনা-পাওনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিতেন সরকারী কর্মচারীদের চার্জ নেওয়ার মত। তাঁর শ্রাদ্ধে কি খরচ করবে, সেও নির্দেশ দিয়ে যেতেন। তারপর হঠাৎ বলতেন—'আর না। দাও, আমার জপের মালা দাও।' কিংবা বলতেন—'শোনাও, এইবার নাম শোনাও।' অনেকে কাশীতে অথবা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করতে আয়োজন ক'রে খোল করতাল বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে প্রতি দেবালয়ে প্রণাম ক'রে চ'লে যেতেন—দৃষ্টি আবদ্ধ থাকত হয়তো আকাশের দিকে অথবা গ্রামের সর্বোচ্চ তরুশীর্ষে—কে জানে!

আজ পঞ্চাশোর্ধে যখন দিন চলেছে, তখন এই যাওয়াকে আর তুচ্ছ করতে পারি নে কোন মতেই। ব'সে ব'সে ভাবি আর অনুভব করি যেন তাদের এই মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে অন্তত কিছু পরিমাণও অমৃতের স্পর্শ আছে। সাধক রামকৃষ্ণের গান মনে পড়ে—

"আন্ রে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে।"

হয়তো সবটাই মানসিক বিকৃতি। এই বিকৃতি এতই প্রচণ্ড যে পাগলের আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করতেন তাঁরা—এ বললে তর্ক করব না। সবিনয়ে মাথা নত ক'রে হার স্বীকার ক'রেও বলব নূতনকালকে—নূতনকালের সত্যকে স্বীকার ক'রে, মাথায় নিয়েও কামনা করি, মৃত্যুর সময় যেন এমনই পাগলের আনন্দেই মৃত্যুকে বরণ করতে পারি অর্থাৎ কল্পনায়ও অমৃতবিন্দুর আস্বাদ পাই।

পরবর্তী জীবনে তখন আমি প্রায় গ্রাম্য পরিব্রাজক, পিঠে বোঁচকা বেঁধে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। মেলা বেড়ানো একটা রোগ দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবকে দেখেছিলাম। বয়স কত অনুমান করা কঠিন। কাটোয়ার পথে দেখা হয়েছিল। কাটোয়ার পাকা সড়কে হেঁটে চলেছিলাম; পাচুন্দির পর কাঁচা সড়ক, সড়কের দুই ধারে বনওয়ারীবাদের রাজাদের কল্পবৃন্দাবনের কীর্তির ধ্বংসাবশেষ। বড় বড় দীঘি, বাঁধানো ঘাট, পুরাকালের সুরম্য উপবনের ভগ্ন স্মৃতি, কয়েকটা বাঁধানো বেদী, কতকগুলি কেয়াগাছ, কয়েকটা চাঁপা করবীর গাছ, দু-একটি মাধবীলতা; তাল গাছের বেড়া, দু-একটা ভাঙা কুঞ্জে শুধু একটা কি দুটো তমালের গাছ দাঁড়িয়ে আছে আর আছে দু-একটা ছায়ানিবিড় সপ্তপর্ণী, যার চলতি নাম ছাতিমগাছ। এর কোনটা তমালবন, কোনটা কাম্যকবন, কোনটা বা নিধুবন; অর্থাৎ বিস্তীর্ণ চার-পাঁচ ক্রোশ একটি অঞ্চল জুড়ে রাজারা বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন রচনা করেছিলেন; তার অবস্থিতি হ'ল বনওয়ারীবাদ থেকে উদ্ধারণপুরের ঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে। এইখানে তাঁদের গৃহদেবতা বনওয়ারীজীর লীলা চলত। বনওয়ারী-বাদের রাজার এখন ভগ্নাবস্থা। কীর্তিও ভাঙা-ভগ্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু ওই ভগ্ন কীর্তিময় পরিপার্শ্ব পথিকের মনে আজও একটি অপরূপ স্বপ্ন রচনা করে। এই পথে যেতে একটি প্রাচীন ছাতিম গাছের তলে দেখলাম বৃদ্ধ বাউলকে। একা ব'সে আছে নিস্পন্দ মৃতের মত। আমারই সন্দেহ হয়েছিল প্রথমটায়। থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে বুঝলাম, মৃত নয়, জীবিত মানুষই বটে। এগিয়ে কাছে গেলাম, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, এই অবস্থায় তুমি এখানে এই গাছতলায় প'ড়ে কেন? কানে ভাল শুনতে পায় না লোকটি, এত

জীর্ণ হয়েছে শরীর। ক্ষীণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলে—কি বলছেন বাবা? কানে হাত দিয়ে হেসে বললে—শুনতে পাই না ভাল।

একটু জোরেই প্রশ্নটির পুনরুক্তি করলাম।—এই শরীর তোমার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার হেসে সে বললে—সেই জন্যেই তো বাবা। যাব উদ্ধারণপুর, মা গঙ্গার তীরে। দেহ রাখতে যাচ্ছি বাবা। পরম-পুরুষ ভাঙা আবাসে আর থাকবেন না।

কথায় কথায় সে বলেছিল অনেক কথা। যার সার মর্ম হ'ল—বাবা, ওর মধ্যে কতদিন আত্মাপুরুষ বাস করলেন! দেহ তো নয় বাবা, দেহমন্দির! একদিন কত গরব করেছি, কত মেজেছি ঘষেছি, সাজিয়েছি; আজ উনি রব তুলে অহরহ বলছেন—পড়ম্-পড়ম্। তাই নিয়ে চলেছি—গঙ্গার কূলে, সাধক উদ্ধারণ দত্ত বাবার পাটে—গিয়ে বলব—নাও এইবার পড়; সামনে গঙ্গার শীতল জল, জলে প্রভুর পায়ের পরশ, মাটিতে সাধকের পদধূলি; তুমি এই পুণ্যের সঙ্গে মিশে যাও।

প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু এই দেহ নিয়ে কি ক'রে? আসছ কত দূর থেকে? এলে কেমন ক'রে?

—চিন্তামণির দয়ায় বাবা। আসছি, তা ক্রোশ ছয় হবে। গোবিন্দ ব'লে বেরিয়ে পড়লাম, ঝুলি কাঁধে নিয়ে, পথের ধারে এসে দাঁড়ালাম, গরুর আসছি ডেকে বললাম—ধানের বস্তার ফাঁকে আমাকে একটু বসিয়ে নাও না বাবা, আমিও বস্তার সামিল। তারা তুলে নিলে। ছোট লাইনের ইস্টিশানে এসে রেলের বাবুদের বললাম—দাও না বাবা, মালগাড়ীতে বোঝাই করে। বেশী ওজন হবে না। তোমাদের ইঞ্জিনে টানতে একটুও কষ্ট হবে না। তারা

তুলে দিলে গাড়ীতে। নামিয়ে দিলে পাঁচুন্দীতে। পাঁচুন্দী থেকে হেঁটে যাবারই বাসনা ছিল। তা উনি নারাজ। কেবল বলছেন, পড়ম—পড়ম—পড়ম। পড়ব—পড়ব—পড়ব। গোটা এক দিন কোন রকমে বুঝিয়ে সুজিয়ে গড়াতে গড়াতে এসে এই গাছতলায় বসেছি। দেখি, গাড়ী পেলেই বলব—নে বাবা, ভাঙা মন্দিরকে বেঁধে-ছেঁদে তুলে নে, উদ্ধারণপুরের পথে যতটা যাবি নিয়ে চল্। যেখানে পথ ভাঙবি, সেইখানে দিস নামিয়ে। আবার বসে থাকব গাছতলায়—দেখব আবার গাড়ী।

অনেকক্ষণ তার কাছে বসেছিলাম। অনেক কথা বলেছিলাম। সে শুধু বলেছিল—এই কথাই—জীর্ণ দেহমন্দিরখানিকে গঙ্গার পুণ্যতীর্থময় ঘাটে বিসর্জন দিয়ে তার আত্মাপুরুষকে মুক্তি দেবে। কি আনন্দ যে তার সেই বহুরেখাঙ্কিত পাণ্ডুর মুখখানিতে দেখেছিলাম, সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ যিনি ছিলেন, তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি তিনি। তাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের লোক। বড় উকিল ছিলেন, উপার্জন ছিল প্রচুর, ভোগীও ছিলেন তেমনি। বিবাহ করেছিলেন তিনবার। অবশ্য প্রত্যেক বারেই বিপত্নীক অবস্থাতে বিবাহ করেছিলেন। সন্তান ছিল, সে সত্ত্বেও শেষ বারে যখন বিবাহ করেন তখন তাঁর বয়স অনেক, ষাটের উপর তো বটেই, সত্তরের কাছে, হয়তো বা উনসত্তর। কর্তা থাকতেন সিউড়ীতে, ছেলে থাকতেন লাভপুরে—সম্পত্তি দেখতেন। তিনি বিবাহ করলেন, ভাইয়ের নিষেধ শুনলেন না, বন্ধুর নিষেধ না, কারুর না। তাঁর বিবাহের পর সিউড়ীর উকিলেরা শুনেছি ঢাক বাজিয়ে বরকন্যাকে অভ্যর্থনা

করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি লজ্জিত হন নি। বিচিত্র মানুষ, বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করলেন, কিন্তু পত্নীকে পাঠিয়ে দিলেন লাভপুরের সংসারে। নিজে সিউড়ীতে রইলেন প্রণয়িনীকে নিয়ে। এতে তাঁর কোন সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। লাভপুরে আসতেন, প্রচুর মদ্যপান ক'রে পূজা সমারোহে সত্য সত্যই নাচতেন। এক কথায় দান করতেন টাকা পয়সা যা হাতে উঠত তাই। একবারও দেখতেন না কি দিচ্ছেন। মত্ত অবস্থায় আঙুল থেকে আংটি প'ড়ে গেছে, কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে, ফেরত দিতে এসেছে, বলেছেন—উঁহু, ও আর আমার নয়, ও তোর। আমার ভাগ্য আমার আঙুল থেকে খসিয়ে নিয়ে তোর হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের আইনে অবিশ্যি এটা আমারই, কিন্তু ভাগ্যের আইনে ওটা তোর।

বুঝতে না পারলে বলতেন, ওরে মূর্খ, ওটা তোর হ'ল, নিয়ে যা। আমি বাবা ওপারে গিয়েও ওকালতি করব—সেই আইনের ধারা! এ তুই বুঝবি না। তবে তুই যখন ফিরে দিতে এসেছিস তখন তার জন্যে তোর এ পারের আইনে আরও কিছু পাওনা হয়েছে। নে। ব'লে আধুলিটা বা টাকাটা তার হাতে দিয়েছেন।

আবার যে পেয়েছে কুড়িয়ে—সেকালের সে মানুষ এমনি যে, সে ভেবে আকুল হয়েছে, হায় হায় হায়, সে এখন করবে কি? পরের সোনা কুড়িয়ে পাওয়া যে ভাল নয়! যে মালিক সে ফিরে নিলে ভাগ্যে মন্দ বিধান থেকে নিষ্কৃতি পেত। মালিক নিলে না—সে এখন করে কি? যাক। এমনি মানুষ ছিলেন আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ। বাড়ীতে শিবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, দুর্গাপূজা এনেছেন, কালীপূজা সরস্বতীপূজা এনেছেন, নিত্য নারায়ণ সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন, অহঙ্কার ক'রে বলেন, কাশী বৃন্দাবন

প্রতিষ্ঠা করেছি আমি। মানুষটাকে বিচার করলে মনে হয়—প্রতিষ্ঠার আনন্দে বিভোর, তার দম্ভে দাম্ভিক।

তীর্থে যেতে বললে বলতেন—কোথায় যাব, কিসের জন্যে যাব? আমার বাড়ীর দোরে সব দেবতাকে বসিয়ে রেখেছি। আমি যাব কোথায়? সত্যই দাম্ভিক লোক।

এই মানুষ জ্বরে পড়লেন। চেতনা হারালেন। কবিরাজ বললেন—এ জ্বর থেকে কর্তা উঠবেন না। যা ব্যবস্থা হয় করুন।

গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হ'ল। পাল্কী সাজল, গরুর গাড়ী সাজল। তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ পাল্কীতে তোলা হ'ল। গ্রামের সকল দেবালয়ে পাল্কী নামিয়ে—সংজ্ঞাহীন মানুষটির ললাট রজবিভূষিত করা হ'ল। পাল্কী গিয়ে থামল—আমাদের গ্রামপ্রান্তে মহাপীঠতীর্থ ফুল্লরাতলায়। এই স্থানটিই গ্রামের শেষ বিদায়স্থল। এর পর পাল্কী একেবারে গঙ্গাতীরে গিয়ে নামবে। ষোলজন বেহারাই যথেষ্ট—কিন্তু বত্রিশজন বলশালী কাহারের ব্যবস্থা হয়েছে। ফুল্লরা দেবীর প্রাঙ্গণে পাল্কী নামল, পুরোহিত মাথায় আশীর্বাদী দিচ্ছেন—কর্তা চোখ মেললেন। চারিদিকে জনতা এবং দেবস্থলের ঘন জঙ্গল ও মন্দির প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে নিজেকে পাল্কীর মধ্যে দেখে প্রশ্ন করলেন—কোথায় এনেছ আমাকে?

ভাই এগিয়ে এলেন, বললেন—মহাদেবী ফুল্লরা মাতার স্থান। আপনাকে জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হাত বের ক'রে ভাইয়ের মাথায় রেখে বললেন—আমি রামচন্দ্রের চেয়ে ভাগ্যবান। আমার লক্ষ্মণ আমার মহাপ্রস্থানের

ব্যবস্থা করেছে, তাকে রেখে আমি আগে যাচ্ছি! আমার অন্তরের কামনা সে জানে যে। অচেতন হয়ে পড়েছিলাম—অন্তিম কামনা জানাতে পারি নি।

ভাই বললেন—পাল্কী তুলবে এইবার?

—না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কর্ম বাকী আছে আমার।

—বলুন।

—আমাদের ঘরে ভাগ্নেরা আছেন। তাঁদের প্রাপ্য দিতে হবে। আমাদের সন্তানেরা কৃতী নয়, তারা অকৃতী কিন্তু ভোগী। তারা কখনও দেবে না। ...এই সম্পত্তি তাদের দিলাম আমি।

আরও দুই-একটি ব্যবস্থার পর হেসে বললেন—বাস্।

ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—আর কোনও আদেশ থাকে তো বলুন।

বললেন—এইবার আদেশ, পাল্কী তোল। কালী কালী বল সকলে। দু' কান ভ'রে শুনি। সময় খুব বেশী আছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

নিজে নাড়ী অনুভব ক'রে বললেন—হয়তো শেষ রাত্রি পর্যন্ত।

—আপনার শ্রাদ্ধাদি সম্পর্কে—?

হাত নাড়লেন।—কোন কামনা নেই আর, সুতরাং বক্তব্যও আর নেই আমার। এখন চল চল চল। আমার মালা দাও।

আমার পিতামহ কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। চুরাশী বৎসর বয়সে সপরিবারে তীর্থ-যাত্রা করলেন। চুরাশী বৎসর বয়সেও তিনি যথেষ্ট সক্ষম ছিলেন। এ বয়সেও তাঁর চুল পাকে নি; কালো ছিল চুল। দেহেও ছিলেন সমর্থ। যা শুনেছি, তা বিস্ময়কর মনে হয় আজকের দিনে। পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি

সিউড়ীতেই বাস করেছেন। শেষের চার-পাঁচ বৎসর ওকালতি করতেন না। তখন আদালতে ইংরিজীর রেওয়াজ সুরু হয়েছে। ইংরিজী-জানা উকিলেরা এসে বসেছেন। বাংলা ও ফার্সীনবীসদের মানসম্মান চ'লে যাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। তিনি ওকালতি ছেড়ে দিলেন। সে কথা থাক্। তাঁর সামর্থ্যের কথা বলি। দুর্গা-পূজোয় তিনি নিজে পূজকের কর্ম করতেন। ষষ্ঠীর দিন তিনি সিউড়ী থেকে লাভপুর আসতেন। বিশ মাইল পথ, উপবাস ক'রে তিনি পদব্রজে রওনা হতেন, সঙ্গে পাইক থাকত; এই পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি উপবাসী থেকে পদব্রজে বিশ মাইল পথ হেঁটে লাভপুরে পৌঁছে পুনরায় স্নান ক'রে সন্ধ্যার সময় নবপত্রিকা ও নবপল্লবের অধিবাস ও পূজাসংকল্পাদি সেরে তবে জল খেতেন। চুরাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত দেহে রোগ বড় একটা কেউ দেখে নি। মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতশিরার জ্বর হ'ত। বাতশিরা একালে বোধ হয় দুর্বোধ্য; ফাইলেরিয়ার জ্বরকে বাতশিরার জ্বর বলত। এই বয়সে তাঁর আহারও ছিল প্রচুর। দিনে খেতেন ভাতের সঙ্গে ঘি তরকারি মাছ এবং ঘরের দু' সের দুধ জ্বাল দিয়ে এক সেরে পরিণত ক'রে চিঁড়া কলা ও চিনি দিয়ে মেখে তাই; এবং রাত্রে হালুয়া ও আধ সের ক্ষীরের মত দুধ। এই মানুষ চুরাশী বৎসর বয়সে তীর্থভ্রমণে যাবার সময় গ্রামের প্রতিজনের কাছে বিদায় নিয়ে, তখন একজন তাঁর দিদিসম্পর্কীয়া জীবিতা ছিলেন—তাঁকে প্রণাম ক'রে, গ্রামের প্রতি দেবালয়ে প্রণিপাত ক'রে একটি প্রার্থনাই জানালেন যে, যে-কামনা নিয়ে তীর্থে চলেছি সে কামনা যেন পূর্ণ হয় আমার। তীর্থস্থলে যেন আমার দেহান্ত ঘটে, আমি যেন মুক্তি পাই।

২২শে কার্তিক তিনি তীর্থ যাত্রা করলেন। গয়াতীর্থ সেরে কাশীতে এসে পৌঁছলেন—২৭শে কার্তিক। ৫ই অগ্রহায়ণ তাঁর জ্বর হ'ল, ৬ই তারিখে সে জ্বর ছেড়ে গেল—দেহের উত্তাপ ৯৫৷৷৹ ডিগ্রীতে নামল। ৭ই অগ্রহায়ণ তিনি দেহত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় দেহত্যাগ করলেন। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পর্যন্ত খর্ব হয় নি। তার প্রমাণ—তিনি লাভপুর থেকে রওনা হওয়ার পর তাঁর একমাত্র দৌহিত্র অকস্মাৎ মারা গেল লাভপুরে। সে সংবাদ লাভপুরের পত্রে গোপন রাখতে হয়েছিল। লেখেনই নি তাঁরা। ৬ই তারিখে এই পত্র কাশীতে এল। দীর্ঘ পত্র, নায়েব লিখেছেন, পুত্র পিতাকে সে পত্র প'ড়ে শোনালেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ৯৫৷৷ ডিগ্রী দেহোত্তাপ নিয়ে বৃদ্ধ অর্ধশায়িত অবস্থায় পত্র শুনছিলেন, পত্র শেষ হতেই ঘাড় নেড়ে বললেন—পত্র তো ভাল বোধ হচ্ছে না বাবা।

পুত্র বললেন—কেন বাবা? সবই তো ভাল লিখেছেন নায়েব।

ক্রমশ-স্তিমিতদেহোত্তাপ বৃদ্ধ বললেন—দেখ বাবা হরিদাস, পত্রে গ্রামের লোকের সংবাদ আছে, এমন কি তোমার গরু-বাছুরের সংবাদ দিয়েছে, মামলা মকদ্দমা বিষয়ের কথা আছে, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর একমাত্র সন্তান ভোলার সংবাদ তো নাই!

আমার বাবা বললেন—তোমার ভাবনা একটু বেশী বাবা। ভোলার বাপের মায়ের সংবাদ দিয়েছে, তাদের বাড়ীর খবর দিয়েছে, তার কথা আর স্বতন্ত্র ক'রে কি লিখবে?

ঘাড় নেড়ে বৃদ্ধ বললেন—সকলের সংবাদ পৃথক ভাবে না লিখলে ভাবতাম না বাবা। বালক হ'লেও ভোলা তো বাড়ীর গরু বাছুর থেকে ছোট নয়!

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তখনও এতখানি। পরদিন ৭ই তারিখ রাত্রি নয়টায় একবার প্রলাপ বকলেন ব'সে থাকতেই। প্রলাপই বলব। অন্য কথা বলছিলেন, তার মধ্যেই ডেকে উঠলেন লাভপুরের নায়েবকে।—কই হে ফুল্লরাবাবু, তুমি কেমন লোক হে? কই, আমার আহ্নিকের জায়গা কই করেছ?

ছেলে শঙ্কিত হয়ে গায়ে হাত দিয়ে বললেন—বাবা, কি বলছ? সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। দেহের উত্তাপ আরও কমেছে।

বাপ আত্মস্থ হয়ে বললেন—কি বলছ?

—রাত্রিকালে আহ্নিকের জায়গা করতে বলছ কি?

—বলেছি? ও। একটু চোখ বন্ধ ক'রে থেকে বললেন—জ্বর আসছে—শিবজ্বর।

জ্বর এল। নিজেই বললেন—আমাকে এবার তীরস্থ কর। আমার উপবীত আমার আঙুলে জড়িয়ে দাও।

কুলদাপ্রসাদবাবুও ছিলেন বিচিত্র মানুষ।

যেমন ভোগী তেমনি রসিক সুগায়ক, তেমনি সুপুরুষ ও সুন্দর-ভাষী। কুলদাবাবু ছিলেন বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসক। লোকে তাঁকে ব্যঙ্গ করত। সাধারণভাবে তিনি গ্রামের লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন না; তাঁর সমস্ত গুণগুলি প্রকাশের আতিশয্যে এবং বিষয়বোধের চারিত্রিক জটিলতার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কীর্তন শুনতে ব'সে তিনি কাঁদতেন; মধ্যে মধ্যে 'ওহো ওহো,' বলে ভাবাতিশয্য প্রকাশ করতেন; বহু লোকের কাছে তা হাস্যকর মনে হ'ত। এর মধ্যে আতিশয্য ছিল, কিন্তু কপটতা ছিল না। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে যেতেন, সেখানে বলতেন—দেখ, দইয়ের মাথাটা আন দেখি। আর তেলুক দেখে মাছ। তাঁর ভোগবিলাসে কুণ্ঠা ছিল না। জীবনের

শেষ কাল পর্যন্ত দেখেছি ভোগের প্রতি অনুরাগ। পরিপাটী কোঁচানো কাপড়, শক্তকফ শার্ট, চকচকে জুতো, ঝক্‌ঝকে মাজা একটি `গাড়ু, তার উপর ভাঁজ করা পরিষ্কার গামছা, চকচকে গড়গড়া, চমৎকার সটকার নল, একখানি সুন্দর কম্বল, একটি ঝালর-দেওয়া পাখা, একটি বাক্স—এই আয়োজন থেকে কুলদাবাবুকে পৃথক করা যায় না। তাঁকে মনে পড়লেই এগুলি মনে পড়বে। লোকে অন্য অপবাদও দিত। তা হয়তো সত্যিই। কিন্তু সেকালে এই দোষ থেকে মুক্ত মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। আমার বাবার ডায়রীতে পাই, তিনি আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন—"লাভপুরে আসিয়া —লোকের সংসর্গে আসিয়া অল্পবয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল।" আমার মায়ের পদার্পণের পর তিনি এ গ্লানি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মদ্যপান ছিল, কিন্তু সে ছিল তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংযত পরিমাণে পান। থাক্।

কুলদাবাবুর বিষয়াসক্তিও ছিল প্রবল এবং জটিল। মামলা-মকদ্দমা অনেক করেছেন, করতে বাধ্যও হয়েছেন। কিন্তু এই মানুষটির মধ্যে আমি এক চিরকালের সম্ভ্রমের মানুষকে দেখেছি। এমন মিষ্ট ভাষা আর এমন সহ্যগুণ সংসারে বিরল। একবারের ঘটনা চোখের উপর ভাসছে। বৃদ্ধ ব'সে আছেন দুর্গাপূজা-মণ্ডপে। কম্বল বাক্স গড়গড়া গামছা পাখা নিয়ে আসর জমিয়ে নবমী-পুজার ব্যবস্থা করছেন। বহু সরিকের পূজা, অনেক কালের পূজা; সরকার-বাড়ীর পূজায় দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে কয়েকজন বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জেও সরিক। নবমী-পূজার দিন সরকার-বাড়ীর পূজাস্থানে বলি হয় অনেক, প্রায় ষাটটি। এই বলির পর্যায় বাঁধা আছে। এ পর্যায় বংশের সম্মান হিসাবেই নির্দিষ্ট। সেবার এক প্রবীণ

দৌহিত্র সরিকের তিরোধান হয়েছে। এই দৌহিত্রের বলি ছিল প্রথম বলি ; দৌহিত্র নিঃসন্তান, তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছেন তাঁর ভাগিনেয়। ভদ্রলোক শিক্ষিত, গ্রাজুয়েট, কৃতী ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিবান, আধুনিক। কুলদাবাবু ব্যবস্থা করলেন—এবার প্রথম দেওয়া হবে প্রবীণতম সরিকের বলি কথাটা গোপন ছিল না। প্রথমেই এ নিয়ে বাদানুবাদ ক'রে মীমাংসায় উপনীত হ'লে ঘটনাটি ঘটতে পেত না। কিন্তু দৌহিত্রের উত্তরাধিকারী এ নিয়ে কোন কথা বললেন না। তাঁর অজুহাত, তাঁকে তো জানানো হয় নি। তবে তিনি ব্যবস্থা সবই করলেন। ঠিক বলির সময় তাঁর ভাগিনেয় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড প্রতিবাদ তুললে। কুলদাবাবুর ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দিয়ে নিজেদের বলিই হাড়িকাঠে ফেললে। সেই বলিই প্রথম বলি হ'ল। গণ্ডগোলটা বলির সময় স্থগিত থাকল চাপা আগুনের মত। বলি শেষ হওয়ার পর জ্ব'লে উঠল।

দৌহিত্রের উত্তরাধিকারী আত্মস্থ ছিলেন না, ইচ্ছাপূর্বকই ছিলেন না। চক্ষুলজ্জাকে অতিক্রম করার জন্যই ছিলেন না। তিনি এসে আক্রমণ করলেন বৃদ্ধকে, মৌখিক আক্রমণ। মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তিনি তখন যেন উন্মত্ত। বাক্যপ্রয়োগে শীলতা তো অতিক্রম প্রথম থেকেই করেছিল, কয়েক ক্ষেত্রে শ্লীলতাও অতিক্রান্ত হ'ল। জনতা থমথম করছে। স্তব্ধ। বৃদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে নির্বাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন আর তামাক টানছেন। তাঁর চারিপাশে তাঁর তিন পুত্র, চার ভ্রাতুষ্পুত্র—সাতজন। এদের মধ্যে বড় ছেলে কৃতী, কয়লা-ব্যবসায়ী, দেহেও শক্তিশালী। ভ্রাতুষ্পুত্রদের একজন বড় পুলিশ কর্মচারী, শূরবীর চেহারা। অন্য তিন ভ্রাতুষ্পুত্র শুধু শক্তিশালীই নয়, রোষ-বর্বরতার অখ্যাতিতে কুখ্যাত। আর

প্রতিপক্ষেরা স্বজনশক্তিতে মাত্র দুজন। হয়তো কুলদাবাবু বহু স্বজনের রোষভাজন ছিলেন, কিন্তু সে দিন বিবাদ যা দাঁড়িয়েছিল তাতে সমগ্র সরকার-বংশের এক হওয়ারই কথা। শুধু মাত্র কোন একজনের প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদ শুরুর অপেক্ষা। ওই মানুষটিই মুখে প্রতিবাদ শুরু করলেই তা হবে। তাঁর মুখ খোলার অপেক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য! দৌহিত্রবংশের উত্তরাধিকারী প্রতিবাদ না পেয়ে অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন, গালাগালি অভিসম্পাত ক'রেই চলেছেন, তবু এ মানুষটি নির্বাক, স্থিরদৃষ্টি, স্থির হয়ে ব'সে আছেন। শেষে তাঁর বড় ছেলের আর সহ্য হ'ল না। তিনি বাপের পাশেই ব'সে ছিলেন, অধীর হয়ে ব'লে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে।

বারেকের জন্য বৃদ্ধ জ্বলে উঠলেন। আমি বলব—জ্যোতিষ্মানের মত জ্ব'লে উঠে তিনি যেন গৃহদাহী বহ্নিকে নির্বাপিত ক'রে দিলেন। কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের মাথায় তিনি সর্বসমক্ষে চড় মেরে বসিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠলেন—খবরদার! চারিদিকে আসন্ন বিস্ফোরণ মুহূর্তে স্তব্ধ ক্ষান্ত হয়ে গেল। এমন কি দৌহিত্রের উত্তরাধিকারীও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আজও আমার চোখের উপর ভাসছে, আমি দেখছি সেই মুহূর্তের ছবি, মানুষের মুখে চোখে পশু তার হিংস্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে—সে হিংস্র চীৎকার করতে উদ্যত হয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। আমার মনে হ'ল, একটা প্রহেলিকা খেলে যাচ্ছে। তার অর্থ কি উপলব্ধি করতে পারছি না। স্তব্ধ নাটমণ্ডপে তিনি ব'লে গেলেন তাঁর বাক্যগুলি, আমার মনের আকাশে বাতাসে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই প্রতিধ্বনির ধ্বনিই আমি আজ লিখে চলেছি। তিনি ব'লে গেলেন—ওরে মূর্খ বর্বর, তুই কাকে কি বলছিস? কার উপর হাত তুলতে চলেছিস? জানিস ও কে?

অবাক হয়ে জনতা শুনে গেল।

—জানিস ও কে? ও হ'ল —এর ভাগ্নে! —এর দৌহিত্র। (মায়ের নাম ক'রে) —এর বেটা। ওরে মূর্খ, ও যখন শিশু ছিল তখন ওকে বুকে নিলে ও যদি আমার বুকে বিষ্ঠাত্যাগ ক'রে দিত, তবে কি আমি তাকে ফেলে দিতাম সেদিন? ও আজ বড় হয়েছে দেখছিস কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়েছি হতভাগা; তোদের চোখ নেই, তোরা অন্ধ। তাই তোরা দেখতে পাস না, ও আমার কাছে তাই আছে। বলুক, ওর যা খুসী ও বলুক। আমার উপর রাগ করবে না তো করবে কার ওপর?

চারিদিকে দেখলাম মানুষের চেহারা পাল্টে গেছে, পশু কোথায় মিলিয়ে গেছে। মানুষের মুখে প্রসন্নতা, চোখে জল।

একবার নয়, বার বার দেখেছি এমন সহ্যগুণ।

এক ধনীর বাড়ীতে মাতৃবিয়োগের পরই তিনি তত্ত্ব করতে এসেছেন। ধনী আধুনিক—ধনী বহুকীর্তিমানের উত্তরাধিকারী। আশ্চর্যের কথা, তবুও তিনি আত্মীয়তাকামী এই বৃদ্ধ আগন্তুককে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য আক্রমণ সুরু করলেন। নাতি-ঠাকুরদার সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে রহস্যের মধ্য দিয়ে কুটিল আক্রমণ। চরিত্র, লোভ, হীনতা, দৈন্য ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ। বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসি হাসতে সুরু করলেন। অমৃতং বালভাষিতং। সত্য বলতে, আমি মনে করি, বৃদ্ধের সে বোধ মিথ্যা বা কপট ছিল না।

তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে স্বজনপরিবৃত হয়ে দেহ রেখেছিলেন।

কুলদাবাবুর এক পূর্বপুরুষের কথা না ব'লে পারছি না।

তিনি গ্রামেরই কুটুম্বের কাছে ঋণ করেছিলেন। দলিল দস্তাবেজ ছিল কি ছিল না, সে কথা বাহুল্য। মৃত্যুকালে তিনি কুটুম্বকে

ডেকে বললেন—ঋণদায় নিয়ে মরণে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, শান্তি পাচ্ছি না আমি। আমার নগদ টাকা এখন নাই। আপনি এই ভূমি-সম্পত্তি নিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই।

কুটুম্ব বললেন—তাই হ'ল।

সানন্দে মৃত্যুপথযাত্রী বললেন—দলিল, একটা দলিল কর।

কুটুম্ব বললেন—গ্রহীতার নাম এই—। আমার নামের পরিবর্তে ওই নামে হবে।

সে নাম কুটুম্বের ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়-বধূর নাম। মৃত্যুপথযাত্রীর জামাতা অথবা কন্যা।

মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়াল। মুছে তিনি নামগান শুরু করলেন। মুছে ফেললেন সকল পার্থিব ভাবনা।

ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স সাত-আট বৎসর, সেই সময় প্রথম দেখেছিলাম—আমাদের গ্রামের বিষ্ণু মুখুজ্জে মহাশয়কে ঠিক এমনি কামনা নিয়ে কাশী যেতে। খোল করতাল বাজিয়ে গ্রামের—গ্রামের কেন—আশপাশের গ্রামের লোকদের প্রণাম নিয়ে, গ্রামের দেবতাদের প্রণাম ক'রে—কাশী গিয়েছিলেন দেহত্যাগ করতে।

আমাদের গ্রামের হিরণ্যভূষণবাবুর মা গিয়েছিলেন গঙ্গাতীর।

আমাদের আশেপাশের গ্রামের অনেকে এমন যাওয়া গিয়েছেন শুনেছি।

এই সব কথা আজ যখন মনে ভাবি, তখন মনে হয়, সেকালের সবই আবর্জনা ছিল না। আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে খানিকটা কিছু ছিল।

আর একটা জিনিস ছিল।

সেকালের এই ধর্মাশ্রয়ী মানুষদের ভাষা ছিল বড় মধুর। বড় মিষ্ট। তেমনি ছিল ধৈর্য, সহনশীলতা। আজকের দিনের ভাষা সে দিনের ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত—দীপ্তিতে তীক্ষ্ণতায় ব্যঞ্জনা-মহিমায়, প্রকাশ-শক্তিতে অপরূপ, মনের মধ্যে দাগ কেটে ব'সে যায়, ক্ষেত্রবিশেষ বীণার সপ্ততারে ঝঙ্কার তোলে; কিন্তু মিষ্টতায় সে দিনের ভাষা ছিল বড় মধুর।

এই দুটি বস্তু আজ মনে হয় আমরা হারিয়েছি। অন্যথায় সেকালের অবস্থার ঐতিহাসিক দোহাই পেড়েও আর কোন মানসিক অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারি না। মিথ্যার জঞ্জাল সেদিন আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। এই জঞ্জাল অপসারণের ঢেউ তখন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় উঠেছে, কিন্তু আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছায় নি। বন্যার প্রথমেই যেমন ঢেউয়ের আগে ভেসে আসে রাশিকৃত ফেনা আর নদীর উৎসমূলের খড় কুটা আবর্জনা, তেমনি নবজীবনের শক্তির সঞ্চারের আগে এসে লাগল ফ্যাশন। গোড়াতেই বলেছি ভৃঙ্গারে ভ'রে মৃতসঞ্জীবনী অমৃতধারা আসে নি, এসেছিল কেস-বন্দী স্কটল্যাণ্ডের তৈরি স্কচ হুইস্কি। সেকালের হুইস্কির বোতল আমাদের বাড়ীতেও আমি দেখেছি। আমার বাবা ছিলেন তন্ত্রোপাসক, বাড়ীতে কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যার পূজা ছিল। তারাপূজায় কারণের ঘট স্থাপন করতে হয়। কারণের ভোগ হয়। মা-তারাকে উপাদেয়তর দুর্লভ সামগ্রী হিসাবে স্কচ হুইস্কির ভোগও দেওয়া হয়েছিল বোধ হয়। বোতলের গায়ের নাম দেখেছি—H.M.S.; ওটাই নাকি চলতি বেশী ছিল সেকালে। এ বিষয়ে আমার একটা কথা মনে হয়—হুইস্কির নামটা সার্থক ছিল। ইংলণ্ডের রাজার রাজকীয় কর্মসাধনের জন্যই

ওটা ঢুকেছিল। শিক্ষার আগে এল ফ্যাশন। জুতোয় জামায়, ম্যান্‌চেস্টারের রেলি-ব্রাদার্সের ধুতিতে শাড়ীতে, নূতন কালের চুল ছাঁটায়, কথায় বার্তায় ঢঙে ধারায় ধরণে সে এক ফ্যান্সী ফেয়ার এসে ব'সে গেল দেশের মধ্যে।

পূর্বেই বলেছি আমার চুল মানত ছিল বাবা বৈদ্যনাথের কাছে, সেই চুল মানত দিতে গেলাম আমি বিচিত্র পোষাকে, সার্জের স্যুট প'রে মাথায় বেড়া বিনুনি বেঁধে, তার উপর একটা নাইট ক্যাপের মত টুপি এঁটে। সেদিনের কথা আজ মনে পড়েছে। চুল বেঁধে স্যুট প'রে টুপি মাথায় দিয়ে বেশ গৌরব অনুভব করেছিলাম; একটি শিশুর আধুনিকত্বের গৌরবে যতখানি স্ফীত হওয়া সম্ভবপর তা সেদিন হয়েছিলাম আমি।

আমার চুল হয়তো আরও কিছুদিন থাকত। হয়তো বৈদ্যনাথের মত পৈতের সময় পর্যন্ত চুল আমাকে বাঁধতে হ'ত, কিন্তু পর পর মর্মান্তিক ঘটনা ঘ'টে গেল। এই উত্থান-পতনের দ্বন্দ্বে বাবা আমার মুহ্যমান হয়ে প'ড়ে বৈদ্যনাথের কাছে মর্মবেদনা নিবেদন করতে ছুটে গেলেন।

একটা ঘটনা ঘটল, যা আজ বিচিত্র মনে হবে।

গ্রামের নব-অভ্যুদিত ধনী হাই ইংলিশ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইস্কুলের সভাপতি ছিলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজিং কমিটিতে গ্রামের প্রধানদের নেওয়া হয়েছিল। আমার বাবাও ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। স্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং একটু বিচিত্র ধরণের মানুষ। তাঁর ওই স্পষ্টভাষিতার অপরাধে একদা তিনি অকস্মাৎ অপসারিত হলেন। করলেন—হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারী। ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষও রাখলেন

না ব্যাপারটা। এক কথায় বাড়ীর মালিকের মত জবাব দিয়ে দিলেন। সেক্রেটারী ছিলেন ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা নিজে; ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সহজলভ্য ছিল। তাঁদের অনুগামী সভ্যের সংখ্যাই বেশী, তবুও অধীরতার তাড়নায় তাঁরা অপেক্ষা করলেন না। এরই প্রতিবাদে বাবা এবং আরও দুইজন কমিটিতে যাওয়া বন্ধ করলেন। হয়তো কেন—নিশ্চয়ই এটা তাঁদের দিক থেকে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বের একটা রূপান্তরিত প্রকাশ। অন্য দিকে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দিক থেকে বিচার ক'রে অন্যায় দেখতেও পেলেন না, স্বীকারও করলেন না। এবং তিনি গ্রাহ্য করলেন না—এঁদের অসহযোগিতা। এর পর স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, তাঁর নাম ছিল—এস. সি. মুখার্জী, আই-সি-এস। সে সভাতেও এঁরা গেলেন না—প্রতিবাদ জানাবার জন্য গেলেন না। অনুপস্থিতির অভিযোগ সাহেবের কানে উঠল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়, এবং তিনি সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন যে, গ্রামের এই তিন প্রধান—এই সভায় অনুপস্থিত হয়ে কেবলমাত্র ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতাকেই অপমানিত করেন নি, রাজপ্রতিনিধিরও অসম্মান করেছেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও, এস্-পি এলে স্থানীয় জমিদারের ডাক-বাংলোয় সেলাম দিতে যেতে হ'ত। সেকালের আই-সি-এস ম্যাজিস্ট্রেটের কথাটা মনে নিলে। তিনি সদরে ফিরে গিয়ে—দারোগা মারফৎ হুকুমনামা পাঠালেন। এই তিনজন জমিদারকে এই অপরাধের জন্যে ইস্কুল-প্রতিষ্ঠাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে—স্থানীয় সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সম্মুখে। !বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। 'দিল্লীশ্বরো-বা-জগদীশ্বরো বা' কথাটায় যদি কারও সন্দেহ ছিল মুসলমান আমলে, ইংরেজ আমলে 'ইংলণ্ডেশ্বরো-বা-জগদীশ্বরো-বা'

ঐ কথাটায় কারও তখন সন্দেহ ছিল না। বুয়োর যুদ্ধ এবং রুশ-জাপান যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে, এঁরা প্রত্যেকেই সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন, তবুও ইংরাজের সম্পর্কে মনোভাব টলে নি। কাজেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধির এ আদেশ অমান্য করতে তাঁদের সাহস হ'ল না। তাঁরা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন। ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু মনে হ'ল এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটল দ্বিতীয় ঘটনা। এই নব-অভ্যুদিত ধনী কিনলেন মুসলমান-নবাববংশীয় জমিদারের কাছে একটি জমিদারি। ব্যাপারটা একটু জটিল। সংক্ষেপে বলি। আমাদের গ্রামের জমিদারির অংশীদার সকলেই, কিন্তু দক্ষিণপাড়া—যে পাড়ায় আমাদের বাস—সে পাড়াটি ছিল মুরশিদাবাদের এক মুসলমান জমিদারের। উচ্চ মূল্য দিয়ে এই দক্ষিণ-পাড়ার জমিদারি কিনলেন। এবং নিজে অর্থ ব্যয় ক'রে আনলেন গভর্নমেন্ট সেটেলমেন্ট। প্রমাণ করতে চাইলেন—গ্রামের প্রধানদের বাড়ীগুলি, যা তাঁরা এতকাল মুসলমান জমিদারের আমলে ব্রহ্মত্র বা লাখরাজ হিসাবে ভোগ ক'রে প্রজা হয়েও প্রজা না হওয়ার সুবিধা পেয়ে আসছেন—সে সুবিধা তাঁরা পেতে পারেন না, ব্রহ্মত্র-লাখরাজ মিথ্যা। তাঁর এই অনুমান পুরাপুরি সত্য না হ'লেও অনেকটাই সত্য ছিল। আমাদের দেশের সেটেলমেণ্টে এক রকম নূতন লাখরাজের সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম—ভোগদখল-সূত্রে নিষ্কর লাখরাজ। সূত্রটা যেখানে খাজনা না দিয়ে ভোগ-দখলের, সেখানে দখলটা জবরদখল। প্রাচীন মুসলমান জমিদার বর্ধিষ্ণু হিন্দুদের এই জবরদখল সহ্য করেছিলেন। এরা বর্ধিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ এই ছিল সহনশীলতার কারণ। কিন্তু নূতন জমিদার সেটা

সহ্য করতে চাইলেন না। লাখরাজ যেখানে সত্য নয়, সেখানে কর দিয়ে তাঁকে জমিদার স্বীকার ক'রে তাঁদের প্রজা হতে হবে। যে সেটেলমেণ্ট ডেপুটির সামনে তাঁদের ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, সেই সেটেলমেণ্ট ডেপুটি এই উপলক্ষ্যেই তখন লাভপুরে ছিলেন। একদা দেখা গেল—সেটেলমেণ্টের চেন থাক্ নক্সার দাগে দাগে যেতে গিয়ে আমাদের কয়েক বাড়ীর অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। তার পিছনে পিছনে আমিন কানুনগো, সেটেলমেণ্টের টেবিল ঘাড়ে নিয়ে কুলী, থাক্ নক্সা বগলে জমিদারের কর্ম্মচারী এবং আরও অনেক। অন্দরের উঠান ছিল বাঁধানো, সেখানে পায়ের ছাপ বা জুতোর দাগ পড়ার কথা নয়, কিন্তু মালিকদের অন্তস্তল দলিত হয়ে গেল।

আরও একটি ঘটনা ঘটল। এর সঙ্গে গ্রামের কোন লোকের সংস্রব ছিল না। আমাদের একটি বড় মামলায় পরাজয় হ'ল। একটি ন্যায্য সম্পত্তির অধিকার থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম।

এই তিনটি ঘটনার আঘাতে আমার বাবা মুহ্যমান হয়ে আশ্রয় সন্ধানে ছুটে গেলেন বৈদ্যনাথধামে। দেবতার পায়ে গড়িয়ে পড়বেন। বলবেন—তুমি তোমার শক্তি প্রয়োগে এর প্রতিকার কর। মানত করবেন। শুধু তাই নয়, আমার পিসীমা ধরনা দেবেন সেখানে। সপরিবারে বৈদ্যনাথ গেলাম। বৈদ্যনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণ, মন্দিরের ধ্বজা আজও আমার চোখের উপর ভাসছে। এর পর আরও কয়েকবার দেওঘর গিয়েছি, এই গতবার ১৩৫৫ সালেও গিয়েছি—কিন্তু সে ছবির সঙ্গে মেলে না। সে মন্দির এত উঁচু, এত শুভ্র যে, মনে হয় আকাশের গায়ে সাদা মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

আমার মাথার চুলের লজ্জা বৈদ্যনাথের পাথর-বাঁধানো অঙ্গনে উজাড় ক'রে দিয়ে সেই দিন সেইখানে নিলাম হাতেখড়ি। মনে হচ্ছে বাংলা এবং দেবনাগরী দুই অক্ষরেই খড়ি বুলিয়েছিলাম। যে পাথরখানির উপর খড়ি বুলিয়েছিলাম, সেই পাথরখানিকে বের করবার জন্য (এবারে ১৩৫৫ সালে) কত যে মনে মনে সন্ধান করেছি! যে দিন গিয়েছি মন্দিরে, সেই দিনই বৈদ্যনাথের পূর্ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু খুঁজেছি খুঁজেছি খুঁজেছি। স্ত্রী কন্যা পুত্র জিজ্ঞাসা করেছেন কি? এমন ক'রে কি দেখছেন?

উত্তর দিই নি। হেসেছি। সম্ভবত লজ্জা অনুভব করেছি।

সে কথা থাক্।

বাবা কেঁদেছিলেন দেওঘরে। স্পষ্ট মনে পড়ছে, রাত্রে শোবার সময় বিছানায় ব'সে বেশ স্ফুটকণ্ঠেই প্রার্থনা করেছিলেন মনে আছে—রাজার হুকুমে এই অপমান, এর প্রতিকার তুমি ভিন্ন আর কে করতে পারে? হে দেবাদিদেব! হে আশুতোষ!

আমার চোখেও জল এসেছিল। তারই প্রভাব আমার জীবনে কাজ করেছে। রাজার বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী বিদ্রোহী মনোভাব এইভাবে সৃষ্টি হ'ল তার সঙ্গে অন্তরের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যেই হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ।

অপর প্রভাব এই দেবভক্তিই বলি, আধ্যাত্মিকতাই বলি, নীতি-বাদই বলি তার প্রভাব। একটি গভীর অজ্ঞাত অনুশাসন আমি অনুভব করি; মানব-হৃদয়ের এই অনুশাসনের একটি বেদনাময় আকুতি আমার আছে। এ দুর্বলতা হ'লে আমি দুর্বল। পরাজয় হ'লে আমি পরাজিত।

সে কালকে যতই চেষ্টা করছি প্রকাশ করতে, ততই যেন মনে হচ্ছে ঠিক প্রকাশ করা হ'ল না। প্রথমেই বলেছি, ছোট ছোট জমিদারপ্রধান একটি অঞ্চল, সে অঞ্চলে অকস্মাৎ অভ্যুদয় হ'ল এক লক্ষপতি ব্যবসায়ীর, তাঁর সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে সংঘর্ষ বাধল আমাদের অঞ্চলে। .জমিদার-শ্রেণী যতই বিব্রত বিপন্ন হলেন, ততই তাঁরা ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। ভগবানের তখন বহু মূর্তি। দেবতা তেত্রিশ কোটী, সুতরাং রূপ তাঁর তেত্রিশ কোটীই। ওর মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে—মূর্তি ছিল আসলে দুটি! শক্তিমূর্তি আর বিষ্ণুমূর্তি। মোটামুটিই ধরা যাক আর অতিসূক্ষ্মভাবেই বিচার করা যাক—ধর্মজীবনে ছিল দুটি পথ বা মত—শাক্ত ও বৈষ্ণব। যুগল বিগ্রহ অর্থাৎ রাধা-গোবিন্দ, বাসুদেব, গোপাল, নাড়ু-গোপাল, শালগ্রামশিলা, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ—এই ছিলেন বৈষ্ণবদের দেবতা। তা ছাড়া দুর্গা থেকে সুরু ক'রে মনসা ওলাইচণ্ডী পর্যন্ত সবাই ছিলেন শাক্ত-তন্‌খাভোগী; শিব ঠাকুর থেকে শুরু ক'রে পুরুষ দেবতারাও ওই শাক্ত মতের পথের পাশে বাসা গেড়েছিলেন। গাজনে শিব ঠাকুর উঠতেন, বৈশাখ জৈষ্ঠে ধর্মরাজ, ভাদ্রে ইন্দ্রদেবতা বিশ্বকর্মা—এঁদের সকলের পুজোতেই পাঁঠা বলির ব্যবস্থা ছিল। ছিল কেন, আজও আছে। সুতরাং ওঁরা শাক্তের দলে। তবে মা লক্ষ্মী এবং মা সরস্বতী এঁরা দুজন সবারই পূজ্য এবং এঁরা বৈষ্ণবের দলে, ওঁদের কথা উঠলেই আজও মনে হয়—নারায়ণ ব'সে আছেন মাঝখানে,

দু'পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা—লক্ষ্মী আর সরস্বতী। অদৃষ্ট পরিবর্তনের কামনায় মানতের পরিমাণ বাড়তে শুরু করল এক দিকে, অন্য দিকে যাঁর অভ্যুত্থান হচ্ছে তিনি বাড়াতে লাগলেন সমারোহ।

দেশেও তখন প্রাচুর্য ছিল।

ক্ষেত্র ছিল উর্বর, বর্ষাও তখন এখন থেকে প্রবল ছিল, মাঠে পুকুরগুলিও তখন এখনকার মত এমনভাবে মাঠের সমান হয়ে ম'জে যায় নি, ফসল যথেষ্ট হ'ত। ধান কলাই গম আখ সরষে আলু—এ প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের ক্ষেতে জন্মাত। গোয়ালে ভাল ভাল গাই ছিল, দুধও হ'ত প্রচুর, পুকুরে বড় বড় মাছ থাকত, অভাব দেশে ছিল না; অল্প চার-পাঁচ হাজার টাকা আয়ে রাজার হালে চ'লে যেত। আমার নিজের যখন বারো-চোদ্দ বছর বয়স তখনকার হাটখরচা আমার মনে আছে—সপ্তাহে দুদিন হাটে তরকারির খরচ ছিল—ছ আনা হিসেবে বারো আনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর খরচাটা বাড়ল—বারো আনা থেকে আঠার আনা পাঁচ সিকিতে পৌঁছল। আমাদের বাড়ীর মুদীর দোকানের খরচ ছিল বছরে একশো টাকা। কোন বছর দশ টাকা কম—কোন বার পাঁচ টাকা। বছরে দুবার 'কাপড় কেনার ব্যবস্থা ছিল—আশ্বিনের পুজোর সময় এবং বছরের শেষই বলুন আর পরের বছরের প্রারম্ভের আয়োজনেই বলুন, চৈত্র মাসে আর একদফা কাপড় আসত। পুজোর সময়—শান্তিপুরে ফরাসডাঙ্গার পোশাকী কাপড় থেকে শুরু ক'রে, গুরু পুরোহিত পূজক দেবপূজার কাপড়, বাড়ীর মুদী মোদক জেলে মুড়ীভাজুনী মেথর চাকর বাকর—এসব নিয়ে পাহাড়প্রমাণ কাপড় (তাই বলত লোকে) কেনা হ'ত দোকান থেকে, ফর্দ আসত সত্তর পঁচাত্তর আশী।

পাঁচশো টাকা ঋণ হ'লে গৃহস্থ ভাবত, ঋণে সে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। চাকরের মাইনে ছিল দেড় টাকা, কাপড় কোঁচানো থেকে সকল রকম তরিবত জানা খানসামার মাইনে আড়াই টাকা, মেয়ে-রাঁধুনী থাকত দু টাকা আড়াই টাকায়, পুরুষ-রাঁধুনীর বেতন সাড়ে তিন টাকার বেশী ছিল না। পশ্চিমা দারোয়ানেরা শুখো সাত টাকা মাইনে পেলে বলত—দরকার হ'লে জান ডাল্ দেগা। বাউরী প্রভৃতি জাতীয় যারা গোসেবা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকত, তাদের ছোটরা থাকত পেট-ভাতায়, আর বড়দের মাইনে ছিল বছরে ছ টাকা থেকে নয় টাকা পর্যন্ত।

কাজেই সংসার চালিয়েও মানত দিতে খুব বেগ পেতে হ'ত না। দোষ তাঁদের নেই। আবহাওয়াই ছিল তখন এই। ভাগ্য আর অদৃষ্ট ছাড়া পথ ছিল না। দেবতারা ছিলেন ভাগ্যের কাণ্ডারী। সকাল থেকে বাউল বৈষ্ণব আসতেন ভিক্ষে করতে। খঞ্জনি একতারা বাজিয়ে গান গাইতেন। পদাবলীর গায়কও দু-চারজন ছিলেন। শাক্ত সন্ন্যাসীও আসতেন। প্রচণ্ড জোরে হাঁক মারতেন—চে—ৎ চণ্ডী! কালী কপালী নরমুণ্ডমালী, বন্ধন কাট মা, বন্ধন কাট। মুসলমান ফকির আসতেন, বয়েৎ আওড়াতেন, তাঁদের কারও কারও হাতে চামড়ার আবঁরণীর উপর শিক্‌রে পাখী (বাজ পাখীরই একটি ছোট জাত) থাকত, কেউ কেউ গান গাইতেন—দেশী হাতে তৈরি সারেঙ্গী জাতের যন্ত্র বাজিয়ে। প্রায় সব গানই ছিল গোপাল-হারা মা যশোদার বেদনার গান। কেউ কেউ দেহতত্ত্বের গান গাইতেন—

এই দেহে কিবা ফল—পদ্মপত্রে জল—
এ দেহের মিছে গৌরব করিস মন!

কেউ কেউ পীরমঙ্গল গাইতেন। অঞ্চলে যত পীর আছেন, হিন্দুর জাগ্রত দেবতা আছেন, সবাই ছিলেন পীর, সকলের মহিমাই কীর্তন করতেন তাঁরা। সে কি হিন্দুর দোরে, কি মুসলমানের দোরে, তাঁরা ওই গানই গেয়ে যেতেন—সকলেই ভক্তিপুলকিত চিত্তে শুনত।

পীর বড় ধনী রে ভাই—ঠাকুর বড় ধনী—
পীর গাজী—মুস্কিল আসান কর, পীর গাজী—!
তোমার গোপাল দুগ্ধ খাবেন জন্ম যাবে সুখে—
দুঃখ তোমার দূরে যাবে—অন্ন দিয়ো ভুখে।
পীরের ঘোড়া পীরের জোড়া পীরকে কর দান,
বাত ব্যাধি হইতে মাগো পাইবে পরিত্রাণ।

মস্ত বড় গান। আজও মনে আছে আমার। আরও মধ্যে মধ্যে আসত 'গরুমারা'। অর্থাৎ গোবধ ক'রে প্রায়শ্চিত্তকারী ভিক্ষুক। আমার মনের মধ্যে আজও ছাপ কেটে রয়েছে প্রথম 'গরুমারা'র ছবি। গরমের সময় স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ার উপর তেঁতুল থেকে বীচি ছাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। মা পিসীমা ঝি রাঁধুনী এদের সঙ্গে আমিও ব'সে গেছি; আমার সঙ্গে আছে আমার শৈশবসঙ্গিনী চারু, ডাকনাম নেড়ী; সকলেই এক-একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে তেঁতুলবীচি বের করছি। হঠাৎ সদর-দোরে ডাক উঠল, হাম্‌-বা অ্যা-ম-ব্যা—অ্যাম-ব্যা। সমস্ত শরীর কেমন যেন ক'রে উঠল। দরজায় উঁকি মেরে দেখলাম, ধূলিধূসর কৌপীন পরণে একটি জোয়ান মানুষ হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে এমনি চীৎকার করছে, অ্যা-ম-ব্যা! অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলে যে উদ্বেগ তার বুকখানাকে তোলপাড় ক'রে তোলে—সেই অসহনীয় উদ্বেগ আমার শিশুচিত্তকে অধীর অস্থির ক'রে তুলেছিল।

আমি সমস্ত দিন কেঁদেছিলাম। মায়ের কাছে শুনেছিলাম এই ভাবে বারো বৎসর তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সপ্তাহে দু তিন দিন আসত পটুয়ারা। দ্বিজপদ পটুয়াকে আজও মনে আছে। সুন্দর চেহারা ছিল তার। তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা-রাসলীলা-গৌরাঙ্গলীলার পর পর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত আর গান গেয়ে যেত—

আহা কি মধুর লীলা রে!

পটের শেষের দিকটায় থাকত ধর্মরাজ অর্থাৎ যমরাজার দরবার। বৈতরণী নদী পার হয়ে যেতে হয় দরবারে, যেতেই হবে, না গিয়ে পরিত্রাণ নাই। যমদূতে নিয়ে যাবে। পাপীর কাছে বৈতরণী টগবগ ক'রে ফুটছে। তাকে ঐ নদীর ফুটন্ত জলে ভাসতে ভাসতে যেতে হবে। ওপারে দরবারে ব'সে আছেন ধর্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ব'সে আছেন এই দেখুন হিসেবনিকেশের খাতা নিয়ে।

নীলবর্ণ যমরাজ। রাজবেশ। পালোয়ানের মত গোঁফ, বড় বড় সাদা চোখ। চিত্রগুপ্তের কানে কলম, হাতে খাতা—খতিয়ানের লম্বা খেরুয়া-বাঁধানো .খাতার মত খাতা। তারপর বিভিন্ন পাপে বিভিন্ন নরকে ভূতের মত চেহারা যমদূতের হাতে পাপীদের শাস্তির দৃশ্য—কোথাও অসংখ্য সাপ-বিছে-কাঁকড়াবিছে-পরিপূর্ণ নরকে পাপীকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ফুটন্ত কড়াইয়ে তাদের ভাজা হচ্ছে, কোথাও ঢেঁকির তলায় ফেলে কোটা হচ্ছে, কোথাও আগুনে গলানো লোহার সাঁড়াশী দিয়ে জিভ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। খেজুরগাছে তুলে হাত-পা গাছের সঙ্গে বেঁধে টেনে নামানো হচ্ছে এমনও একটা ছবি ছিল।

সব শেষ ছবিটি ছিল নদীর ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হয়ে ব'সে

আছেন নৌকা নিয়ে। দ্বিজপদ গাইত—ও নামের তরী বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।

বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরত—গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা যেত—মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম--মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ, তেমনি কি ছিল চুল—পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য যে ভারতবর্ষের যে কোন শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি—রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল, বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মত। তেমনি টিকলো নাক, আর তীক্ষ্ণ চোখ।

ওদের গানের দু-একটা মনে আছে।

ও কালীনাগ ডংসেছে লখাকে—বাসর ঘরেতে—
বেউলা কাঁদে পতির শোকে প'ড়ে ধূলাতে।
কালী—না—গ।

আর একটা গান—

ও জানি না গো—ও গো—এ—মন হবে।
গোকুল ছাড়িয়ে কালা মথুরাতে যাবে।

আর একটা গান—

কালিদহের ও নাগিনী ফুঁসিস না—এমন ক'রে ফুঁসিস না।
ও তারে—দেখলে লাজের মাথা খাবি, তাও কি মরণ বুঝিস না।
ও নাগিনী ফুঁসিস না।

কালো কেউটে সাপ অত্যন্ত হিংস্র। মানুষকে এরা তাড়া ক'রে কামড়ায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে নাই তা নয়। একটি কেউটে সাপের সঙ্গে আমার এক সময় নিত্য দেখা হ'ত। কিন্তু সে কখনও মাথা তোলে নি। সাড়া পাওয়া মাত্র চ'লে যেত। তার কথা পরে বলব। কিন্তু সাধারণ ভাবে কেউটের স্বভাব হিংস্র এবং এরা তাড়া ক'রে যায় মানুষকে। আমিও তাড়া খেয়েছি অন্য কেউটের দু-চারবার। এই বেদেরা আশ্চর্য। এরা তাড়া ক'রে ধরে এই সব সাপ। দেখেছি, বেদের মেয়ে বর্ষার ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে চলেছে। আশ্চর্য হয়েছি—কি ব্যাপার! তারপরই দেখেছি প্রকাণ্ড একটা কেউটের মুখ মুঠিতে ধ'রে অন্য হাতে লেজটা টেনে ধ'রে আক্রোশভরে সাপটাকে বলছে—আমার হাত থেকে, যমের হাত থেকে তু পালাবি? মাত্র হাত দেড়েক লম্বা একটা পাচনি ছড়ি হাতে নিয়ে—সদ্য-ধরা সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু দুলিয়ে নাচাতে দেখেছি, গাইতে শুনেছি—"ও নাগিনী ফুঁসিস না।"

পটুয়ারা এবং বেদিয়ারা ধর্মে মুসলমান। বহুকাল পর্যন্ত এ তথ্য জানতাম না। দ্বিজপদ পটুয়া, রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার হৃদ্য একটি সম্পর্ক জন্মেছিল। দ্বিজপদের সুন্দর চেহারা এবং রাধিকার একপিঠ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ণ চোখ যেন আকর্ষণ করত আমাকে। রাধিকা এক-একদিন বাঁদর নিয়ে নাচাতে আসত। গাইত—

হীরেমন নাচ দেখি লো!
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে, বাহার ক'রে,
ও হীরেমন নাচ দেখি লো!
যেমন আমার খোকাবাবুর চাঁদমুখ
তেমনি বিদায় পাবি লো!

আমার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলত—মায়ের কাছে একখানা শান্তিপুরে শাড়ী এনে দাও খোকাবাবু, হ্যাঁ।

তা আমি দিয়েছিলাম। মা একবার পুরানো একখানা শান্তিপুরে শাড়ী তাকে দিয়েছিলেন। সে কাপড়খানা আমাদের বাড়ীতেই প'রে হেলে দুলে চ'লে গিয়েছিল। বুড়ী রাধিকা একদিন আমায় বললে—তখন আমি কংগ্রেসের কাজ করি—২৩৷২৪ সালে বোধ হয়। বললে—হ্যাঁ, খোকাবাবু, দাড়কার অবনীশবাবু যে আমাদিগে হিঁদু হতে বলছে, কি করি বল তো?

দ্বিজপদও বলেছিল। কয়েকদিন পর সেও এসেছিল, সেও বললে। তখন জানলাম ওরা ধর্মে ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

আর এক দল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়। পুরুষেরাও ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এরা গান বাঁধে। মনে আছে ছেলেবেলায় শুনেছি—

ও—মহারাণীর মিত্যু হ-ই-ল।
ও—বড়লাট ছোটলাট কাঁদিতে বসিল।

এদের কাছেই খুদিরামের ফাঁসীর গান শুনেছিলাম। ওরা বলেছিল—আমাদের বাঁধা গান।

ও—বিদায় দে মা—ফিরে আসি।

এদের মেয়েরা কিন্তু অদ্ভুত। বেশভূষায় এমন বিলাসিনী যে দেখবামাত্র মনে হয় ওরা নৃত্যব্যসায়িনী নটী। গায়ে গিল্টির গয়না, পাছাপাড় সৌখীন শাড়ী—দেহের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে প'রে, নাকের নথ দুলিয়ে, ভুরু টেনে, হেলে দুলে, সুর ক'রে কথা ব'লে গৃহস্থের দোরে এসে দাঁড়ায়—ভিক্ষে পাই মা, সোনাকপালী,

স্বামীসোহাগী, চাঁদবদনী, রাজার রাণী! কোমরে হাতের কন্থুই দিয়ে ধ'রে রাখে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িটা রেখেই বলে—নাচন দেখাই মা, দেখ। ব'লেই আরম্ভ ক'রে দেয়, ছুই হাতে তুড়ি মেরে, দেহখানি নৃত্যদোলায় ছুলিয়ে দিয়ে গান ধরে—

উর্‌র্‌র্—জাগ—জাগ—জাগিন ঘিনা—জার ঘিনি না—
উরুর-র—

অদ্ভুত মিষ্ট ভাষা এদের। তেমনি কি নাছোড়বান্দা। হাঁক দিয়ে দাঁড়ালে যদি গৃহস্থ বলে—ভিক্ষে দিতে নেই, বাড়ীতে অসুখ।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরে দরদ মাখিয়ে সুরেলা উচ্চারণে ব'লে উঠল—বালাই ষাট, ও কথা বলতে নাই মা—শত্রুর অসুখ হোক। হাত জোড়া আছে বললে, বলে হাতের কঙ্কন নাড়া দিয়ে জোড়া হাত খুলে ফেল রাজার মা, বাবু-সোহাগী! এদের বাজী অর্থাৎ যাছুবিগ্যার পারদর্শিতা অদ্ভুত। এরা বলে অনেক কথা—টাকু মোড়ল ব'লে কে এক ওস্তাদ ছিল; তার দোহাই দিয়ে বাজী দেখাত।

আরও আসত সত্যকারের বেদের দল।

তাঁবু, গরুর গাড়ী, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচ শো পর্যন্ত লোক থাকত। নানা ধরনের বেদে দেখেছি। সেকালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, একফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মত দেহ, তারা আসত—পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর; এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে প্রান্তরে শিকার ক'রে আনত খরগোস, সজারু, ইঁছুর, গোসাপ, শেয়াল, বড়

বড় ধামিন সাপ। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়-হয়, তখন তারা শিকার ক'রে ফিরত, অস্পষ্ট আলোয় ছায়ামূর্তির মত দেখাত, কাঁধে বাঁকে ঝুলত রাশীকৃত মৃত জন্তু সরীসৃপ। এদের মেয়েরা গ্রামে দুপুরে ভিক্ষা করত। মাটির ঝুমঝুমি, খেজুরপাতায় বোনা থলে বিক্রি করত। দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠত—এ খোকার মা; ঝুমঝুমি লেবি? কিনলেও বিপদ, না-কিনলেও বিপদ, ঝগড়া কোনক্রমে বাধিয়ে কিছু-না-কিছু কেড়ে নিয়ে পালাত।

অপেক্ষাকৃত সভ্য বেদের দল আসত।

ইরানীরা আসত। এদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত। ছুরি কাঁচি বিক্রি করে। মাথায় ডবল বেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা পাঞ্জাবি পরে মেয়েরা। মাথায় পাগড়ী বা মেমটুপী পাজামা পাঞ্জাবি পরে পুরুষরা দল বেঁধে গ্রামে ঢুকত। দর করলে নিতেই হ'ত জিনিস। এবং যে দাম বলত—সেই দামই আদায় করত। আমাদের বাড়ীতে যোগেশদাদা নায়েব ছিলেন। ভারি ভাল মানুষ, সুপুরুষ, গৌরবর্ণ মানুষ, মাথায় লম্বা চুল, গোঁফ-দাড়ীতে মানুষটিকে মানিয়েছিল চমৎকার। সাধু ভাষায় কথা বলতেন। তিনি একবার একটি ইরানী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ্যায়?

বেণী দুলিয়ে উদ্ধত যাযাবরী ছুটে সিঁড়ি বেয়ে এসে সেলাম ক'রে বললে—ছুরি আসে, কাঁইচি আসে, ক্ষুর আসে—দেকো-দেকো-দেকো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে পসরা খুলে ব'সে গেল ইরানী মেয়ে। টক্‌টকে রঙ, মাথায় লাল রুমাল, গায়ে গাঢ় নীল সবুজ পাঞ্জাবি, কালো দুটো বেণী, খাটো কিন্তু মোটা। যোগেশ-দাদা একখানা ক্ষুর নিয়ে দেখে বলছিলেন—আচ্ছা নেহি।

—আচ্ছা নেহি? ইরানী মেয়ে ফোঁস ক'রে উঠল।—আচ্ছা নেহি? ব'লে এক হাতে যোগেশদাদার হাত চেপে ধ'রে অন্য হাতে ক্ষুরখানা ধ'রে বললে—বলো, কাটেগা?

—আরে? কাটেগা কি? না—না—

খিলখিল ক'রে হেসে মেয়েটা যোগেশদাদার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—তবে দেকো! ব'লেই ক্ষুরটা বসিয়ে দিলে নিজের হাতে। অল্পই বসালে অবশ্য। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল। হেসে রক্ত দেখিয়ে বললে—দেকো। ক্যায়সা দার হ্যায় দেকো। আব লেও।

যোগেশদাদা বললে—না। নেব না। তুই ভয়ানক—

ভয়ানকই বটে, ইরানী মেয়েটা খপ ক'রে যোগেশদাদার দাড়ি চেপে ধ'রে বললে—তব তুমার দাড়ি লে লেগা! হামারা ক্ষুর দেখানেকা দাম।

আর আসত সভ্য বেদে। আজকাল অনেকেই এদের জানেন না। মস্ত দল, ঘোড়া গরু মহিষ তাঁবু কুকুর—সরঞ্জাম অনেক। এরা সব কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেউ সাজত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কপালে তিলক, গলায় তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু, বেশ সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে এসে দোরে দাঁড়াত। এদের একটা ভিক্ষের বুলি আমার আজও মনে আছে—সীত্যারাম—সীত্যারাম। বাড়ীর মঙ্গল হোবে রাম। সাধু বিদায় করো রাম। ব'লেই যেত, ব'লেই যেত—রাজ্য পাবে, পুত্র পাবে, মনের মত পত্নী পাবে। তেমন ভক্তিমান দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলত—ধরো, ধরো। রামজী স্বপ্ন দিয়া তুমকো দেনেকো লিয়ে, ধরো। গৃহস্থ শঙ্কিত হয়ে হাত বাড়াত। পেত একটা তামার মাদুলী। সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলত—দে দক্ষিণা।

একশো—পঞ্চাশ—পঁচিশ—পাঁচ। শেষে এক টাকায় এসে চোখ রাঙা ক'রে বলত—ভস্ম ক'রে দেব। শাপ দেব।

৬

শুধু কি এরাই সেকালের সব? আরও ছিল। বলতে গিয়ে কথা ফুরোয় না। ডাইনী ছিল—স্বর্ণ ডাইনীকে মনে পড়ছে। শুকনো কাঠির মত চেহারা, একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, হাটে তরিতরকারী কিনে গ্রামে ঘরে বেচে বেড়াত। চোখ দুটো ছিল নরুনে-চেরা চোখের মত ছোট। দৃষ্টি তীক্ষ্ণই ছিল, কিন্তু ডাইনী শুনে মনে হ'ত সে চোখ যেন আমার বুকের ভেতরটা ভেদ ক'রে ঢুকে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা খুঁজে খুঁজে ফিরছে। স্বর্ণ গ্রামে বড় কারও ঘরে ঢুকত না। আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমরা স্বর্ণপিসী বলতাম। বেচারী গ্রামের ভদ্রপল্লী থেকে দূরে—জেলেপাড়ার মোড়ে একখানি ঘর বেঁধে বাস করত। সে পথে যেতে-আসতে দেখেছি, বুড়ী ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে ব'সে আছে। চুপ ক'রে ব'সে আছে। কথা বড় কারও সঙ্গে বলত না। কেউ বললেও তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত। তার শেষ কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ ক'রে সে মনে মনে শিউরে উঠত। কাউকে দেখে চোখে ভাল লাগলে, সে সভয়ে চোখ বন্ধ করত; চোখের ভাল-লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। দুই ক্ষেত্রেই তার শঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে, হয়তো বা ফেলেছে, বিষাক্ত-

তীরের মত তার লোভ গিয়ে ওদের দেহের মধ্যে বিঁধে গিয়েছে সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না, স্বজন ছিল না। রোগে যন্ত্রণায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে।

ডাইনী স্বর্ণ একাই ছিল না, আরও ছিল। কিন্তু স্বর্ণের মত অপবাদ কারুর ছিল না। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমার চোখের উপর ভাসছে। জীবনে ভুলতে পারব না শৈশবের দেখা সে ছবি। বলব ঘটনাটি।

আমাদের বাড়ীতে ছিলেন আমাদেরই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-কন্যা। রান্নার কাজ করতেন। আমি তাঁকে বলতাম 'দাদার মা'। তাঁর ছোট ছেলেটিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন আমাদেরই বাড়ীতে। অবিনাশ-দাদার উপর ছেলেবেলায় আমার গভীর আসক্তি ছিল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে আঁকড়ে থাকতাম, স্কুলে যাবার সময় তিনি বিপন্ন হতেন। তিনিও আমাকে গভীর স্নেহ করতেন। নইলে ছোট একটি ছেলেকে ভুলিয়ে রাখার মত সম্পদ তাঁর কিছু ছিল না। অবিনাশদাদার গল্প-ভাণ্ডারে একটি মাত্র গল্প ছিল,—'ব্যাজারে ব্রাহ্মণের গল্প'।—এক ব্রাহ্মণ মাঠে গিয়েছেন। এক জায়গায় কুল-কাঁটা ছড়ানো ছিল, ভুল ক'রে তারই উপর গিয়ে পড়েছেন আর পায়ে কাঁটা ফুটেছে। সে কাঁটা বের করতে গেলেন, এদিকে অন্য পাটি ট'লে পড়ল কাঁটার উপর, তাতে ফুটল কাঁটা। এ পা মুক্ত ক'রে নামিয়ে সে পায়ের কাঁটা তুলতে তুলতে টলল এ পা। ফুটল কাঁটা। মোট কথা কাঁটা আর ছাড়ে না। ব্রাহ্মণের একেই ব্যাজার স্বভাব, তার উপর এই ব্যাপার। ক্ষেপে গেলেন ব্রাহ্মণ এবং দুই পায়ে সেই কাঁটা ছড়ানো ঠাঁইটুকুর উপর ভ্যাঁক ভ্যাঁক ক'রে লাথি মেরে নাচতে লাগলেন আর চ্যাঁচাতে লাগলেন—ভোঁক

ভোঁক—ভোঁক—ভোঁক। আমাদের দেশে 'কাঁটা ফোটা' বলে না; বলে—কাঁটা ভোঁকা, কাঁটা ভুঁকেছে। এইটুকু গল্প। কিন্তু সে থাক্। গল্প একটিই হোক আর যত তুচ্ছ সামান্যই হোক, অবিনাশ-দাদার মূল্য আমার কাছে অসামান্য ছিল। একদা খবর পেলাম অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনী খেয়েছে। ডাইনে নজর দেওয়াকে আমরা বলি—ডাইনে খাওয়া। প্রবল জ্বরে অবিনাশদাদা অচেতন। দাদার মা তখন তাঁর নিজের বাড়ীতে থাকেন, আমাদের বাড়ীতে কাজ করেন না, কাজ করেন তাঁর বড় মেয়ে সাতনদিদি। সাতনদিদিই সকালে কাঁদতে কাঁদতে এলেন। খবর পাঠানো হ'ল গোঁসাই-বাবার কাছে। 'ধাত্রীদেবতা'র রামজী সাধু। তখন তিনি আমাদেরই বাগানে তারা-মায়ের আশ্রমে থাকেন। প্রায় আমাদের সংসারেরই একজন। আমারই মায়ার ডোরে সন্ন্যাসী আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছেন। গোঁসাই-বাবা ডাইনের ওঝা ছিলেন। মন্ত্র জানতেন। তাঁরই সঙ্গে, বোধ হয় তাঁরই কোলে চেপে, গেলাম দাদার মায়ের বাড়ী। উঠান তখন লোকে লোকারণ্য। সনা ডাইনে খেয়েছে অবিনাশকে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার অর্থাৎ মাটির দোতলায় অবিনাশদাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। ডাকলে সাড়া নাই। প্রবল জ্বর। মাথার শিয়রে দাদার মা ব'সে। ও-পাশে ব'সে অবিনাশদাদার দুই বোন। গোঁসাই-বাবা ডাকলেন—মামা! গোঁসাই-বাবাকে দাদার মা 'গোঁসাইদাদা' বলতেন, সেই হেতু অবিনাশদাদা তাঁকে বলতেন, রামজীমামা। সাধু অবিনাশদাদাকে বলতেন ভাগ্না, কখনও মামা।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদাদা!

—অবিনাশ!

অবিনাশ এবার ঘুরে শুল।—মর্, হাঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে আমাকে কি বলিস তুই?

—তু কৌন রে?

চুপ ক'রে রইল অবিনাশ।

—কৌন তু?

—বলব না।

—বলবি না?

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হ'ল। বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়েন রামজী সাধু আর মধ্যে মধ্যে ফুঁ দেন—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

অবিনাশ চীৎকার ক'রে উঠল পরিত্রাহি চীৎকার। বলছি—বলছি—বলছি।

তবু মন্ত্র পড়া চলল।—ছুঁ—ছুঁ—ছুঁ।

—বাপ রে, মা রে! ও গোঁসাই, আর মেরো না। বলছি, আমি বলছি।

—বোল, তু কৌন?

—আমি স্বর্ণ। স্বর্ণ ডাইনী!

—তু কাহে এখানে? আঁ?

—আমি একে খেয়েছি যে!

—খেলি? কাহে—কাহে খেলি?

—কি করব? আমার ঘরের ছামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে দাও?

—কি ক'রে বলব ? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা। ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে ব'লো না।

আদেশের সুরে গোঁসাই বললেন—যা তু। হামি বলছে।

—না। বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না ? আচ্ছা। এ দিদি, আন্ সর্ষা।

সরষে এল। হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ে—ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা--বাবা রে, মা রে, ওরে, মেরে ফেললে রে! ওরে বাবা রে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না। আমি যাচ্ছি।

—যাবি ?

—হ্যাঁ, যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না ? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ ? হাত তুললেন রামজী সাধু মারবেন ছিটে। অবিনাশ চীৎকার করলে আবার—না না! যাব, যাচ্ছি।

—যাবি ?

—হ্যাঁ, যাবো।

—তব এক কাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে। দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবা বললেন—না। ঘর থেকে অবিনাশ বের হ'ল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধ'রেই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খ'সে প'ড়ে গেল, সে নিজেও প'ড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্যযুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলা ক'রে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোঁসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি। এবার গোঁসাইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ! মামা!

—অ্যাঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশ দাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী-আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা মার খেয়েছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

অনেকদিন পর, তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারী নিয়ে আসত। শুনলাম ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে

স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ী। আমার ভয় চ'লে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় ব'সে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে আছে। নিঃসঙ্গ, পৃথিবীপরিত্যক্ত স্বর্ণ। কখনও কথা বলতে সাহস হ'ত না। কি জানি, স্বর্ণ যদি সেই ডাইনী-মন্ত্র স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ ক'রে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে বলে, তোকে দিলাম। তবে আমি যে ডাইনী হয়ে যাব। স্বর্ণ পাবে জীবন থেকে মুক্তি।

কথাটা আমাকে বলেছিলেন আমার পিসীমা। আতঙ্কে এক রাত্রি ঘুম হয় নি। মাকে বলতে তিনি হেসে বললেন—জানি নে বাবা, সত্যি মিথ্যে কি। সত্যি ব'লে আমার মনে হয় না। তবে ও তোমার এমন অনিষ্ট করবে কেন? স্বর্ণ আমাকে ভালবাসে। তোমাদেরও ভালবাসে। তা ছাড়া, কই, অবিনাশের ওই ঘটনার পর আর তো স্বর্ণকে দিয়ে কারুর অনিষ্ট হয় নি?

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশত্থগাছ ছিল। মাঠটায় চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হ'ত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরম কালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে ব'সে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব

মিলে আমোদ আহ্লাদ করছে, এমন সময় আকাশ-পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হ'ল—এ কি?

গুণীন হেসে বললে—গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে? কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে ব'সে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তর। ডাকিনী চলছে আকাশ-পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে একটা চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, .এক সঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠল, ঈ—

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেই চলল। মেঘের মত জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সামনে সে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নামল এক অশত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামে নি। মাটি ফাটল, শিকল সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এইখানে জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারও চেয়ে বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, একপিঠ এলোচুল, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে

এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হ'লেও মেয়ে! আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন নেমে হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর সইল না; একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমক দিলে—না।

ততক্ষণে আর একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিলে গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিক ঢেকে, হেঁট হয়ে, পায়ের দিকের গামছার প্রান্তটা ধ'রে উপর দিকে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার ক'রে ফেলে দিলে। গুণীন মর্মান্তিক চীৎকার ক'রে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়া পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল! চামড়া-ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ ক'রে উঠল। ডাকিনীর খিল-খিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল; মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটার আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চ'লে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

এর উপর ছিল ভূত।

আমাদের বাড়ীর গলিতে—বাড়ী থেকে বৈঠকখানা ও সদর রাস্তা যাবার পথে জ্যাঠামশায়দের ডুমুরগাছে ভূত ছিল। শিউলিগাছে ব্রাহ্মণ-প্রেত ছিল। এই গলিপথ নিচের দিকে ছিল সর্পসঙ্কুল—অন্য দিকে মাথার উপরটা ভূত-অধ্যুষিত। সে কি বিপদ শিশুর পক্ষে! বারো-চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত গলির মুখে এসেই ঢুকতাম আমাদেরই বাড়ীর দৌহিত্র-বংশের এক বাড়ীতে। সকাতরে বলতাম—ওগো, আমাকে একটু দাঁড়িয়ে দাও।

সাপের ভয় আমার ছিল না। কোন কালে, আজ পর্যন্ত, আমি একলা যখন যাওয়া-আসা করেছি, কখনও আলো হাতে যাবার প্রয়োজন অনুভব করি নি। মোটামুটি ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ওদের চলাফেরা বুঝতে পারি। গ্রামের মধ্যে যে সব সাপ বাস করে, তারা মানুষের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে বাস করে—এটা আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি। বিপদ মাঠের সাপের কাছে। তারা মাঠে থাকে, মানুষকে তারা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। তাও, উত্তরকালে, আমি যখন কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলাম আবাদ করে সোনা ফলাবার জন্য—তখন এক কালো কেউটের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়েছিল। প্রায় নিত্যই আমার সঙ্গে দেখা হ'ত তার। পরে তার বাসাও আবিষ্কার করেছিলাম। একবার প্রবল বৃষ্টিতে দেখেছিলাম, তার বাসাটার উপরে মাটি খুলে একরাশি ডিম জলের স্রোতে ভেসে গেল। তখন জানলাম, সাপটি নারীজাতীয়া—নাম দিয়েছিলাম তার কালকূটী!

ভূত থেকে সাপের কথায় এসে পড়েছি! সাপের কথা থাক্।

আমাদের গলিতে ডুমুরগাছের ভূত আমাকে উত্যক্ত করেছে।

শিউলিতলার ব্রাহ্মণের বিবরণ বিচিত্র। ইনি ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা দেন। দেখা দেন কালপুরুষের মত। তিনি দেখা দিলেই বুঝতে হবে, আমাদের কয়েক বাড়ীর মধ্যে কারুর ডাক পড়েছে।

আমাদের বাড়ীর গলির ওপাশে ছিল ভটচাজদের বাড়ী। গল্প শুনতাম এই বাড়ীর রমাই ভূতের। রমাই বাড়ীর চালের সাঙায় পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকত। তার শিশু ভাইপো বিছানায় কাঁদলে তাকে বিছানা-শুদ্ধ তুলে সাঙায় নিয়ে দোল দিত। আরও অদ্ভুত কাণ্ড রমাই ভূতের। শুনেছি, নাকি কাঁদীর রাজবাড়ীতে রাস উৎসবের খুব সমারোহ হয়। খাওয়া-দাওয়া দু-তিনটে জেলার মধ্যে বিখ্যাত।

একবার বাড়ীর মেয়েরা রাসপূর্ণিমার দিন ওই রাজবাড়ীর খাওয়া-দাওয়ার গল্প করছিলেন। একজন বলেছিলেন—মিছে গল্প ক'রে কি হবে? খাওয়াচ্ছে কে? পর-মুহূর্তেই রামাইয়ের কথা মনে ক'রে বলেছিলেন—রামাই যদি ভাই দয়া করে তবে নিশ্চয় সাধ মেটে, খেতে পাই!

বাস্; ঘণ্টা খানেক যেতে না-যেতে শূন্যলোক থেকে নেমে এল দুই চ্যাঙারি। লুচি, মালপো, মিষ্টিতে বোঝাই।

এর পর আর ভূত বিশ্বাস না-ক'রে উপায় আছে?

ভূতের গল্প মাও বলতেন কিন্তু ভূতকে ভয় ছিল না তাঁর। সে কথা আগে বলেছি। ডুমুরগাছের ভূতের ভয় আশ্চর্যভাবে আমার কেটেছিল। সে কথা এখানে নয়, পরে বলব।

ডাইন ডাকিনী ভূত প্রেত-সমাকুল আমার সে কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতিদিনই এদের কারুর না কারুর বা কোন দলের না কোন দলের সঙ্গে দেখা হ'তই।

আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় ক'রে এসেছে ঠিক এই কারণেই। কলকাতায় ম্যাজিকওয়ালারা বা বাজীকরেরা যারা তাঁবু খাটিয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিতরে কাচের জারের মধ্যে আরকে ডুবানো মরা ছটা পা ছুটো মুণ্ডুওয়ালা ছাগলের বাচ্চা দেখায়, তাদের মত বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য আমি এদের খুঁজে পেতে আনি নি। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট কাহিনী বলব আমার সাহিত্যক জীবনের।

রবীন্দ্রনাথর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের সময়ের কথা। আমার 'ছলনাময়ী' গল্পের বইয়ে "ডাইনীর বাঁশী" গল্পটি আছে। স্বর্ণ ডাইনীর গল্প। রবীন্দ্রনাথ নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বললেন—ডাইনীর গল্পটি ভাল হয়েছে। খুব ভাল লেগেছে আমার। আমি কলকাতায় কয়েকজনের কাছে বললাম। একজন বললেন—আমাদের দেশে উইচ নিয়ে গল্প? গল্পটি নিশ্চয় বিদেশী গল্প থেকে নিয়েছে।

আমি তাঁর কথার মধ্যেই ব'লে উঠলাম—না। ও আমার দেখা। আর আমি তো ইংরিজী ভাল জানি না, আমার গ্রামে ইংরিজী বই পড়ারও সুযোগ নেই। স্বর্ণ ডাইনী আমাদের বাইরের বাড়ীর পুকুরের ওপারে থাকত। তাকে আমি দেখেছি। আমি—

হেসে তিনি বললেন—আমিও তাঁদের তাই বলেছি। এ তারাশঙ্করের দেখা ডাইনী, সে তাকে দেখেছে। পড়তে পড়তে আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণ ছুপুরবেলা ব'সে আছে আর সামনের তালগাছটার মাথায় চিলটা ডাকছে। আমাদের দেশের এঁরা ইউরোপের উইচক্র্যাফ্টের কথা অনেক পড়েছেন। শহরে থাকেন, গ্রামের ডাইন দেখেন নি। তাই উইচ নিয়ে গল্প হ'লেই মনে করেন, বিদেশ থেকে না ব'লে ধার করেছে।

এরই মধ্য থেকেই, মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকুতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ।

আমার মায়ের মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা ছাড়াও আর এক উপাদেয় ধারায় পেয়েছিলাম এই শিক্ষা—মায়ের গল্প বলার কথা আগে বলেছি। নিত্য সন্ধ্যায় শুনতাম গল্প। যে দিন চুল বাঁধতে বসতে হ'ত, সেদিন চুল বাঁধার সময় গল্প বলতেন।

"এক ছিল রাজা।
রাজার দুই মেয়ে।"

বলতেন সত্যপ্রিয়ের কাহিনী। আমার 'শ্রীপঞ্চমী' নামে ছেলেদের গল্পের বইয়ের প্রথম গল্প। সত্যই একমাত্র প্রিয় ছিল কুমারটির, শ্রেয়ই হয়েছিল তার প্রেয়। তারই কাহিনী থেকে পেতাম পথের নিশানা। সত্যই একমাত্র পথ।

গল্পের শেষে মা বলতেন—

কহনী হ্যায় সাচ্চা,
বলনেবালা ঝুটা,
শুননেবালা সাচ্চা।

বলতেন—আমি বললাম বানিয়ে। কিন্তু তুমি সত্যি, আর গল্প সত্যি। গল্প তুমি কোনদিন ভুলবে না।

৭

ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে, সেকালের গল্পগুলির মধ্যে, অন্তত আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে, আশ্চর্য ভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।

একালে অনেক পুরাকালের গল্প-সংগ্রহ বেরিয়েছে; 'ঠাকুরদার

ঝুলি,' 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি' আরও অনেক। এগুলির মধ্যে আমার শোনা গল্পগুলি পাই নি। এর কারণ বোধ হয় আমার শোনা গল্পগুলির উৎপত্তিস্থান বাংলা দেশ নয়। আমার প্রথম গল্পকথক আমার মা। তাঁর জন্ম পাটনা শহরে, মানুষও তিনি পাটনায়। তিনি বলতেন যে সব গল্প, তার অধিকাংশই তিনি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের ঝিয়ের কাছে। বলতেন—বুড়ী দাঈ। বুড়ী দাইকে তাঁর কি শ্রদ্ধা আর মমতা ছিল। ওই সত্যপ্রিয়ের কাহিনীর কথা এর আগে উল্লেখ করেছি; কাজলহারার কথা বলেছি; আর একটা গল্প তাঁর 'ঘাসেড়ানন্দনের গল্প'। ঘাসেড়ানন্দন শব্দটাতেই হিন্দী ভাষার গন্ধ আছে। তবে আমার মা তাকে আশ্চর্যভাবে আত্মসাৎ ক'রে একেবারে বাঙালীর গল্প ক'রে তুলেছিলেন। এই সেদিনও, বোধ হয় মাস তিনেক আগে (১৩৫৭ সালের ভাদ্র মাসে), সেই গল্প তিনি আমার পৌত্রকে শোনাচ্ছিলেন। আমিও বসলাম পাশে। মা হাসলেন। আমার পিঠে হাত দিয়েই যেন আমাকেই বলতে লাগলেন। এক জায়গায় নানা খাবারের কথা আছে। তিনি ব'লে গেলেন—মল্লিকা ফুলের মত সাদা সুগন্ধ অন্ন, কাঁচা সোনার মত রঙের সোনামুগের দাল, শাক শুক্তো দালনা, নানা রকমের ভাজা, ঝোল ঝাল অম্বল চাটনি, দই পায়স ক্ষীর পিঠা, নানাবিধ মিষ্টান্ন রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, চমচম, বরফি—অনেক নাম ক'রে গেলেন। কিন্তু কোনটি বিহারের বিশেষ খাদ্য নয়। এই গল্পটির মধ্যে বড় হ'ল বন্ধুপ্রীতি, সত্যপ্রীতি, এবং বীর্যবানের বীর্য। রাজকন্যাও আছে, মায়াবিনী ডাকিনীও আছে, কিন্তু সে সব কিছুই মনে থাকে না। মনে থাকে, বন্ধুর কাছে সত্য গোপন করেছিলেন ব'লে মহাবীর ঘাসেড়ানন্দন তাঁদের বললেন—ভাই, তোমরা বন্ধু, তোমাদের ভোলা

অসম্ভব, ভুলতে কখনই পারব না জীবনে। তবে ভাই, সত্য হ'ল তার চেয়েও বড়। সেই সত্যকে আমার কাছে গোপন করেছ তোমরা; সুতরাং আজ থেকে বুকের বন্ধুত্ব বুকে রেখে আমরা পৃথক হলাম। যখন আহার করব, তখন চারজনের আয়োজন করব, চার পাতে সাজাব, আগে তোমাদের তিনজনকে নিবেদন ক'রে তবে নিজে খাব। চারজনের মত আয়োজন যদি না জোটে, তবে যা জুটবে তাই চার ভাগ ক'রে তিন ভাগ তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে আমি এক ভাগ খাব। তিন ভাগ বিতরণ ক'রে দেব দীনদুঃখীকে।

তিন বন্ধু চ'লে গেলেন একদিনে। তাঁরাও তাই স্বীকার করলেন। দোষ মেনে নিলেন। বললেন—এই মিথ্যা বলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যদি পারি তো দেখা হবে।

দেখা অবশ্যই হয়েছিল। এবং গল্প শোনার পরমানন্দের মধ্যে ওই কথা কয়টিই কানে বাজত। ওই তো সেই প্রাণপুরুষের সন্ধানের রহস্যমন্ত্র!

গল্প শোনার পর্বকে বলতে পারি—আমার হাতেখড়ির আগে মুখে মুখে জীবনের বর্ণপরিচয়ের চেষ্টার প্রথম পর্ব। এই পর্বের মধ্যে মায়ের পরই হলেন আমার গোঁসাইবাবা রামজী সাধু। তিনি আমাদের গ্রামের ফুল্লরা মহাপীঠে তীর্থভ্রমণে এসে আমার বাবার আধ্যাত্মিক চর্চার পরিচয়ে আকৃষ্ট হয়ে বাবার পরম বন্ধুতে পরিণত হন। গ্রামপ্রান্তে একটি প্রান্তরে বাবা তখন একটি বাগান তৈরী করাচ্ছিলেন। সেই বাগানটির মধ্যে সন্ন্যাসী বন্ধুর জন্য একটি আশ্রম তৈরী ক'রে দেন এবং সন্ন্যাসীর অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি মন্দির তৈরী করে সেখানে শারদ শুক্লাচতুর্দশীতে তারাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। যে বৎসর তারা-পূজার প্রবর্তন

হয় সেই বৎসরেই ঠিক দশম মাসে আমার জন্ম হয়, সেই কারণেই আমার নাম হয় তারাশঙ্কর। এই কারণেই এই সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে হাতে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরী করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পাণ্ডে। সন্ন্যাসী-জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু। আমার ভাগ্যক্রমে রামজীবাবা—আমার গোঁসাইবাবাও—ছিলেন অদ্ভুত দক্ষ কথক। আমার জীবনে চারজন প্রথম শ্রেণীর গল্প-কথকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমার মা, আমার গোঁসাইবাবা, আর দুজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি পরিণত বয়সে—একজন প্রায় আমার সমবয়সী, তিন চার বৎসরের বড়—তাঁর নাম গৌর ঘোষ। অপর জন ত্রিকাল ভট্টাচার্য—অকস্মাৎ অপরিচিত মানুষটি এসে আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন। ত্রিকাল ভট্টাচার্য এককালে ছিলেন পেশাদার গল্প-বলিয়ে, তাঁর মত গল্প-কথক বাংলাদেশে আর কেউ আছেন বলে কল্পনা করতে পারি না। গৌর ঘোষ আশ্চর্য রকম ভাল ভূতের গল্প জানে এবং বলতে পারে। গৌর ভূতের ভয়ে চটি ফেলে ছুটে পালাত, কিন্তু সে যখন ভূতের গল্প বলত তখন ভূত যেন মজলিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বলত—হঠাৎ উ-স শব্দ হ'ল, ছাদ ফুঁড়ে সড়-সড়-সড়-সড় ক'রে নেমে এল একটা সুতো, তারই ডগায় ঝুলছে একটা সদ্যজাত ছেলে, ছেলেটা ওঁয়া-ওঁয়া ক'রে কাঁদছে। গৌর নিজেই ওঁয়া ওঁয়া শব্দে কঁকিয়ে উঠত, আর মজলিসশুদ্ধ লোক আঁ শব্দ ক'রে আঁতকে উঠত। রামজীবাবা ভাঙা বাংলায় হিন্দুস্থানী রূপকথা বলতেন। "সহবত অসর, না—তরুম্ তাসীর? জন্মগুণই বড়,

না, শিক্ষা সহবতের গুণ বড়?" তাঁর গল্পের বড় হ'ত শিক্ষার গুণ, জন্মের গুণকে খাটো ক'রে বলতেন—বাবা সহবৎ—সহবৎই হ'ল সবচেয়ে বড় কথা। রাজার ছেলে মুরুখ হ'লে সে ভূত, সে জানোয়ার। সন্ধ্যায় আসতেন--আমি পড়া সেরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতাম, রাস্তার দিকে কান পেতে থাকতাম, রাস্তার উপর কখন সবল পদধ্বনি বেজে উঠবে, তার সঙ্গে ঝনাৎ ক'রে বাজবে তাঁর চিমটার কড়ার শব্দ। তিনি বৈঠকখানার ফটকে ঢুকেই হেঁকে উঠতেন, "নমো নারায়ণায়।" আমার বাবার বৈঠকখানার মজলিস ছিল বিখ্যাত মজলিস। গ্রামের সকল বিশিষ্ট লোকেরাই এখানে আসতেন, বসতেন। চায়ের ব্যবস্থা ছিল—সমারোহের ব্যবস্থা। এক-একবারে বিশ থেকে ত্রিশ কাপ চা তৈরী হ'ত। চায়ের জন্য স্বতন্ত্র ঘর ছিল, সে ঘরে উনান নিবত না। কল্কের পর কল্কেতে তামাক সাজা থাকত। আমার অনন্তদাদা বাবার খাস খানসামা, সে চিমটে ধ'রে তাতে আগুন চড়াত। মজলিসে গ্রামের সামাজিক, বৈষয়িক আলোচনা চলত কিছুক্ষণ, তারপর ধর্মশাস্ত্র আলোচনা হ'ত। গোঁসাইবাবা এলেই সকলে উঠে দাঁড়াতেন। গোঁসাইবাবার কিন্তু সে ঘরে ঢোকবার উপায় ছিল না। তিনি এসে ঢুকতেন আমার পড়ার ঘরে।

বাবা হামার—বাবা হামার—বাবা হামার রে!

আমি লাফ দিয়ে উঠে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে ঝুলে পড়তাম, তিনি বুকে তুলে নিয়ে বলতেন--আজ তো বাবা, লঢ়াইকে গল্প বলবে। মণিপুরকে গল্প।

মণিপুরের টিকেন্দ্রজিত মহাবীর, মহাভারতের পাণ্ডব-বংশধর। মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত মহাবীর বভ্রুবাহন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। শুধু তাই নয়, পাণ্ডবের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া

নিয়ে বভ্রুবাহন ও অর্জুনে—পিতাপুত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধে অর্জুনকে পরাজিত করেছিলেন বভ্রুবাহন। সেই বংশের সন্তান টিকেন্দ্রজিত। তাঁরই গল্প।—টিকেন্দ্রজিত বীর হইলে কি হোবে বাবা, আংরেজকে কামান—আরে বাপ রে বাপ—সে ছুটল—দনা-ন্-ন্-ন্। দনা-ন্-ন্-ন্। আমার চোখের সামনে ভেঙে ভেঙে পড়ত দুর্গপ্রাকার। চোখে আসত জল।

মধ্য পথে অনন্তদাদা অথবা ভীমসিং চাপরাসী আসত বাড়ীর ভিতর থেকে, আমার পিসিমায়ের তাগিদ নিয়ে। তিনি আমার জন্য ব'সে আছেন। খাইয়ে দাইয়ে আমাকে নিয়ে শোবেন গিয়ে। আমার পিসিমা শৈলজা দেবী আগুনের মত উত্তপ্ত। আমিই ছিলাম সে উত্তাপে জল। প্রথম জীবনে বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে একই দিনে কলেরায় স্বামী-পুত্র হারিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিলেন; বুকে নিয়ে এসেছিলেন জ্বলন্ত চিতাবহ্নি। সে বহ্নিতে কারও নিস্তার ছিল না। আমি যখন জন্মালাম, তখন তিনি মায়ের কোল থেকে আমাকে নিয়ে পালন করতে আরম্ভ করলেন এবং জীবনের উত্তাপও ক'মে আসত আরম্ভ হ'ল। আমারও পিসিমার কোলের কাছটি ছাড়া ঘুম আসত না। কিন্তু তিনি মাত্র একটি গল্প জানতেন। কাজেই আমার গল্প না শোনা পর্যন্ত তাঁকে ব'সে ঢুলতে হ'ত। ঢুলতেন আর গোঁসাইবাবাকে তিরস্কার করতেন।

গোঁসাবাবার এ সব তিরস্কার কানে ঢুকত না। তিনি গল্প বলতেন, দন-ন-ন-ন্‌ন্ দন-ন-নন্‌ন্।

৮

গল্প শুধু আমিই শুনতাম না, ছেলেরাই শুনত না, সেকালে বড়দের আসরেও গল্প হ'ত। বাবার বৈঠকখানাই ছিল গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে জমজমাট আসর। সকাল থেকে গ্রামের ভদ্রজনদের আসা সুরু হ'ত। সকালবেলা আটটা নাগাদ চায়ের আসর জ'মে উঠত; তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ভদ্রলোক এসে ব'সে যেতেন। বাবার খাস খানসামা ছিল আমার অনন্তদা। গ্রামেরই বৈষ্ণব ঘরের ছেলে। ছেলে বয়স থেকে আছে, বাবা নিজে কাজ শিখিয়েছিলেন। কাপড় কোঁচানো, চা তৈরী, গা-হাত টেপা ইত্যাদি তরিবতের কাজে অনন্তদাদার মত নিপুণ শিল্পী সচরাচর দেখা যায় না। অনন্তদা ভোরবেলা উঠে চায়ের সরঞ্জাম, তামাকের সরঞ্জাম তৈরী ক'রে অপেক্ষা করত। একটা স্বতন্ত্র ঘরই ছিল চা এবং তামাকের। বেলা একটা পর্যন্ত চলত মজলিস, তারপর আবার মজলিস বসত সন্ধ্যা আটটা থেকে; রাত্রি বারোটা বাজতই, কোন কোন দিন রাত্রি দেড়টা দুটোও বাজত। সেদিন খাওয়া দাওয়ার আসরও ব'সে যেত। গ্রামে জামাই বেয়াই কুটুম্ব যার বাড়ীতে যিনিই আসতেন তিনিই আসতেন এই মজলিসে। কয়েকজন—সাত আটজন ছিলেন আসরের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মানুষ। এঁদের মধ্যে গ্রামের ঘরজামাই দু-তিন জন। বাকী গ্রামের ভদ্র জন। তুমুল উত্তেজিত আলোচনা চলত। বৈষয়িক তর্ক, সামাজিক বিচারের তর্ক। আবার উঠত হাস্য-পরিহাসে হাস্যরোল। সে কি হাসি! রাত্রির অন্ধকার শিউরে উঠত। একালে সেকালের

মানুষের সে স্বাস্থ্যও নাই, সে কণ্ঠস্বরও নাই, তেমন ক'রে প্রাণ খুলে হাসবার প্রবৃত্তিও নাই; একালে সে হাসি আর নাই। এক সময় মনে হ'ত হয়তো-বা সভ্যতাই সে হাসির উৎসমুখে অনুশাসনের পাথর চাপা দিয়েছে; উচ্ছ্বাস আর সেই স্বচ্ছন্দ বেগবতী ধারায় নির্গমন-পথ পায় না। কিন্তু একদিন বোধ করি ১৯২২।২৩ সালে সে ভ্রম আমার গিয়েছিল। তখন আমি কলকাতায় ভবানীপুর বেলতলা রোডে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ীর ঠিক পিছনের দিকের বাড়ীতে থাকি! আমি যে ঘরটিতে থাকতাম, সে ঘরের পশ্চিম দিকের জানালা থেকে দাশ মহাশয়ের বাড়ীর দোতলার ঘরেরও কিছুটা দেখা যায়। বাড়ীর বিস্তীর্ণ হাতার সবটা তো দেখা যেতই। তখন প্রথম বাসায় এসেছি। সেই বাড়ীর নিচের তলায় সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে ব'সে আছি হঠাৎ একটা কোলাহল উঠল। সে কি কোলাহল, কোথায় যেন অকস্মাৎ অভাবনীয় কিছু ঘ'টে গেল! তখন ভবানীপুর এ ভবানীপুর ছিল না, দেশবন্ধুর বাড়ীর সামনে রসা রোডের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড মাঠ প'ড়ে ছিল; পূর্ণ থিয়েটারও তখন হয় নি। ওদিকটা সবই তখন হয় মাঠ, নয় বস্তী। কোলাহল শুনে প্রায় সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় যখন বেরুলাম তখন আর কোলাহল নাই। কি হ'ল? দুর্ঘটনার কোলাহল কি এই ভাবে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়? দেশবন্ধুর বাড়ীর পূর্বদিকের ছোট ফটকে ব'সে ছিল একজন দ্বারপাল; সে বুঝতে পেরেছিল আমাদের মনের জিজ্ঞাসা। সে হেসে বলেছিল, যা ভেবেছেন বাবু, তা নয়, হয় নি কিছু, সাহেবেরা হাসছেন। হাঁ, হাসি বটে! সেদিনও মনে পড়েছিল বাবার মজলিসের হাসি। একালের দোষ নাই, পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে।

আজ স্বাচ্ছন্দ্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, কাজেই প্রাণশক্তি অপূর্ণাঙ্গ শিশুর মত দুর্বল রুগ্ন ; সে হাসি হাসবে কি ক'রে মানুষ।

বাবার মজলিসে গল্প হ'ত।

গল্প বেশীর ভাগ বলতেন গোঁসাই বাবা।

বাবাও বলতেন। তিনি কথাবার্তা খুব ভাল বলতেন। বক্তা ছিলেন ভাল, কথায় জোর ছিল, কিন্তু গল্পকথক ভাল ছিলেন না। তিনি বেশীর ভাগ গল্প বলতেন বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প বা ওই ধরণের গল্প। গল্পের শেষে প্রশ্ন থাকত। প্রশ্নটি উত্থাপন ক'রে বলতেন, বল, কার কি উত্তর! সব শেষে তিনি বলতেন গল্পের উত্তর।

একটা গল্প—চার বন্ধু—একজন কাষ্ঠশিল্পী, একজন চিত্রশিল্পী, একজন বস্ত্র ও ভূষণশিল্পী, একজন মন্ত্রসিদ্ধ তাপসপুত্র—একদিন বনের মধ্যে রাত্রে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। কথা হ'ল, গভীর বন—এই বনে এক-একজন এক-এক প্রহর জেগে পাহারা দেবেন। প্রথম প্রহরে প্রহরার ভার পড়ল কাষ্ঠশিল্পীর উপর। বন্ধুরা ঘুমুচ্ছে, তিনি একা ব'সে আছেন, সামনে জ্বলছে এক অগ্নিকুণ্ড, পাশে কিছু শুকনা কাঠ। একা, নিতান্ত খেয়ালবশেই তিনি নিজের যন্ত্র বের ক'রে কাঠ থেকে গড়লেন এক অপূর্ব নারীমূর্তি। মূর্তিটিও শেষ হ'ল, প্রথম প্রহরশেষের ঘোষণাও বেজে উঠল, কাষ্ঠশিল্পী ডেকে দিলেন চিত্রশিল্পীকে। নিজে শুয়ে পড়লেন। চিত্রশিল্পীর চোখে পড়ল সেই কাঠের নারীমূর্তি। বুঝলেন বন্ধুর কাজ এটি। তিনি এবার নিজের সরঞ্জাম বের ক'রে তাতে রঙ দিলেন। গোলাপ ফুলের মত দেহবর্ণে উজ্জ্বল ক'রে দিলেন, চোখ আঁকলেন, ভুরু আঁকলেন। গাছের বাকল থেকে আঁশ বের ক'রে এক রাশি কালো রঙ দিয়ে চুল ক'রে দিলেন

নখ আঁকলেন, গালে একটি ছোট তিল—তাও দিতে ভুললেন না। শেষ করলেন, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, মনোমত হ'লে তুলি রেখে বসলেন। এমন সময় দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা ক'রে যামঘোষেরা কোলাহল ক'রে উঠল। চিত্রশিল্পী মূর্তিটিকে একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে সরঞ্জাম গুটিয়ে শুয়ে পড়লেন, ডেকে দিলেন বস্ত্রভূষণশিল্পীকে। তিনি উঠে আগুনটাকে জোর ক'রে দিয়ে বসলেন, মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠলেন, এই নগ্না সুন্দরী নারী—এ কে? কোন বনদেবী? না, দেবী এমন লজ্জাহীনা নগ্না হবে কেন? তবে কি মায়াবিনী? না, তাও তো নয়। মায়াবিনী এমন নিষ্পন্দ স্থির কেন, তার হাবভাব ছলাকলা কই? ভাল ক'রে চোখ রগড়ালেন; এবার বুঝলেন দুই বন্ধুর কীর্তি এটি। হাসলেন এবং পরক্ষণেই নিজের ব্যবসায়ের কাপড় এবং আভরণের বোঁচকা পেটিকা খুলে বসলেন। বেছে মানানসই রঙের পট্টবস্ত্র বের করলেন, আভরণ বের করলেন, পুতুলটিকে মনের মত ক'রে সাজালেন। তারপর তৃতীয় প্রহর শেষ হতেই মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্রকে জাগিয়ে নিজে শুলেন। ব্রাহ্মণপুত্র কিন্তু প্রতারিত হলেন না, তিনি এই অনুপম রূপলাবণ্যময়ী পুতুলটিকে দেখবামাত্র বুঝলেন যে এটি প্রাণহীন পুত্তলিকা মাত্র এবং তিন বন্ধুর তিন প্রহরের আপন-আপন গুণপনার ফল এই মূর্তিটিকে দেখে খুব খুসী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে, তাঁর গুণপরিচয় এর সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়াই তাঁর কর্তব্য! তা হ'লেই চার বন্ধুর এই রাত্রিযাপনটি পরম সার্থক হয়ে উঠবে। তখন মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপুত্র পুতুলটিকে অগ্নিকুণ্ডের সামনে এনে রাখলেন, কুণ্ডের অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা সঞ্জীবনী অগ্নিতে পরিণত করলেন, তারপর মন্ত্রজপে বসলেন। মন্ত্রজপ শেষ ক'রে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে তারই

তিলক এবং উত্তাপে অভিষেক করতেই পুত্তলিকা জীবন লাভ ক'রে চঞ্চল বিস্ময়ে চারিদিক তাকিয়ে বললে—তুমি কে? আমিই বা কে?

এমন সময় ভোর হ'ল। পাখীরা ডেকে উঠল। ঘুমন্ত তিন বন্ধু জেগে উঠে বসলেন, এবং এই অপূর্ব নারীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। বিস্ময় কাটতেই কিন্তু সূত্রপাত হ'ল কলহের। চার জনেই বললেন, এ আমার সৃষ্টি—এ হবে আমার পত্নী।

এখন কে বিচার করবে—এ নারী কার প্রাপ্য?

প্রশ্ন হ'ত—বল, তোমরা বল। কে পাবে এই নারীকে?

গল্প থেকে বিতর্ক উপস্থিত হ'ত। যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে বিতর্ক এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি। সকলের শেষে বাবা বলতেন গল্পের মীমাংসা। এ গল্পের মীমাংসা, ওই নারীকে পত্নীরূপে পাবেন ওই বস্ত্র এবং আভরণশিল্পী। প্রাণদাতা ব্রাহ্মণপুত্র পিতার কাজ করেছেন—তিনি দিয়েছেন প্রাণশক্তি; চিত্রশিল্পী কাষ্ঠশিল্পী তাঁরা মায়ের কাজ করেছেন, দিয়েছেন অস্থি মেদ মজ্জা মাংস রক্ত অবয়ব। ওই বস্ত্র এবং আভরণ শিল্পী সদাগরপুত্র বস্ত্র এবং আভরণ দিয়ে ভর্তার কাজ করেছেন। তিনিই তার ভর্তা অর্থাৎ স্বামী।

কখনও কখনও পুরাণের গল্প হ'ত। তা থেকে চ'লে যেতেন—শাস্ত্র আলোচনায়। কখনও কখনও হ'ত দেশ-বিদেশের গল্প, কেউ আগন্তুক অথবা বিদেশবাসী গ্রামে ফিরলে সে গল্প হ'ত।—সে তোমাদের কত বলব বাপু! সে দেশ আচ্ছা দেশ! আচ্ছা দেশ! যত মাছ—তত দুধ, সে দুধে ঘি কত হে! হাতে লাগলে ছাড়তে চায় না। পদ্মার ধার—বুয়েচ না—এই পদ্মা—একূল-ওকূল নজর চলে না—বর্ষার সময় সাক্ষাৎ ভৈরবী—সে বাবু দেখেই আমার

হৃৎকম্প। কালী কালী বল মন, রাত্রে শুয়ে ঘুম হ'ত না। ভাবতাম ঘুমব, কখন ধ্বস ছাড়বে অকূলে ভাসব! আঃ, হায়-হায়-হায়, জপের মালাটা নিতে সময় পাব না রে বাবা! ভুক ক'রে ডুবব, আর উঠব না। একেবারে সাগরসঙ্গমের তলদেশে মাটিচাপা···নয়তো হাঙ্গর, কুম্ভীরের গর্ভে। বর্ষা পার হ'লেই বাস্। রাজশাহী তো রাজসাহী রে বাবা!

এর পর চুপি চুপি বলতেন—গাঁজার এক-একটা জটা কি! এ-ই এতখানি লম্বা আর ইয়া পুরু। বুয়েচ না ভাই, রসও কি তেমনি! ছু টিপ দিয়েছ তো আঠা একেবারে চট চট ক'রে উঠল। তেজও কি তেমনি রে বাবা! বুয়েচ হরাই ভাই, প্রথম গিয়েছি—এত তো জানি না—মেরেছি জোরে টান। বাস্, গলগল ক'রে সেই যে ধোঁয়া বেরিয়ে চোখের সামনেটা ঝাপসা করে দিল—তিন দিন সে ঝাপসা কাটে না চোখের। পোষ্টাপিসের কাজ, চোখে ঝাপসা দেখি, মাথা ভোঁ-ভোঁ করে—তিন আর চারে সাত লিখতে গিয়ে ভাবি, ঠিক হ'ল তো, তিন আর চারে পাঁচ নয় তো? সে এক বিপদ! কালী কালী বল—তারা তারা তারা বল—শিব শিব বল। হরি বোল—হরি বোল।

ইনি ছিলেন আমার ব্রজজ্যাঠা। এমন সদানন্দময় পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, পোষ্টাপিসে কাজ করতেন, সরকার-বংশের সন্তান, লাভপুরে এঁদের বাড়ীরই দৌহিত্র আমরা। অপরূপ মানুষ ছিলেন ব্রজজ্যাঠা।

ব্রজজ্যাঠার কথা মনে পড়লে—কত বিচিত্র কাহিনী যে মনে পড়ে! ব্রজজ্যাঠা সেকালে ফ্রেঞ্চ-ছাট দাড়ি গোঁফ রাখতেন, দেখতে ছিলেন সুশ্রী মানুষ, কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট। গান গাইতে পারতেন।

ছুটিছাটায় বাড়ী এসে গ্রামের পথে বেরিয়েই গান ধরতেন—"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।" গান শেষ করতেন আমাদের বৈঠকখানার দরজায়! ঘরে ঢুকেই ডাকতেন—ভাই কানাই! ভাই হরাই! আমার বাবার নাম ছিল—হরিদাস, তাঁকে আদর ক'রে ডাকতেন—হরাই।

বিচিত্র মানুষ। পেন্সন নেবার পর একবার বর্ধমান গিয়েছিলেন—বর্ধমানে মেডিকেল স্কুলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। পেন্সন বিক্রীর অভিপ্রায় ছিল। গিয়ে উঠেছিলেন আমাদেরই গ্রামের শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাসায়। তিনি ছিলেন তখন বর্ধমানের পুলিশ কর্মচারী। নিত্যগোপালবাবুর কথা পরে বলব। এখানে শুধু এইটুকু বলব যে, এই মানুষটি ছিলেন যেমন রূপবান, তেমনি সুকণ্ঠ গায়ক; যেমন উঁচু মেজাজের লোক, তেমনই ছিলেন জনপ্রিয়। ব্রজবাবুকে পেয়ে গোপালবাবু কৃতার্থ হয়ে দু-একদিনের বেশী রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রজজ্যাঠা কিন্তু কিছুতেই থাকবেন না। রসিক মানুষ, শেষ পর্যন্ত বললেন—গোপাল, আমি তা হ'লে ক্ষেপে যাব। বাড়ীতে বুড়ী আছে, তার জন্য আমার মন কেমন করছে। আমি আর থাকতে পারি? ধরে রাখলে গোবধ ব্রহ্মবধ হবে রে ছোঁড়া। তার পাপ তোকে অর্সাবে।

অবশেষে গোপালবাবু কৌশল অবলম্বন করলেন! ব্রজজ্যাঠার জুতো জোড়াটি সরিয়ে রাখলেন। ব্রজজ্যাঠা জুতো না পেয়ে শেষে ধপাস ক'রে ব'সে প'ড়ে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—আমার সর্বনাশ হ'ল রে গোপাল, আমার সর্বনাশ হ'ল।

গোপালবাবু বললেন, এক জোড়া জুতোতে আপনার সর্বনাশ হ'ল?

—ওরে ভাই, তুই জানিস না। জুতো জোড়া আমার নয়—শম্ভুর জুতো আমি চেয়ে নিয়ে এসেছি ভাই। আঃ, শেষ পর্যন্ত ললাটে কি আছে তা বুঝতে পারছি না আমি। হায়-হায়-হায়! আমি এখন করব কি?

—কি করবেন? আমার বাড়ী থেকে জুতো গিয়েছে—আমি কিনে দোব।

—ওরে শম্ভুকে জানিস না রে, শম্ভুকে জানিস না তুই।

শম্ভু সরকার দুর্দান্ত ক্রোধী লোক, গোপালবাবুরই বয়সী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই—প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষ তার উপর দুর্দান্ত ক্রোধী—গোপালবাবুর বয়সী এবং বন্ধু হওয়া সত্বেও প্রাচীনকালের তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ ভক্ত; গ্রামের লোকে তাঁর ভয়ে ত্রস্ত।

গোপালবাবু হেসে বললেন—আমি সে জোড়ার চেয়ে দামী ভাল জুতো কিনে দেব দাদা।

এবার ব্রজজ্যাঠা কেঁদে ফেলে বললেন, ওরে শম্ভুকে তুই জানিস না গোপাল, সে যদি বলে—আমার সেই জোড়াটির চেয়ে ভাল জুতো আর হয় না, আমার সেই জোড়াটিই চাই?

তৎক্ষণাৎ গোপালবাবুকে জুতো বের ক'রে দিতে হ'ল।

এর অনেক দিনের পরে—আর একটি ঘটনা বলি। ব্রজজ্যাঠার তখন শরীর ভেঙেছে, আমার বাবার অনেক দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে। আড্ডা নাই। ব্রজজ্যাঠা তাঁর পাড়ার কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসেন। লোকজন থাকলেও বসেন, কেউ না-থাকলেও এসে বারান্দায় বেঞ্চে ব'সে থাকেন। যাঁর বৈঠকখানা তিনি জীবনে কৃতী ব্যক্তি, ধনী মানুষ। কিন্তু আকস্মিক পত্নী-বিয়োগে অহরহ মদ্যপান ক'রে হয় প'ড়ে থাকেন নয় প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সঙ্গে বৈষয়িক

কর্তৃত্ব নিয়ে প্রচণ্ড কলহ করেন। ছেলে কলেজে তখন বি, এ, পড়ে। ঘটনার দিন সকালবেলা থেকেই পিতাপুত্রে বাদানুবাদ চলছিল। সকালে পিতা অনেকখানি প্রকৃতিস্থ ছিলেন, ছেলের প্রতিবাদের উত্তরে যুক্তিপূর্ণ কিছু বলতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়েই বেরিয়ে চ'লে গেলেন। ছেলে বেঞ্চে ব'সেই রইল। তারপর সেও উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান ক'রে বাপ ফিরে এলেন। দেখলেন বেঞ্চে ছেলে ব'সে রয়েছে। তিনি কিন্তু ছেলে নন, তিনি আমার ব্রজজ্যাঠা। ভদ্রলোকের ছেলে উঠে যাবার পর তিনি এসে চুপ ক'রে একলাটিই ব'সে আছেন। ক্রোধে মদ্যপানে আত্মহারা ভদ্রলোক একেবারে জুতো খুলেই ছেলে ভ্রমে ব্রজজ্যাঠাকেই প্রহার করতে সুরু করলেন, তবে রে ব্যাটা হারামজাদ, তবে রে নচ্ছার—

ব্রজজ্যাঠা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ভ হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর হাত তুলে নিজের দাড়ি দেখিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, ও অমুক আমি, ওরে আমার পাকাদড়ি! ওরে, তোর অপরাধ হবে!

ভদ্রলোক দাড়ি দেখেই থেমেছিলেন। তার পরই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রজজ্যাঠা তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রলোকের মৃতা পত্নীর নাম ধ'রে—আঃ, তুই এ কি ক'রে গেলি মা! হায়-হায়-হায়! সোনার মানুষ, এ কি হয়ে গেল—তোর বিহনে!

ব্রজজ্যাঠা বাংলা দেশের পোষ্টাপিসের কাজে যেখানে গিয়েছিলেন সেখানকার খাওয়াদাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প বলতেন। মানকরের কদমা, দুবরাজপুরের বাতাসা, সিউড়ির মোরব্বা, কাঁদির মনোহরা, জয়নগরের মোয়া, গুপ্তিপাড়ার মণ্ডার গল্প ছেলেবেলায় ব্রজজ্যাঠার মুখেই শুনেছিলাম। দুধ দই ঘি মাছ মাংস ইত্যাদির দর পর্যন্ত

মুখস্থ ছিল তাঁর। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন্ সাধুর কত বড় জটা দেখেছেন, কোন্ মিঞা সাহেবের কত লম্বা দাড়ি দেখেছেন, কোন্ জমিদারের বাড়ীতে কত বড় ও কত ভয়ালদর্শন কুকুর দেখেছেন, সেগুলি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করতেন।

কেদার চাটুজ্জে গল্প বলতেন। ইনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাই। ঘর-জামাই ছিলেন না, তবে তাঁর নিজের পৈতৃক ভিটা গুপ্তিপাড়ার সঙ্গেও সম্ভবত বিশেষ সংস্রব ছিল না। ইংরাজী-জানা মানুষ, সরকারী আবগারী বিভাগের সাবইনস্পেক্টর ছিলেন এবং নিজেও ছিলেন আবগারী বিভাগের একজন সত্যকার পৃষ্ঠপোষক। অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই মধ্যে মধ্যে সস্পেণ্ড হতেন। সস্পেণ্ড হ'লেই লাভপুরে এসে উঠতেন। শ্বশুরও ছিলেন সেকালের তান্ত্রিক। ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকড়া দাড়ি-গোঁফ; মুখে বিচিত্র শব্দ করতে পারতেন—বাঁশীর শব্দ, জন্তু-জানোয়ারের শব্দ; মন্ত্রতন্ত্র জানতেন, কুকুর কামড়ালে বিষ ঝাড়তেন, সাপের বিষের মন্ত্র জানতেন, চব্বিশ ঘণ্টাই নাকের একটা রন্ধ্রে একটা পাথর রেখে এক রন্ধ্রেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতেন। সমস্ত দিনই প্রায় একটা গাইয়ের দড়ি ধ'রে তাকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। জামাইয়ের সঙ্গে খুব বনাবনতি হত না শ্বশুরের। উভয়ে প্রায় সমবয়সীই ছিলেন। জামাই এসে শ্বশুরবাড়ীতে উঠলেও খাওয়ার সময় এবং শোবার সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকী সময়টা থাকতেন আমার বাবার আড্ডায়। তাঁর ছিল বড় বড় গল্প। রাজা উজীর আমীর ওমরার কথা। লোকে বিরক্ত হ'লেও কিছু বলত না। অমুক দাদা কি অমুক কাকার জামাই, তাকে কি কখনও কিছু বলা যায়! সেকালের সমাজের এই ছিল প্রথা। জামাই, বিশেষ

কুলীন ঘরের জামাই, তার সব দোষ শত ঔদ্ধত্যও ছিল মার্জনীয়।

আর প্রায়ই আসতেন সাধু সন্ন্যাসীর দল। গ্রামে আমাদের একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ ব'লে খ্যাত ফুল্লরা দেবীর স্থান পবিত্র তীর্থ, শাক্ত সাধু সন্ন্যাসী প্রতিদিনই দু-চারজন আসতেন যেতেন।

দু-একজন কিছু দিন ধ'রেই থাকতেন। কেউ সাধনা করতেন, কেউ দিন গুজরাণ করতেন দেবস্থলের প্রসাদান্নে। এঁদের মধ্যে আসতেন পর্যটক সাধুর দল। ফুল্লরা মহাপীঠে তাঁরা এলে আমাদের তারামায়ের আশ্রমে রামজী বাবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ত। বাবারও খ্যাতি ছিল সাধুপ্রীতির এবং শাস্ত্র আলোচনার, সেই হেতু তাঁরা আসতেন আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা সাধু-ভোজন করাতেন। পশ্চিমদেশীয় সাধুরা আমাদের বাড়ির আতিথ্যে সত্য সত্যই পরম পরিতৃপ্ত হতেন। তার কারণ পশ্চিম-প্রবাসী বাড়ির কন্যা আমার মা তাঁদের ছাতুভরা রুটী তৈরী ক'রে অতিথি-সৎকার করতেন। পরম উপাদেয় খাদ্য; ছাতুখোর ব'লে যাঁরা পশ্চিম-দেশীয়দের ব্যঙ্গ করতেন সেকালে তাঁরাও এই ছাতুভরা রুটি খেয়ে বলতেন—ভাই হরিবাবু, আর একদিন ছাতুভরা রুটি খাওয়াতে হবে।

এই সাধুরা করতেন দুর্গম তীর্থস্থলের গল্প।

তাঁদের মুখেই ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, লছমন ঝোলার দড়ির সাঁকোর কথা। মনে আছে শিশু-কল্পনাতেই দেখেছিলাম দুদিকে খাড়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, দুই খাড়া পাহাড়ের মধ্যে অনেক নীচে গঙ্গা ব'য়ে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, সেই প্রচণ্ড বেগে—যে বেগে ইন্দ্রের ঐরাবৎ গিয়েছিল ভেসে। আর তার উপরে দড়ির পুল,

দুখানা পাশাপশি দড়িতে কাঠের টুকরো লাগানো, মাথার উপরে আরো দুটো দড়ি, দড়ি ধরে দড়িতে বাঁধা কাঠে পা দিয়ে চলতে গেলে দোলে, মানুষের মাথা ঘোরে। হাতের মুঠিখুলে গেলে পা ফসকে গেল; মানুষ পড়ছে মাথা নিচু ক'রে নিচে, নিচে আরও নিচে, তারপর আর দেখা গেল না। শরীর শিউরে উঠত। বলতেন, বদরী-নারায়ণের কথা, কেদারমঠের যোশীমঠের কথা, মানস-সরোবরের কথা, জ্বালামুখী কামাখ্যা-তীর্থের কথা।

পূজোর পর মাস দুয়েকের মধ্যে আসতেন অনেক গায়ক। কাপড়ের খোলে সযত্নে ঢাকা তানপুরা বগলে নিয়ে এসে উঠতেন। তাঁদের কারুর কাছে শুনেছিলাম, তানসেনের গল্প। শুনেছিলাম, আকবরশাহ একদা তানসেনের প্রতিপক্ষের মুখে দীপকরাগ শুনে চমৎকৃত হলেন—গানের মহিমায় সমাদান ঝাড়ে বাতি জ্ব'লে উঠল। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে বললেন—তানসেন যদি দীপক গায়, তবে আগুন জ্ব'লে উঠবে দাউ দাউ ক'রে। বাদশা ধরলেন তানসেনকে। তানসেন প্রথম রাজী হন নি, অবশেষে বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। গাইলেন দীপক এবং আগুন জ্বলল, তাতেই তিনি পুড়ে গেলেন। যাদের মল্লার গেয়ে মেঘ এনে বর্ষণ করবার কথা ছিল, তারা তো তানসেনের মত সঙ্গীতসিদ্ধ ছিলেন না—কাজেই তাঁরা পারলেন না মেঘ এনে তাকে গলিয়ে বর্ষণ নামাতে। যে গায়কেরা আসতেন, গ্রামের প্রতিষ্ঠাবানদের বাড়ীতে তাঁদের বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। কোথাও একটাকা, কোথাও দুটাকা, কোথাও বা চার টাকা। অনেক বিভক্ত প্রতিষ্ঠাবান বংশের ঘরে—চার আনা আট আনা হিসাবে বৃত্তি পেতেন। গান শোনাতেন, গল্প শোনাতেন। পুরানো কালের গায়কদের গল্প, নূতন কালের গায়কদের গল্প। সেতারী আসতেন।

মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষী আসতেন। দেশের জ্যোতিষী। বিদেশের অপরিচিত জ্যোতিষী। এঁদের কাছেও গল্প শুনেছি। দুটো একটা গল্প মনে রয়েছে।

এক ছিলেন অভ্রান্ত জ্যোতিষী। তাঁর যেমন সূক্ষ্ম গণনা, তেমনই ছিল নির্ভুল বিচার। তাঁর এক কন্যা হল পরমাসুন্দরী। কন্যার অদৃষ্ট গণনা ক'রে দেখলেন—অদৃষ্টে রয়েছে বাসর-বৈধব্যের যোগ।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অনেক ভেবে কঠিন সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটি যুগের ক্ষণ লগ্ন গণনা ক'রে এমনই একটি দিন ও লগ্ন আবিষ্কার করলেন, যে লগ্নের এক অতি দুর্লভ গ্রহ-সমাবেশের ফলে এক অমৃতময় বিবাহযোগের সৃষ্টি হয়েছে। এমন পুণ্য লগ্ন বহু বর্ষ পরে আসে। যুগে একবার আসে। এ লগ্নে বিবাহ হ'লে বৈধব্য হতে পারে না। তিনি সেই লগ্নে বিবাহ দিয়ে বিধিলিপি খণ্ডন করবেন স্থির করলেন। নিজে বালিঘড়ি ধ'রে লগ্ন নির্ণয়ের জন্য বসলেন। ক্ষণ গণনা ক'রে চলেছেন, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন বিবাহসজ্জায় সজ্জিত কন্যা; মধ্যে মধ্যে নূতন আভরণ-গুলি নাড়ছেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী, তাঁর কন্যার বিবাহ; কত রাজা কত ধনী কত মহাজন আভরণ যৌতুক দিয়েছেন, মণি-মুক্তার আভরণ, তাতে বিভূষিতা হয়ে মেয়েটির আনন্দ হয়েছে প্রচুর, সেকথা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ মেয়েটি চকিত হয়ে ব'লে উঠল– যাঃ! তার গলায় একটি মালা ছিঁড়ে গেছে। ঝরঝর ক'রে খ'সে প'ড়ে গেল মুক্তাগুলি। জ্যোতিষী চকিতের জন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। বালির পাত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। ঝুরঝুর ক'রে বালি ঝ'রে পড়ছে। তিনি বললেন, যাক। যেতে দাও।

লগ্ন এল, বিবাহ আরম্ভ হ'ল।

জ্যোতিষী কঠিন হেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিধাতাকে বলতে চাইলেন, তোমার বিধান লঙ্ঘিত হবে, এর জন্য অপরাধী আমাকে ক'রো না। অপরাধ আমার নয়। যে বিদ্যা তোমার মানস-কন্যা, অপরাধ যদি হয়—অপরাধ তার। এ তারই প্রসাদ।

কিন্তু ও কথা বলা হ'য় না তাঁর। আকাশের দিকে তাকিয়েই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কি? আকাশে কোটী কোটী নক্ষত্র ঝলমল করছে, তারই মধ্যে তাঁর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে গ্রহ নক্ষত্র সংস্থানের অবস্থা; যেমন নাকি সমুদ্রতটের অসংখ্য শুক্তির মধ্যে মণিকার চিনতে পারে কোন্‌টি কোন্‌টি মুক্তাগর্ভ শুক্তি। ওই বৃষ, ওই মিথুন। কিন্তু যে লগ্ন তিনি গণনা করেছেন তাতে চন্দ্রের তো এই রাশিতে অবস্থানের কথা নয়। এ সংস্থান তো সে লগ্নের পরবর্তী কালের অবস্থান! পাগলের মত তিনি ছুটে গেলেন বালি-ঘড়ির কাছে। কি হ'ল? দেখলেন, বালু নির্গমনের নালিকার মধ্যে আশ্চর্য্যভাবে তখনও একটি মুক্তার অর্ধাংশ আটকে রয়েছে। বুঝলেন, তিনি যে মুহূর্তে চকিতের জন্য ফিরে তাকিয়েছিলেন—সেই মুহূর্তে একটি মুক্তা ভেঙে তারই আধখানা লাফিয়ে গিয়ে পড়েছে ওই নালিকার মধ্যে এবং আংশিকভাবে পথ রুদ্ধ ক'রে আটকে রয়েছে। তারই ফলে নির্দিষ্ট সময়ের পরিমিত বালুটুকু শেষ হতে অনেক বেশী সময় লেগেছে। লগ্ন সেই অবসরে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাঁকে উপহাস ক'রে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পণ্ডিত প্রণাম করলেন নিয়তিকে। মনে মনে বললেন আমার দম্ভকে ক্ষমা ক'রো। তুমি মহাশক্তি, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্য তুমি দশমহাবিদ্যার রূপ ধ'রে দেবাদিদেব

মহাদেব মহাকালকে পরাভূত ক'রে আপনার পথে চ'লে যাও। মনে ছিল না আমার। ক্ষমা ক'রো আমাকে।

আর একটা গল্প—

এমনই আর এক জ্যোতিষী ছিলেন।

একদা তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এক কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ। বললেন—শুনেছি নাকি তোমার গণনা অভ্রান্ত। তোমার দৃষ্টির সম্মুখে অহরহ নাকি গ্রহসংস্থান দৃশ্যমান রয়েছে? কোন গ্রহেরই নাকি সাধ্য নাই তোমার দৃষ্টির বাইরে যেতে?

জ্যোতিষী হাসলেন,—বললেন— গুরুর প্রসাদ এবং দেবী সরস্বতীর বর। কৃতিত্ব আমার নয়।

—ভাল। আমিও সামান্য চর্চা করি এই বিদ্যার। কিন্তু আমি কোন মতেই আজ ছায়াগর্ভসম্ভূত সূর্যতনয় মহাগ্রহের অবস্থান নির্ণয় করতে পারছি না। বল তো পণ্ডিত, শনিগ্রহের অবস্থিতি এখন কোথায়?

পণ্ডিত খড়ি তুলে নিয়ে ছক এঁকে, সামান্য গণনা ক'রেই পিছন ফিরে আগন্তুকের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে বললেন—এইখানে তাঁর অবস্থিতি।

মুহূর্তে তাঁর তর্জনীটি জ্ব'লে উঠে ভস্ম হয়ে প'ড়ে গেল। অট্টহাস্যে সাধুবাদ উঠল, সাধু—সাধু—সাধু! আগন্তুক কৃষ্ণ বিদ্যুতের মত দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একবার এক জ্যোতিষী এসেছিলেন। বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল জ্যোতিষী। এসেই গ্রাম তোলপাড় ক'রে দিলেন। যিনি এলেন তাঁকেই তাঁর নাম ধ'রে ডাকলেন, এস অমুকবাবু, কি অমুকচন্দ্র এস বাবা। তারপর বলতে লাগলেন তাঁর জীবনকথা। যেন গড়

গড় ক'রে প'ড়ে যাচ্ছেন তার জীবনের খাতা। তিনি প্রথমে এসে উঠেছিলেন যাদবলালবাবুর ঠাকুরবাড়ীতে। এক বেলার পর আমার বাবার সঙ্গে আলাপ হতেই এসে উঠলেন আমাদের বাড়ী। আমার বাবাকে বললেন—তুমি আমার পূর্বজন্মের পিতা। তারপর আমাদের বৈঠকখানা একেবারে জনসমাগমে ভ'রে গেল। অদ্ভুত জ্যোতিষী। যে কোন আগন্তুক এলেন—তাঁর অভ্রান্ত পরিচয় এবং জীবনকথা ব'লে গেলেন। তারপর ভবিষ্যদ্বাণী। কারও অম্লশূলের ব্যাধি, তাকে বললেন—তোমার পেটে তিনটি বিচিত্র অন্ন আছে—একটির বর্ণ লাল, একটির নীল, অপরটি কালো। মাতুলি দিলেন। সবশেষে যাদবলালবাবুর বড় দৌহিত্র সম্পর্কে বললেন—সামনে কঠিন ফাঁড়া, মৃত্যুযোগ। শান্তির ব্যবস্থা হ'ল। তন্ত্রমতে কালীপূজা ক'রে শনিগ্রহের শান্তি। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, কৃষ্ণবর্ণ গাইয়ের দুধের ঘি, এ ছাড়া নীলা স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি অনেক আয়োজন। গভীর রাত্রে পূজার ব্যবস্থা গ্রামপ্রান্তে নির্জনে। পূজা আরম্ভ হ'ল। শুধু দেবী এবং সাধক ছাড়া কেউ রইল না। রাত্রির শেষ প্রহরে দেখা গেল মাটির দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, আয়োজনসহ সাধক অন্তর্হিত। এ সত্ত্বেও সেকালের অনেকে বলেছিল—পূজা শেষ ক'রে সাধক স্বস্থানে চ'লে গেছেন। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ছাগটা চীৎকার ক'রে বললে—উঁ-হু—উঁ-হুঁ।

আরও আসত লাঠিয়াল। প্রকাশ্য পেশায় লাঠিয়াল। গোপন পেশায় ডাকাত। এরাও বৃত্তি পেত। বৃত্তি ছাড়াও মধ্যে মধ্যে আসত, অভাব অভিযোগ থাকলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসত পুলিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কিন্তু একটা বিশেষত্ব ছিল। পুলিশের অভিযোগ সত্য হ'লে সে ক্ষেত্রে তারা আসত না। যে

ক্ষেত্রে অভিযোগ মিথ্যা, সে ক্ষেত্রেই তারা আসত। বলত—মিছে লাঞ্ছনা হবে হুজুর!

আবার নিজেদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকলে এদের ডাকা হ'ত। এরা আসত কাপড় গামছা লাঠি নিয়ে। কাজ ক'রে বকশিশ নিয়ে চ'লে যেত।

এরই মধ্যে গল্প করত। ডাকাতির গল্প। দাঙ্গার গল্প। শিউরে উঠত মানুষ সে সব গল্প শুনে। আমার রাত্রে ঘুম হ'ত না আতঙ্কে, তবু শুনতাম সেই সব গল্প। মনে আছে পোড়া সেখের ডাকাতির সব গল্প। পোড়া সেখ ছিল দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল, তেমনি প্রকৃতিতেও ছিল নিষ্ঠুর। ও অঞ্চলে তার জুড়ি ছিল না। ময়ূরাক্ষীর ওপারে অবশ্য ভল্লারা ছিল। তারা আজও আছে। এই অর্ধাহার অনাহারের দিনেও তাদের মধ্যে বীর্যবান আছে। জাতিতে অবশ্য ভল্লা নয়—তারাচরণ হাড়ি আজও আছে, ওই ওদেরই অঞ্চলের ওদেরই শিক্ষায় সে গ'ড়ে উঠেছে; তারাচরণ—বীর তারাচরণ। অল্পদিন আগেই ১৯৫০ সালেই আমাদের ও-অঞ্চলে একটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেছে। দোষ কার—সে সঠিক জানি না, তবে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানেরাই। অঞ্চলও মুসলমান প্রধান। বীরভূম-মুরশিদাবাদের ওই সীমান্তটিতে মুসলমান প্রায় শতকরা সত্তরের বেশীই হবে—কম হবে না। হিন্দুদের গ্রামে তখন খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। আক্রমণ সেই অবস্থায়। তারাচরণ ছিল সে দিন সে গ্রামে। একা তারাচরণই দাঁড়িয়েছিল লাঠি হাতে। ক্রমে পাশে অবশ্য লোক জমল কিছু। কিন্তু সে প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক কম। তবুও তারাচরণ তাদের গ্রামে প্রবেশ করতে দেয় নি। তারাচরণের কথা থাক্। পোড়া সেখের কথা বলি।

পোড়া সেখ দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছিল। গিয়ে পড়েছিল এমন অঞ্চলে, যে অঞ্চলে পাঞ্জাবী ডাকাতের প্রাদুর্ভাব এবং সাহেব-সুবার কুঠি ছিল। আজ মনে হয় রাণীগঞ্জের কলিয়ারী অঞ্চল হবে। পোড়া সেখ নাকি (পোড়াকে আমি দেখি নি) সেই পাঞ্জাবীদের দলে মিশে সাহেবদের কুঠি লুঠতে গিয়েছিল। সে বলত—হ্যাঁ, মরদ বটে! সাহস বটে পাঞ্জাবীদের! আমি তাদের ফুঁয়ে উড়ে যাবার যুগ্যি। তবু আমার খেলা দেখে তারা সঙ্গে নিয়েছিল। বলত—অন্ধকার রাত্রি, দু'পহর পার হয়েছে—আকাশে মেঘ। আ—আ—আ শব্দ ক'রে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল সব—বাঘের মত। ওদিকে কুঠির বারান্দা থেকে ছুটতে লাগল গুলি। হামাগুড়ি দিয়ে চলল। চারিদিকের দরজায় কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল। ভাঙল দরজা। সাহেবের বন্দুক চলছে, মেম গুলি ভরছে। কিন্তু চারপাশের দরজা ভাঙলে সে কি করবে? সাহেবকে কেটেছিল তারা। পোড়া বলত—আমি ছিলাম বাইরে, ফাঁক পেয়ে গেলাম ভেতরে ছুটে। এক জায়গায় দেখলাম, ছোট একটা সাহেবের মেয়ে, কানে মাকড়ী, প'ড়ে আছে ভয়ে বেহুশ হয়ে। খুলে নিতে সময় লাগবে, নিলাম পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে।

অসংখ্য ডাকাতির গল্প।

মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে উনান জ্বেলে কড়া চড়িয়ে তেল গরম ক'রে সেই তেল গায়ে ঢেলে দিত। কত সময় মানুষকে বেঁধে সেই তপ্ত কড়ায় বসিয়ে দিত। জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটত। মানুষের গলা আধখামা বা দু'ফাঁক ক'রে দিয়ে যেত। শড়কিতে গেঁথে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিত।

কত রাত্রি বাল্যকালে আতঙ্কে বিনিদ্র কাটিয়েছি—তার হিসাব

নাই। মধ্যে মধ্যে এক-একটা সময় আসত, যখন দু-তিন মাসের মধ্যে তিন-চার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত। শৈশবের একটা স্মৃতি মধ্যে মধ্যে আজও মনে পড়ে। অন্ধকার রাত্রি, কাঁচা ধানভরা মাঠ, আর সেই মাঠের মধ্যে সঞ্চরমাণ কয়েকটা আলো দেখলেই মনে প'ড়ে যায় সে স্মৃতি।

সম্ভবত আশ্বিন মাস। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, পিসিমা উঠে বসেছেন, জানালা খুলেছেন, সভয়ে ডাকছেন—বউ—বউ—বউ!

মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ছাদে যাচ্ছি আমি।

আমি তখনও কিছু বুঝি নি। এই মুহূর্তে একটা তীব্র আর্ত-কণ্ঠের চীৎকার কানে এসে ঢুকল। উঃ, সে কি চীৎকার! বজ্রপাতের চীৎকারে স্তম্ভিত অভিভূত হয়ে যায় মানুষ, মরবার হ'লে, ম'রে যায় এক মুহূর্তে; কিন্তু এ চীৎকার যেন মানুষের শ্বাস রোধ ক'রে দেয় বিদারুণ আতঙ্কে। আকাশ চিরে গেল, বাতাসের পাথারে মাথা কুটে আছড়ে পড়ল সে চীৎকার। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে গেল। সে চীৎকারে ভয়ে কেঁদে উঠেছিলাম আমি। আমাদের বাড়ীর জানালা দিয়ে তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়, গ্রামের দক্ষিণ মাঠ নিম্নের জোল। সেই জোলের উপরে জমাট অন্ধকার থরথর ক'রে কাঁপছে। আলো—অনেক আলোয় ভ'রে যাচ্ছে—বিচ্ছিন্ন আলো সব ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর উঠল চীৎকার। মানুষের এমন প্রাণ-ফাটানো আর্তস্বর আর শুনি নাই। পরে শুনেছি সে চীৎকারে ভাষা ছিল—জান বাঁচাও! জান বাঁ-চা-ও!

আমাদের গ্রামের সিকি মাইল দক্ষিণে সিউড়ি থেকে কাটোয়া যাবার পাকা সড়ক চ'লে গেছে, সেই সড়ক দিয়ে—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চ'লে গেল সেই আর্তনাদ। জান বাঁ-চা-ও! বিপন্ন প্রাণের সেই

ভয়—সেই আকুতি এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে যে ঘরে ঘরে মানুষ থরথর ক'রে কাঁপল। বুকের ভিতরটা চড়চড় ক'রে উঠল, গলা শুকিয়ে গেল। আবার তার জান বাঁচাবার জন্য মানুষ দলে দলে আলো হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি তখন গ্রামের পক্ষে বেশী হ'লেও আমাদের গ্রামের পক্ষে, বিশেষ ক'রে আমাদের বাড়ির পক্ষে, বেশী নয়। রাত্রি এগারটা সবে বেজেছে। বাবার মজলিস পুরোদমে চলেছে। মা তখনও জেগে।

ছুটল মানুষ। কিন্তু দিগ্বিদিকহীন ভয়ার্ত হতভাগ্য সামনের পাকা রাস্তা ধ'রেই ছুটে চলেছে—ছুটেই চলেছে। নিতান্ত হতভাগ্য, গ্রাম ঠাওর করতে পারে নি। পাশের দু-চারটে ঘন জঙ্গল গেছে, আশ্রয় নিতে সাহস করে নি। সামনেই ছুটে চলেছে। পিছনে তার ছুটে আসছে মৃত্যুদূতের মত পরস্বাপহরী ঠ্যাঙাড়ে; আমরা বলি 'মান্‌যুড়ে'। আজ মনে হয়, মানুষ বাঘের মুখে সাপের মুখে তত ভয় পায় না, যত ভয় পায় হত্যাভিপ্রায়ে হিংস্র মানুষকে দেখে। তারই মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে বোধ হয় মৃত্যুর ভয়ালতম রূপ। আক্রান্ত মানুষটির পিছনে ছিল ওই ভয়ালতম রূপ; তাই উন্মাদের মতই সে সামনে ছুটে চলেছিল। হতভাগ্য ভাবতে পারে নি, নিয়তি নদীর রূপ নিয়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবে। সামনে ছিল নদী। আমাদের গ্রামের দেড় মাইল দূরে কুয়ে নদীর ঘাট—সেই ঘাটে সড়কে ছেদ পড়েছে। দিনে খেয়া চলে, রাত্রে জনহীন ঘাট। সেই ঘাটের উপরে উঠল আর একটা মর্মান্তিক চীৎকার। তারপর সব স্তব্ধ। সকলে ছুটে গেল। —ভয় নাই—ভয় নাই! গিয়ে দেখলে জনহীন ঘাট, ঘাটের উপরে

খানিকটা রক্তচিহ্ন। আর কিছু নাই। অনেক খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। শুধু দূরে ধানভরা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সঞ্চরমাণ ছায়ামূর্তির মত কয়েকটি কিছু যেন কেউ কেউ দেখেছিল। কিন্তু তারা ভয়ার্ত নয়, আলোর আশ্বাস তারা চায় না, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কোথায় সেই বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে, খুঁজে পাওয়া গেল না। পরের দিন পাওয়া গেল—নদীর ঘাটের খানিকটা পাশে—দহের বুকে ঝুঁকে-পড়া একটা শ্যাওড়া গাছের মধ্যে একটি বিদেশী মুসলমানের মৃতদেহ।

পরে প্রকাশ পেল ঘটনাটি।

'বাম্‌নিগ্রাম' বহুকাল থেকে একদল 'মান্‌ষুড়ে' মুসলমানদের জন্য কুখ্যাত। এ কাণ্ড তাদেরই। বিদেশী মুসলমানটি গরু বা মহিষ কিনতে এসেছিল পাঁচুন্দির হাটে। কাটোয়ার কাছে পাঁচুন্দি, কিন্তু তখন বাণ্ডেল-কাটোয়া-বারহারোয়া লাইন হয় নি। পাঁচুন্দি যাবার রাস্তা ছিল—লুপলাইনের আমেদপুর স্টেশনে নেমে ওই পাকা সড়ক। এই পাকা সড়কে আমেদপুর ও লাভপুরের মধ্যে এই বাম্‌নিগ্রাম। আমেদপুর হয়ে আগয়া নদীর ব্রীজ থেকে প্রায় তিন মাইল ব্যাপী প্রান্তর। মধ্যস্থলে সুঁদীপুরের বটতলা, ঝুরি-নামা শিকড়ে বিশ-পঁচিশটি কাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, সে এক ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঠাঁই। দিনে সূর্যের আলো পড়ত না। সুঁদীপুরের বটতলার উল্লেখ আমার রচনায় আছে, "ডাকহরকরা" গল্পে, "হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়"য় 'তামস-তপস্যা'য় আছে মনে পড়ছে। এই বটতলায় তারা রাত্রে পথিকের প্রতীক্ষা করত। বাঁশের খাটো লাঠি—মাটি ঘেঁষে সুকৌশল নিক্ষেপে প্রচণ্ড বেগে ছুটে পথিকের পায়ে আঘাত করত, পথিক প'ড়ে যেত। এরা ছুটে এসেই একটা লাঠি তার গলায় বা

ঘাড়ে দিয়ে দুই প্রান্তে পা দিয়ে চেপে ধরত, অন্য একজন দুজন পায়ে ধ'রে মানুষটাকে উল্টে দিত, মট্ শব্দ ক'রে ভেঙে যেত ঘাড়ের মেরুদণ্ডটা। তারপর অনুসন্ধান করত, তার কাছে কি আছে। এমনও শোনা গেছে যে, একজন মানুষকে হত্যা ক'রে পেয়েছে হয়তো চারটে পয়সা, আর তার পরণের জীর্ণ কাপড়খানা।

এই বিদেশী মুসলমানটিকে আমেদপুর থেকে—এই দলের একদল অপরাহ্নে ভুলিয়ে তার গাড়ীতে নিজের বাড়ী এনে তুলেছিল। স্বজাতি হিসাবে বিশ্বাস করেছিল সে। কিন্তু সন্ধ্যার পর লোকটি বুঝতে পেরেছিল এদের অভিপ্রায়। তাই এক সময়ে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে পথে প্রাণ ভয়ে ছুটেছিল। কিছুক্ষণ পর ষড়যন্ত্রীরা পালানোর কথা জানতে পেরে মুখের শিকার ফসকানো হিংস্র পশুর মত ছুটেছিল তার পিছনে পিছনে। দুরন্ত মৃত্যুভয়ে হতভাগ্য সামনে দুখানা গ্রাম পেয়েও তাতে ঢোকে নি। হয়তো গ্রাম ব'লে বুঝতে পারে নি। অথবা মানুষকেই আর বিশ্বাস করে নি। সেদিন সে মুহূর্তে কার উদ্দেশ্যে সে এমন ক'রে জান বাঁচানোর আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল—সেই জানে।

মানুষুড়ে মুসলমান দলটি আজ আর নাই। তাদের বংশই শেষ হয়ে গেছে। শুধু বাম্‌নি গ্রামেরই নয়, আরও কয়েকখানা গ্রামের এই অপবাদ ছিল। আমাদের গ্রামের উত্তর-পূর্বে মাইল চারেক দূরে ধনডাঙার হিন্দুদের এ অপবাদ ছিল। মাইল আষ্টেক দূরে দাশকল গ্রামে হিন্দুদের এ দুর্নাম ছিল। শোনা যায়, এইখানে যে ছিল এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক, সে একদিন রাত্রে পথিকভ্রমে হত্যা করেছিল নিজের একমাত্র পুত্রকে। ছেলে চীৎকার ক'রে বলেছিল—বাবা আমি, বাবা। তার দেহখানা ঘুরিয়ে দিতে দিতে

বাপ বলেছিল—এ সময়ে সবাই বাবা বলে। আমার "আখড়াইয়ের দীঘি" গল্প এবং 'দ্বীপান্তর' নাটকের উদ্ভব এখান থেকেই। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদওয়ালা বাদশাহী সড়ক এখানেই ; সেই সড়কের উপরে গাছতলায় ব'সে এক বৃদ্ধ বীরবংশীর মুখে এই পুত্রহত্যার কাহিনী শুনেছিলাম।

বজরহাট ব'লে একখানি গ্রাম আছে—মুসলমানের গ্রাম। ময়ুরাক্ষীর ওপারে। সেখানেও এই ব্যবসা ছিল। আমি নিজে একবার এই বজরহাট হয়ে যাচ্ছিলাম সাঁইথিয়া। সন্ধ্যার পর। পড়েছিলাম এদের হাতে। আমি ছিলাম বাইসিক্লের আরোহী, আর নিতান্তই ছিল পরমায়ু (এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা যায় না সে দিনের সে বিচিত্র পরিত্রাণকে), তাই বেঁচেছিলাম। সে কথা এখানে নয়।

লাঠিয়াল ডাকাত যারা তারা ঠিক এদের মত ছিল না। খুন তারা সহজে করত না। তারা এই মানুষ-মারাদের ঘৃণা করত। লাঠিয়ালের প্রকৃতি এবং মানুষুড়ের প্রকৃতিতেও প্রভেদ দেখেছি। লাঠিয়ালরা—ডাকাতরা অনেক ভাল। এদের কাছে গল্প শুনতাম। এমনি এদের কথা ভারি মিষ্টি। বলত—বুঝলেন বাবু, মদ খেছি গাঁয়ে মজলিস ক'রে; একজনা লোক, মাথায় গামছার পাগড়ী, হাতে আলানকাঠি, জাল বুনতে বুনতে এসে বসল। বললে—মদ দেবা খানিক? আমি ধীবর, যাব কুটুমবাড়ী, তা ভাই মদ দেখে ভারি লোভ লেগেছে। তা বললাম—ব'স, খা। খেলে, আলাপ করলে, চ'লে গেল। দু দিন পর এল পিঠে গামছায় বাঁধা পাঁচটা পাকী মদের বোতল আর এক বড় রুইমাছ। বললে—সেদিন তোমরা খাইয়েছ আজ আমি খাওয়াই। বুঝেচেন না, ভারী খুসী

হলাম। একদিন খেয়ে গিয়ে যেচে খাওয়াতে এসেছে লোকটা, খুসী হবারই কথা। তা আবার পাকী মদ। বুঝলাম, ধীবর মশায়ের পয়সা আছে। রাত-বিরেতে জাল ফেলে পরের পুকুরে রুই কাতলা ধরেন, পয়সার আর অভাব কি? ব'সে গেলাম খেতে। মাছ ভেজে বেশ আসর ক'রে বসলাম, সেও বসল। বসল কিন্তু নিজের কাজ ভুললে না। খেলে আর জাল বুনলে। গল্প করলে। আবার দিন সাতেক পর এল। তা'পরে বলে—সোনা থাকে তো দাও, কিনব। মানে ডাকাতির মাল। আরও দুদিন এল। মদ মাস, গান খুব জ'মে গেল। তা'পরেতে কথাবার্তা। সোনা দোব ঠিক হ'ল। দিনও ঠিক হ'ল। ঠিক দিনে বুয়েচেন কিনা 'ক্যার্-ক্যার্' ক'রে গোটা গাঁ ঘেরাও। চারিদিকে লালপাগড়ী। আর সেই ধীবর মশায় ভোল পাল্টে গোয়েন্দা দারোগা! ও বাবা! এমন ধীবরের মত জাল বোনা, এমন ঢক ঢক ক'রে পচুই খাওয়া—এ দেখে কি ক'রে বুঝব বলুন যে এ ধীবর নয়। তা আমরাও ঠকেছিলাম। তিনিও ঠকলেন। মাল কোথা পাবে—ঘরে কি থাকে? মাল পোঁতা আমাদের ময়ুরাক্ষীর ধারে, গাছের তলায়। তবু ছাড়ে না। নিয়ে গেল ধ'রে। মারপিঠ, নখে ছুঁচ ফুটানো, অনেক হ'ল। শেষ লোভ। অনেক ভাবলাম, ত'পরে বললাম—চল দেব দেখিয়ে। কিন্তু একা আমার সঙ্গে যেতে হবে। তাই রাজী। পিস্তল ঝুলিয়ে চলল। ময়ুরাক্ষীর বালিতে এনে এক জায়গা বেশ ক'রে খুড়লাম। বললাম—এইখানেই তো ছিল। কই? তা—। যা আঁচ করেছিলাম, ঠিক তাই হ'ল! দারোগা মনের আকুলিতে হেঁট হ'ল—"ছিল তো যাবে কোথায়?" ওই যেমন হেঁট হওয়া আর এক ঠেলা পেছন থেকে; মুখ থুবড়ে পড়ল সেই গর্তে।

অমনি চাবুলে ধ'রে দিলাম বালি চাপিয়ে। পা দুটো থাকল বেরিয়ে। আমি টেনে দৌড়। তা বেটার ভাগ্যি, পরমায়ু আছে—একটা মেয়েছেলে দেখেছিল, নদীর ধারে ঘাস কাটছিল, সে ছুটে এসে বালি সরিয়ে ঠ্যাঙে ধ'রে টেনে বেটাকে বার করলে!

—তারপর?

—তা'পর আর কি? তা'পরে বছরখানেক পরে ধরা পড়লাম; ঠেলে দিলে চার বছর!

হা-হা ক'রে হাসত।

এই আমার কালের প্রথম জীবনের সেকাল। সেকালের—সেকালের এই রূপ। দেশে নূতন কাল তখন এসেছে, এসেছে কলকাতায়, এসেছে তার আশেপাশের জেলায়, আমাদের জেলায় বোলপুরের প্রান্তে ভুবনডাঙায় শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, সেখানে এসেছে, বোলপুরের পাশে বিখ্যাত লর্ড সিংহের রায়পুর, সেখানে এসেছে; কিন্তু সিংহবাড়ীর নূতন কালের মানুষেরা এ দেশ ছেড়ে কলকাতায় গেছেন। শান্তিনিকেতনের চারিপাশে তখন গণ্ডী টানা। ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধের গণ্ডী টেনে এ দেশের লোক শান্তিনিকেতনকে পতিত ক'রে রেখেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা। প্রথম যেদিন সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়, যেদিন তিনি স্বর্ণ ডাইনির গল্প নিয়ে কথা বলেছিলেন সেই দিনেরই কথা।

ওই স্বর্ণের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধারা, কত বিচিত্র রীতিনীতি, কত বিচিত্র মানুষ, এঁরা তা দেখেন নি, দেখা দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারেন না। তুমি এদের দেখেছ। আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু দেখি নি।

দেখবার সুযোগ পাই নি, দেখতে দাও নি তোমরা, আমাদের তোমরা পতিত ক'রে রেখেছিলে।

পতিত শব্দটি তিনিও ব্যবহার করেছিলেন।

আবার এর একটি বিপরীত দিকও আছে। নূতন কালের মানুষেরা পুরানো কালের মানুষদের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

এক দিকে ছিল ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত উপেক্ষা।

অন্য দিকে ছিল পীড়িতচক্ষু মানুষের আলোক-ভীতির মত বেদনা-দায়ক বর্জন-প্রবৃত্তি।

একটা নদীরই মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চড়া, চড়ার দুধারে ব'য়ে যাচ্ছে দুটি স্রোত। একটির সম্মুখে পথের সন্ধান নাই, অপরের সম্মুখে পথের সন্ধান এবং জীবনের গতি। কিন্তু দুটি একত্রিত না হ'লে জলস্রোতে সে বেগ সঞ্চারিত হবে না, যে বেগে সম্মুখের যে ভূমিতলে পথের দিশা আছে, সে ভূমিতলকে কেটে আপন গর্ভপথে পরিণত ক'রে তারই বুক বেয়ে ধেয়ে যেতে পারবে জীবনস্রোত সাগরাভিমুখে।

না। সেকালের সেকালে আরও আছে। আছে অবশ্য অনেক, কিন্তু যেটুকুর কথা মনে প'ড়ে গেল, সেটুকু না বললে সে-কালের অনেকটাই অপ্রকাশ থেকে যাবে।

আগে কিছুটা বলেছি। বলেছি, বাখারে গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে বড় বড় বলদ ছিল, দুধালো গাই ছিল, গ্রামে বড় বড় পুকুর ছিল—পুকুরে গভীরতা ছিল, জল ছিল অথৈ, সে অথৈ জলে পুকুর-ভরা মাছ ছিল, বাড়ীর ক্ষেতে খামারে শাক ছিল, সব্জী ছিল, ঘরে কাঁসা পিতলের বাসন ছিল, রূপার বাসনও ছিল দু-দশ জনের ঘরে। আরও ছিল—আকাশে মেঘ ছিল, সে মেঘে জল ছিল। অনাবৃষ্টি তখন কম হ'ত। তখন বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত। আমার মনে আছে, ১৩১৩ সালে আমাদের অঞ্চলে 'আকাড়া' অর্থাৎ অনটন হয়েছিল। টাকায় তেরো সের চাল হয়েছিল; কাঁচি ৬০এর ওজনের তেরো সের আজকের ৮০র ওজনের দশ সের তিন পোয়া। আজকের ওজনের এক সের চালের দাম হয়েছিল ছ পয়সা। পরবর্তী কালে জেলার বৃষ্টিপাতের খতিয়ান দেখেছিলাম, তাতে দেখেছি সেবার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৪০ ইঞ্চির কিছু বেশী। আজ সেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয়েছে ৩০ ইঞ্চি থেকে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত, যে বৎসর খুব বেশী বর্ষা হয়, সে বার হয়তো ৪৫ ইঞ্চিতে পৌছোয়। তাই বলছি, আকাশে মেঘ ছিল, মেঘে জল ছিল।

আমার 'গণদেবতা' বইয়ে আমি লিখেছি, গ্রাম্য বৃদ্ধ দ্বারিকা

চৌধুরী গ্রামে আটকবন্দী যতীনের সঙ্গে আলাপ করতে এলে যতীন তাকে বলেছিল—"সেকালের গল্প বলুন আপনাদের।

—গল্প? হ্যাঁ, সেকালের কথা একালে গল্প বইকি। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্তাদের সঙ্গে দেখা হবে তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি তাই বলব, সেও তাঁদের কাছে হবে গল্প। সেকালে গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, ক্রিয়াকর্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁঠালের বাগান করতাম, পথের ধারে মাঠের মধ্যে পথিকের ছায়ার জন্যে, চাষীর ছায়ার জন্যে, গাছ প্রতিষ্ঠে করতাম ; মানুষে, জীবে জন্তুতে জল খাবে ব'লে পুকুর প্রতিষ্ঠে করতাম, সরোবর দীঘি কাটাতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে করতাম, তাঁর প্রসাদে ঘরে নিত্য অতিথি সৎকার হ'ত। মহাপুরুষদের ঈশ্বরদর্শন হ'ত। তাঁদের আশীর্বাদ পেতাম। এই আমাদের সেকাল। সে তো আজ আপনাদের কাছে গল্প মনে হবে গো!

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরী মশায়?

—আমার ভাগ্য ভাঙা ভাগ্য বাবা। ভাঙা ভাগ্যের ঝুড়ি ভাঙা, কোদাল ভাঙা, মাটি কাটা যায় না, কোন মতে খুড়লেও ভাঙা ঝুড়িতে তুলে ফেলা যায় না। তবে আমার বাবা দীঘি কাটিয়েছিলেন। তখন আমি ছোট, আমার মনে আছে। এক ঝুড়ি মাটি কাটত একজন, বইত একজন। দশ কড়া কড়ি ছিল দাম। মানে আধ পয়সা। একজন লোক ব'সে ব'সে ঝুড়ি গুনত, কড়ি দিত। বিকেলে কড়ি দিয়ে পয়সা নিয়ে যেত।

—আধ পয়সা ঝুড়ি?

এ আমি কল্পনা ক'রে লিখি নি। এই সেকালের কথা। আধ পয়সা ঝুড়ি মজুরি, ওদিকে দু'টাকা মণ চাল। টাকায় চব্বিশ সেরও

দেখেছি আমি। দুধের সের ছিল দু'পয়সা। হিসেব ছিল "পাই" অর্থাৎ আধ সেরের—এক পয়সায় এক পাই দুধ মিলত।

মায়েরা ছেলেদের চাঁদ ধ'রে দেবার জন্যে চাঁদকে লোভ দেখিয়ে ডাকতেন—

"আয় চাঁদ আয় আয়
বাটি ভ'রে দুধ দোব
রূপোর থালায় ভাত দোব
রুই মাছের মুড়ো দোব
সুখশয্যে পেতে দোব
চাঁদ তুই সুখে নিদ্রা যাবি
আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে
ছায়ায় ছায়ায় যাবি।"

ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসীকে ডেকে বলতেন—

"ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী ঘুম দিয়ে যাও।
বাটা ভ'রে পান দেব গাল পুরে খাও॥"

আবার ছেলে ভুলাবার, ছেলে ঘুম পাড়াবার অন্য ছড়াও আছে, যে ছড়া সম্ভবত সেকালের হরিজন সম্প্রদায়ের মায়ের রচিত—

"আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম বাউরীপাড়া দিয়ে
বাউরীদের ছেলে ঘুমালো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।"

ঘুম যদি জেলেপাড়া দিয়ে যেত, তবে ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুমাত। যদি যেত ডোমপাড়া দিয়ে তবে ঘুমাত টোকা বা ঝুড়ি মুড়ি দিয়ে। দারিদ্র্য ছিল। এখনকার তুলনায় ঘরদুয়ারের অবস্থায়, পরিচ্ছদের ব্যবস্থায়, আভরণের ব্যাপারে সেকালের দারিদ্র্যকে অতি নিষ্ঠুর মনে হবে। আজ আমাদের হরিজনদের ঘর-দুয়ার অনেক

ভাল, দরজা-জানালা আছে, অনেকে মাটির কোঠা অর্থাৎ দোতলা করেছে, বাইরে বারান্দায় কলি ফেরানো অর্থাৎ চুন দেওয়া হয়েছে, দরজায় আলকাতরা মাখানো হয়েছে। সেকালের ঘর ছিল ঘুপচি ; হয়তো চারকোণে মানুষের মাথায় চাল ঠেকত ; জানালা দূরে থাক্, দরজাও সর্বক্ষেত্রে থাকত না, থাকত আগড়। একখানিই ঘর, তার এক দিকে হেঁসেল, এক দিকে হাঁস মুরগী, মাঝখানে শুত মানুষ। আজ মুরগী হাঁস আলাদা থাকে, রান্না রাখবার জায়গা আলাদা, মানুষেরা শোয় অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ায় তক্তাপোষে, বিছানাও তাদের ভাল। সেকালে দরিদ্র পুরুষেরা সাত হাত কাপড় প'রে নগ্নপ্রায় হয়ে বেড়াত, মেয়েরাও পরত তাঁতের খাটো সাড়ে আট হাত শাড়ী। আজ দশ হাত শাড়ী জামা সেমিজ পরে। যুদ্ধের পরে হাফপ্যান্ট যথেষ্ট আমদানি হয়েছে। সেকালে মেয়েদের আভরণ ছিল রূপাদস্তার বালাকাটা ব'লে একটা গয়না। কারুর গলায় পিতলের 'মুড়কীমালা'—মোটা কস্তায় মাদুলী গেঁথে তারই মালা ; আর কারও কারও থাকত সরষের মত গোল একদানা সোনার নাকছবি। আজ মেয়েরা রূপোর গয়না তো পরেই, অধিকাংশেরই হাতে তামার উপর সোনার পাত মোড়া শাঁখাবাঁধা আছে। সোনার বেশ মানানসই নাকছবি সকলের নাকেই আছে,—কারও নাকে হরতন, কারুর চিড়িতন, কারও একটা ইংরাজী অক্ষর, কারুর কারুর সোনার নাকছবিতে ওপেল পাথর কি ছোট রুবির টুকরো দেখতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া মাথায় রূপোর কাঁটা, কানে সোনার টাপ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। সেকালে রাত্রে অধিকাংশ ঘরেই আলো জ্বলত না। কেরাচিনি (কেরোসিন) তেলের একটি ডিবে আর একটি 'খরবাক্‌সো' বা 'জেশলাই' অর্থাৎ ফায়ারবক্‌স

বা দেশলাই থাকত বিপদ আপদের জন্য, তাতে অন্তত একটা মাস চ'লে যেত। তাদের কেউ কেউ নিমের ফল কুড়িয়ে জড়ো করত। জেলেদের পাড়ায় এটি ছিল প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। নিমের ফল কুড়িয়ে ঘানিতে পিষিয়ে তেল তৈরী ক'রে সেই তেলে প্রদীপ জ্বালানো হ'ত। আজ প্রত্যেক ঘরেই হ্যারিকেন হয়েছে, ডিবেও আছে, আলো নিয়তই জ্বলে। নিমফল অবশ্য ছেলেরা এখনও কুড়িয়ে তেল পিষিয়ে নেয়। সমস্ত দিন জলে কাজ ক'রে এসে এই নিমতেল তারা গায়ে মাখে চর্মরোগ নিবারণের জন্য। তুলনায় সেকালের দারিদ্র্য শোচনীয় ছিল মানুষের। কিন্তু তবুও সেকালে অনাহার, অর্ধাহার ছিল না, একালে অবস্থার এই উন্নতি সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে তাদের অনাহার ঘটে।

সেকালের ব্যবস্থায় এদের সঙ্গে মধ্যবিত্তদের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ এবং অন্তরঙ্গতা ছিল। বিচিত্র এবং মধুর সে যোগ ও অন্তরঙ্গতা। এক-একটি বর্ধিষ্ণু পরিবারের সঙ্গে কয়েকটা ক'রে দরিদ্র পরিবারের এই সম্পর্ক ছিল। প্রায় পুরুষানুক্রমিক যোগ।

আমাদের বাড়ীর সঙ্গেও এমনি যোগ ছিল গুটি কয়েক পরিবারের। তাদের মধ্যে 'ধাত্রী দেবতা'র শিবুর অনুচর শম্ভু বাউরীদের বাড়ীই প্রধান। শম্ভুর পিতামহ থেকে তারা আমাদের বাড়ীতেই কাজকর্ম করে। শম্ভুর পিতামহকে আমি দেখি নি। তার পিতামহী 'মোনা'—নাম ছিল মনোমোহিনী—তাকে আমি দেখেছি। ভোর না-হতেই মোনা এসে হাজির হ'ত। এসেই ঘর দুয়ার উঠান থেকে চারিপাশ সাফ করত, জল দিয়ে ধুয়ে দিত। কালো পোকা-খেগো চেহারার মত বুড়ী মোনা এসেই প্রথম বকত বাড়ীর ঝিকে। তারপর চাকরকে, তারপর রাঁধুনীকে, তারপর

কখনও কখনও আমার মাকে। শুধু বকতে সাহস করত না আমার পিসীমাকে। বকত বাড়ীর বিশৃঙ্খলার জন্য, অব্যবস্থার জন্য।

বলত—হা টে, (অর্থাৎ হ্যাঁ লা) টুকুচি শাসন করতে লারিস (পারিস না) ওই ঝিচাকরগুলানকে? অমুনি অব্যবস্থা। দেখ্ দেখ্, তোর কটা কটা চোখ দুটো তো খুব ঝকমকে, বলি আপচোটা (অপচয়) একবার দেখ্। জিনিষ ফেলেছে দেখ্।

মা হাসতেন। মোনা বা তার সম্প্রদায়ের সকলেই 'আপনি' ব'লে কথা বলতে জানে না, এ কথা নয়। বাবা যদি ডাকতেন, মোনা! তৎক্ষণাৎ মোনা হাত জোড় ক'রে উত্তর দিত—আজ্ঞে বাবা, আজ্ঞা করুন।

মোনা আমাদের শাসন করত। আমাকে কম। কিন্তু আমার মেজ ভাই, আমার বোনকে শাসন তো করতই, প্রহারও করত।

ছেলেবেলায় চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত আমাদের এদের বাড়ীতেই কাটত। এরাই মানুষ করত। সকালবেলায় নিয়ে যেত, এগারটা নাগাদ ফিরিয়ে আনত, তারপর নিয়ে যেত আবার বেলা তিনটেতে। সন্ধ্যে হ'লে বাড়ী দিয়ে যেত। ওদের অন্ন ব্যঞ্জন অনেক পেটে আছে আমাদের।

মোনার একটা কথা ভারী কৌতুককর। সে ব্যাঙকে ভয় করত যমের মত। তার ধারণা ছিল ব্যাঙের বিষেই সে মরবে। ব্যাঙ দেখলে মোনা ভয়ে আতঙ্কে বু-বু তি-তি শব্দ ক'রে লাফাতে আরম্ভ করত। অকস্মাৎ বড় ব্যাঙের সামনে পড়লে তার চোখের দিকে চেয়ে যেন আতঙ্কে জ'মে পাথর হয়ে যেত।

মোনার ছেলে গোষ্ঠ আমাদের বাড়ীতেই গরুর পরিচর্যা করত। সে মারা গেলে তার তিন ছেলে সতীশ, মতিলাল, শম্ভু—সকলেই

প্রথমে রাখাল, তারপর মাহিন্দার, তারপর কৃষাণ ও ভাগ জোতদারের কাজ করেছে। সতীশের পুত্র 'লেড়ো', সেও কাজ করেছে।

মোনা মারা গেল। তারপর মোনার পুত্রবধূ তার কাজ করতে লাগল। সতীশের মাকে আমরা 'সতের' মা বলতাম। সতের মা সে দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। শেষ বয়সে কাজ করতে পারত না, তার পুত্রবধূ 'সতের বউ' তখন কাজ করত।

সতীশের মায়ের কি অধিকার আমাদের উপর! তার সে অধিকার অনস্বীকার্য। অকপটে বলছি, সে অধিকার স্বীকার করতে কোনদিন একবিন্দু গ্লানি অনুভব করি নি। এসে দাঁড়াত সতের মা, বলত—বলি হাঁগো, তুই ইসব কি করছিস ? লোকে বলছে—তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে? সাহেবদের সঙ্গে ল্যাই (কলহ) করছিস! একজনা বললে—জ্যালে ভ'রে তো দেবেই, গুলি ক'রে না দেয় তো ভাল।

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল সতের মা।

ইদানীং যখনই কলকাতা থেকে বাড়ী যেতাম তখনই স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ী যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকত সতের মা, বলত, বাবা এলি? অঃ, আচ্ছা পাষাণ বটিস বাবা। আঃ, মুখ মনে পড়ে না রে! দাঁড়া খানিক দেখি।

আমি জেলে থাকতে শম্ভু মধ্যে মধ্যে রওনা হ'ত সিউড়ী, বড়-বাবুর সঙ্গে দেখা সে করবেই। কিন্তু খানিকটা পথ যেতে যেতে তার সাহস চ'লে যেত, পুলিশ এবং সাহেবদের ভয়টা উঠত বড় হয়ে, ভগ্নমনে বাড়ী ফিরে কাঁদতে বসত।

অন্য দিক দিয়ে আমাদের বাড়ীতে তাদের অখণ্ড অধিকার ছিল, অংশীদার বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিপদে, রোগে,

আট আনার বিনিময়ে ভ্রষ্ট করেছে—ভোগ করেছে। এমনও হয়েছে যে, গভীর রাত্রে নেশার তাড়নায় কামোন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জ হল্লা ক'রে ওদের পল্লীতে প্রবেশ করেছে, লাথি মেরে ঘরের আগড় বা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকেছে, ভীত স্বামী বা পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, বাড়ীর গৃহিণী কর্তার পৌরুষের লজ্জাকে ঢেকে নিজের নারীজনোচিত লজ্জার মাথা খেয়ে সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে বা বিনা দক্ষিণাতেই বধূ বা কন্যাকে সমর্পণ করেছে ভদ্রজনের হাতে। কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছে, তবে শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিযোগকারীকেই ঘৃণাভরে কঠিন শাসন ক'রে উত্তর করেছেন—নিজের ঘর শাসন কর্ হারামজাদা। আর কারও ঘরে না গিয়ে তোর ঘরেই গেল কেন? আমরাই এদের সমগ্র নারী-সমাজকে এমন ক'রে তুলেছি যে, এরা ক্রমে হয়ে উঠেছে জন্মগত স্বৈরিণী। চারিদিকের সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যাধিগ্রস্ত ক'রে তুলেছে। বছর কয়েক আগে আমি হিসাব ক'রে দেখেছি, এদের শতকরা ষাটটি বাড়ী আজ সন্তানহীন। আলো বেশী কি অন্ধকার বেশী বিচার করতে চাচ্ছি না। শুধু স্মরণই করছি সেকালকে।

এদের বিপদে সেকালে সাহায্য করেছি, রোগে ডাক্তার দেখিয়েছি, অভাবে দান করেছি, ওরাও নিয়েছে—এ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে, স্বল্প অপরাধ ওদের ক্ষমা করলেও কি কঠিন শাসনই না সেকালে করেছি আমরা। সে শাসন নয়, নির্যাতন।

প্রথমেই আমার বাবার কথাই বলি। পিতামহের শ্রাদ্ধে মাছ ধরানো হ'ল আমাদের পুকুরে। এক-একটি মাছ পনের সের থেকে বিশ সের চব্বিশ সের। জেলেরা টানা জালে মাছ ধরলে। মাছ

তুললে কিন্তু একখানা মাছশুদ্ধ জাল জলে ফেলে রেখে এল সকলের অজ্ঞাতসারে। তার মধ্যে রইল একটা আঠারো সের মাছ। বাকী মাছ বাড়ী এল, জেলেরা সকলেই বাড়ী চ'লে গেল। বাড়ীতে ক্রিয়ার আয়োজন চলেছে, এমন সময় একজন চুপিচুপি খবর দিয়ে গেল, জেলেরা মাছ চুরি করেছে এবং সেই মাছ এনে কাটাকুটির আয়োজন করছে। হাটকুড়া জেলে এর পাণ্ডা, কীর্তি তারই। বাবা অগ্নিমূর্তি হয়ে বেত হাতে বেরিয়ে গেলেন একটা জনবিরল পথ ধ'রে, তার খানিকটা অতিক্রম করলেন একটা পুকুরের জলহীন অংশ ধ'রে। অকস্মাৎ গিয়ে উঠলেন হাটকুড়ার উঠানে। জেলেরা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। বাবা হাটকুড়াকে বেতের আঘাতে জর্জরিত ক'রে দিলেন। মাছ উঠিয়ে আনা হ'ল। বাবার শেষে খানিকটা অনুতাপ হ'ল, তিনি হাটকুড়াকে ডেকে এক টাকা বকশিশ দিলেন। এ আমার শোনা গল্প। আমার জীবনে আমি বাবাকে প্রহার করতে দেখিনি। তখন তাঁর ঘোর পরিবর্তন হয়েছে।

চোখে দেখেছি কত শাসন, আমাদের বাড়ীতে না হলেও আশেপাশে মাসে দুটো একটা এ শাসন চলত। একবার দেখেছিলাম এক শাসন। স্মরণ ক'রেও শিউরে উঠি আজ।

হঠাৎ চামড়ার দর চ'ড়ে গেল। সক্রিয় এবং সচেষ্ট হয়ে উঠল চামড়ার ব্যবসাদারেরা। এরা সকলেই মুসলমান। চামড়া সংগ্রহ ক'রে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামে হিন্দু সমাজের চর্মকারেরা বিক্রি করে। এরা চামড়া ছাড়িয়ে আনে ভাগাড়ে-ফেলে-দেওয়া মৃত জন্তুর দেহ থেকে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে আমাদের দেশে গরুই প্রধান।

হঠাৎ গরু মরতে সুরু হ'ল। গরুর পাল চারণভূমে যায়, ফিরে আসে - হঠাৎ অবস্থা দাঁড়ায় কলেরা-রোগাক্রান্ত মানুষের মত, ওষুধ

অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান ক'রে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোন মতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় অপর কোন ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিল।

থাক্ সে কথা।

মুসলমানেরা কিন্তু হরিজন কৃষক মজুরদের মত এত নত ছিল না। থাকবার কথাও নয়। ইসলামের ওই গুণটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। চোখে দেখেছি যে, হরিজন কোন কারণে ইসলাম অবলম্বন করলে কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিবর্তন ঘটে, সে মাথা উঁচু ক'রে চলতে শেখে।

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আধিপত্য ছিল জমিদার হিরণ্যভূষণ-বাবুর। তারপর সে আধিপত্য আয়ত্ত করলেন নবোদিত ধনী যাদবলালবাবু। এই আয়ত্তে আনার উদ্যোগপর্বে ওই সব গ্রামের জমিদারির অংশ কিনলেন তিনি। তাদের প্রচুর কাজ দিলেন। বড় বড় ইমারত তৈরীর কাজে, দীঘি কাটার, জমি তৈরীর কাজে তাদেরই তিনি ডাক দিলেন। তারা এল এগিয়ে। তবুও তারা হিরণ্যবাবুকে ত্যাগ করলে না। তখন যাদবলালবাবুর বড় ছেলে এদের শাসন করবার জন্য উদ্যত হলেন। বেত হাতে নিলেন। ফলে একদা গুজব রটল, মুসলমানেরা এক হয়ে এর প্রতিবাদে বদ্ধ-পরিকর হয়েছে। তারা স্থির করেছে, অত্যাচারীকে হত্যা ক'রে ফেলবে। স্বর্গীয় যাদবলালবাবু উপেক্ষা করলেন না গুজব, তিনি পুত্রকে সংযত করলেন, মুসলমানদের ডেকে সান্ত্বনাবাক্য ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এ অত্যাচার তিনি কোন মতেই হতে দেবেন না।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা নিয়েও কোন বিরোধ সে দিন অনুভব করি নি। শুদ্ধাচারী হিন্দু মুসলমানকে স্পর্শ ক'রে কাপড় ছাড়তেন। এ মুসলমানেরা জানতেন। তাঁরাও কোন দিন হিন্দুর বাড়ীতে অন্নজাতীয় আহার্য গ্রহণ করিতেন না। মধ্যে মধ্যে সামাজিক নিমন্ত্রণে সিধা এবং ফল-মিষ্টান্নের আদান-প্রদান চলত।

তবু এ কথা বলব যে, বাহ্যিক প্রশান্ত প্রসন্ন এই সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন ছিল একটি ভেদ এবং বিরোধের সুর।

মনে পড়ছে এবারত হাজী এবং আব্বাস হাজীকে।

এবারত হাজী ভীমের মত বিশালকায় মানুষ। দুই ভাই প্রথম জীবনে মাটি কাটার কাজ করতেন। শুধু দেহের শক্তিবলেই বিস্তীর্ণ ভূমিলক্ষ্মীর অধিকারী হয়েছিলেন। শুনেছি, দুই ভাই পতিত জমি বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেরা কোদালে কেটে মরা পুকুরের পাঁক ব'য়ে তাতে দিয়ে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। দুনিয়া শুদ্ধ লোকের চাচা ছিলেন। হজ ক'রে এসেছিলেন। মাথায় টুপী প'রে লুঙ্গির মত কাপড় প'রে, গায়ে চাদর দিয়ে আসতেন, আমাদের বাড়ীতে আসতেন, বাড়ীর ভিতর আসতেন—কই, পিসীমা কই?

আমরা ডাকতাম—চাচা।

উত্তর দিতেন—বাপ। ঘুরে তাকিয়ে বলতেন, আরে বাপ রে, বাপজান! ছোট হুজুর!

বলতাম, চাচা সেইটি বল।

হা-হা ক'রে হেসে চারদিক চঞ্চল ক'রে তুলে বলতেন—খুব উঁচু গলায় লম্বা উচ্চারণে বলতেন, আমরা মু-স-ল-মা-ন, আমরা এ-ত্তো ব-ড়ো—। নিজের হাতটা যতখানি ওঠে তুলে এবং নিজে

খুঁড়িয়ে উঠে আরও খানিকটা উঁচু ক'রে দেখাতেন কত বড়। তারপর মিহিগলায় হাতের দুটি আঙুল জুড়ে একটি মটর বা সরষের আকার দেখিয়ে বলতেন—তোমরা হিন্দু এতটুকু। কথাগুলি দ্রুত উচ্চারণে ব'লে যেতেন।

এটুকু অবচেতন বিরোধের প্রকাশ। সমাজগত ভাবে বিরোধ উপস্থিত হ'লে এর প্রকাশ্য প্রকাশ হ'ত। সেকালে কদাচিৎ হ'ত। তবু ছিল।

এই আমার সেকালের সেকাল।

আমার কালের সেকালের আর একটি স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এর আগে তার দোষ বলেছি, গুণ বলেছি, যেমন চিনেছি তেমন বলেছি। এবার যেটি বলব সেটি সুন্দরের স্মৃতির শোভা। সেকালের ঘর-দুয়ারের ছিল পরিচ্ছন্ন-শ্রী। অপরূপ শ্রী ছিল। স্বাচ্ছল্য সেকালে ছিল। কিন্তু একালে স্বাচ্ছল্য অনেক স্থলে অনেক বেশীই আছে, সমারোহ একালে সর্বত্রই বেশী। কিন্তু স্বল্প আয়োজনে যে পরিচ্ছন্ন শ্রী সেকালে দেখেছি সে একালে নাই। নিকানো মাটির মেঝে—খড়ি রঙের আলপনা, নিকানো উঠান, নিকানো খামার, সবুজ সব্জীক্ষেত, ঘরের এক পাশে কিছু ফুলের গাছ—এই আয়োজনের সে শ্রী অপরূপ। আজ দালান হয়েছে, পাকা মেঝে হয়েছে, চেয়ার টেবিল আসবাব হয়েছে, ফোটোগ্রাফে ছবিতে দেওয়াল সাজানো হয়েছে; কিন্তু সে পরিচ্ছন্নতা নাই— সে নয়নমনোরম শ্রী নাই।

ফুলের বাগান—অন্ততপক্ষে কয়েকটি ফুলের গাছ সব বাড়ীতেই ছিল। রুচিবানদের বাড়ীতে বাগান ছিল। আমার বাবার বাগান ছিল বিখ্যাত। সকালবেলাতেই দেবস্থলের পূজারীতে, ইষ্টভক্ত

প্রবীণ-প্রবীণা পূজার্থীতে, ব্রতপরায়ণা কুমারীর দলে ভ'রে যেত।
সে বাগানের চিহ্ন আজও আছে দু-একটি পুরানো গাছে আর ইটের কেয়ারীতে। মাঝখানে ছিল একটি বাঁধানো বেদী। সেটিও আছে। বেদীর কোল ঘেঁসে সোজা একটি রাস্তা—তার দুধারে বাগান। বাগানের পশ্চিম দিকে গ্রামের রাস্তা, বাগানের দুই প্রান্তে বাড়ী ঢুকবার দুটি দুয়ার—এক দুয়ারের মাথায় মাধবীলতা, অন্যটির মাথায় ছিল মালতীলতা। বর্ষার শেষে শরতের প্রারম্ভে সাদা ফুলের অজস্রসম্ভারভরা মালতীলতাটি আর নীল আকাশের টুকরা টুকরা সাদা মেঘ—মনকে অপরূপ প্রসন্ন মাধুর্যে ভ'রে দিত। আর তেমনি উঠত নাতিমদির মৃদু মধুর গন্ধ। মালতীর মালা গেঁথে—কোনদিন আমার গলায় পরার অথবা প্রিয়ার কবরী ভূষিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগে নি। ফুল তুলে দেবস্থলে পাঠিয়েছি। বসন্তে ফুটত মাধবী, অপরূপ কারু তার গঠনে—মর্মস্থলে বাসন্তী রঙের ছোপ, থোকা থোকা ফুটে থাকত হরিদ্রাভ-মর্ম রত্নগুচ্ছের মত। তেমনি মধুর গন্ধ! এ ফুলে মালা গাঁথা যায় না, আমি গাঁথতে পারি নি, গুচ্ছ গুচ্ছ তুলে দেবপূজায় পাঠিয়েছি, বিছানায় ছড়িয়েছি। বসন্তে আরও ফুটত বেল ফুল, রজনীগন্ধা। বেল ফুল ফুটত প্রত্যহ এক ঝুড়ি। বসন্তে সুরু হ'ত—চলত বর্ষার শেষ পর্যন্ত। বর্ষায় আরও ফুটত জুঁই। লতানে জুঁই নয়, ঝাড় জুঁই, এ ঝাড় দুটির গোড়া খড়ের দড়িতে বেঁধে বাবা তাকে এক বড় তোড়ার মত আকার দিয়েছিলেন। রাশি রাশি জুঁই ফুটত। মালা গাঁথা হ'ত, দেবতা পরতেন—মানুষ পরত। আর ছিল কামিনী। করবী টগর জবা, এরা ছিল—বারো মাস ফুল দিত, কামিনী দিত কিছুদিন পরে পরে—ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল; সমস্ত রাত্রিটা মদির ক'রে রাখত

বায়ু-পরিমণ্ডলকে। সকাল থেকে তার ঝরা সুরু হ'ত। শরতে শিউলি ফুটত, মেয়েরা ফুল কুড়িয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে শুকিয়ে কাপড় রাঙাত। আমরা কাগজে দেওয়ালে কাঁচা বোঁটা ঘ'ষে হলুদ রঙের দাগ টানতাম। ম্যাপে দিয়েছি শিউলি-বোঁটার হলুদ রঙ। ধারে ধারে ছিল ফলের গাছ, নারকেল গাছ ছিল, কাঠাল গাছ ছিল, লেবু ছিল; সুপারী ছিল, আর ছিল আমাদের শিশুজিহ্বা-মনোহর পেয়ারা গাছ। একটু দূরে ছিল একটি আম গাছ, আমার শৈশবের কত দ্বিপ্রহর সেই গাছে কেটেছে; পেয়ারা গাছে আমার কত কাপড় ছিঁড়েছে তার হিসেব নাই, কিন্তু মনে আছে। এই সব ফুলের শোভার মধ্যে আমাদের বাড়ীতে মধ্যমণির মত ছিল একটি গোলাপ গাছ। ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপের গাছ। গাঢ় কালচে লাল, ভেলভেটের মত একটি কোমল লাবণ্য ভরা সে ফুল—আজও আমার মনের মাঝখানে যেন ফুটে রয়েছে। ঘন সবুজ ডাঁটার সর্বাঙ্গে কাঁটা—অগ্রভাগ ঈষৎ রক্তাভ, তারই প্রান্তে বড় আকারের ফুলটি বাতাসে দুলত;—লাল মাণিকের মত ফুটে থাকত। একটি ফুলই মনে পড়ে। কবে যে ফুটে আমার মনোহরণ করেছিল, সে দিন ক্ষণ মনে নাই, ফুলটি অক্ষয় আছে মনে—কোন দিন ঝরল না, শুকাল না।

ফুল জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক দেখব, কিন্তু, আজ বার বার মনে হয়—তেমন গোলাপ আর কোথাও ফুটবে না; তেমন ব্ল্যাকপ্রিন্স আর দেখব না। সেই বোধ হয় প্রকৃতির রূপের সঙ্গে আমার শিশুচিত্তের প্রথম প্রেম—শুভদৃষ্টি।

নীল আকাশের তলে বৈঠকখানার সাদা দেওয়ালের পটভূমিকে পিছনে রেখে গাঢ় কালচে লাল—ব্ল্যাকপ্রিন্স দুলত। লম্বা সবুজ ডাঁটিটি পর্যন্ত মনে রয়েছে। ছোট আমি—আমার চেয়ে খানিকটা

রড়ই ছিল স্মৃতির সেই ডালটী, তারই মাথায় সেই গাঢ় লাল কোমল ফুলটি ;--তুলতে বারণ ছিল, কিন্তু লোভ ছিল, নুইয়ে শুঁকতে চেষ্টা করেছি, স্পর্শ করতে চেয়েছি, পারি নি, কাঁটা ফুটেছে হাতে, লাল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়েছে। রক্তের ফোটায় ব্ল্যাকপ্রিন্স ফুটত।

সে গাঢ় কালচে লাল মস্ত বড় গোলাপ ফুল—একালে আর কোথাও ফুটল না। তাই বলছিলাম—আমার সেকালের পুষ্পশোভা আর এই লাল গোলাপ ফুল, একালের সকল দীপ্তির মধ্যেও অম্লান-দীপ্তিতে ফুটে আছে। ঘন লাল কালচে লাল ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ সে বোধ হয় আমার কাছে ছিল ব্ল্যাকপ্রিন্সেস।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়—জীবন ও স্মৃতি যদি এমন জীর্ণই হয়ে আসে যে, সকল কিছু সুন্দরের মুখ কুহেলিকায় ঢেকে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে, তবে শেষ ঢাকা প'ড়বে ওই লাল ফুলটি। ওই যেন আমার সকল সুন্দরের কেন্দ্রে বিরাজিত রয়েছে। মৃত্যুকে বলি—মৃত্যু, তুমি যদি সুন্দর হও, তবে তোমায় নিশ্চয় দেখব ওই স্মৃতির গাঢ় লাল গোলাপের ছবিতে, জীবনের দৃষ্টিগণ্ডী ক্রমসঙ্কুচিত বলয়রেখার মত ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসবে, আকাশ পৃথিবীর মানুষ সবই বলয়গণ্ডীর বাইরে প'ড়ে যাবে, শেষ থাকবে ওই ফুলটি। ফুলটি যখন থাকবে না, তখন চোখের দৃষ্টি মুছে যাবে। আমার ব্ল্যাকপ্রিন্সেস। গাঢ় কালচে লাল—ভেলভেটের মত গোলাপ ফুল আমার কালের সেকালের এবং সকল কালের মনোহারিণী।

দোষে গুণে সেকাল এক জীর্ণমূল বনস্পতির মত। বিস্তীর্ণ শাখায় শাখায় ঘন পত্রপল্লবে পল্লবে ছায়া বিস্তার ক'রে সে বিরাজিত ছিল। তার সর্ব অঙ্গে জীর্ণতা—বহু বজ্রপাতে বহু কোটরের সৃষ্টি হয়েছে, বহু শাখা ভেঙে গেছে, ভগ্ন শাখার চিহ্নগুলি

মহাযোদ্ধার অঙ্গের ক্ষতচিহ্নের মত সম্ভ্রম জাগাত। তার তলায় চলেছে সাধুর সাধনা, পথিক পেয়েছে বিশ্রাম, রাখাল গিয়েছে নিদ্রা, সরীসৃপ তার কোটরে গর্জন করেছে, মাথায় শকুন বসেছে, ডালে শুক বাসা বেঁধেছে, রাত্রের অন্ধকারে ব্যাভিচার চলেছে। তার তলায় ডাকাতেরা, চোরেরা, ঠ্যাঙাড়েরা এসে মজলিস করেছে, মন্ত্রণা করেছে, লুঠের মাল ভাগ করেছে। তার ডালে দড়ি বেঁধে গলায় জড়িয়ে কেউ আত্মহত্যা করেছে। কোন অমাবস্যার রাত্রে তারই তলে শবাসনে ব'সে তান্ত্রিক তপস্যা করেছেন। আর জীর্ণমূল বনস্পতি ঝড়ের অপেক্ষা করেছে আকাশের দিগন্তের দিকে চেয়ে। কখন আসবে ঝড়? ভেঙে পড়বে সে, তার আত্মা সেই ঝড়ে উড়ে মহাকালের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মাটির তলায় নূতন কালের বীজ তখন ফেটেছে, অঙ্কুর উঠছে। ওই বনস্পতিরই ঝরে পড়া বীজের অঙ্কুর, তারই গোড়ায় সে জন্মাচ্ছে। ঝড়ে চারিদিক বিপর্যস্ত হবে, বর্ষণে মাটি নরম হবে, অতীত কালের বনস্পতি ধরাশায়ী হয়ে আকাশপথ করবে উন্মুক্ত, সেই পথে নূতন কালের অঙ্কুরের আলোক-সাধনা হবে সুরু। কখন আসবে ঝড়?

মানুষও তখন বলতে সুরু করেছে—এর শেষ কর! আর সয় না।

কবে আসবে নূতন দিন?

এল ঝড়। এল নূতন কাল। এল আমার কালের নূতন কাল।

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন।

বাঙালীর জীবনে—ভারতবর্ষের জীবনে সে একটি মহামহিমময় দিন। এমন দিন জাতির জীবনে, দেশের ইতিহাসে বহু শত বৎসরে একবার আসে।

সূর্যোদয় হয় নিত্য; পাখীরা কলরব করে, ফুল ফোটে, কীটপতঙ্গেরা পাখা মেলে ভেসে পড়ে; গুঞ্জনধ্বনি তোলে, মানুষ জেগে ওঠে—তাদের বাঁধাধরা কাজ-কর্মের বোঝা কাঁধে নিয়ে যাত্রা সুরু করে। বর্তমানকে বহন ক'রে নিয়ে চলে প্রত্যাশাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে; কালকে নিয়ে চলে কালান্তরের সন্ধিক্ষণের পানে। চলে—চলে—চলে। দিনের পর দিন চ'লে যায়, এক পুরুষের বোঝা অপর পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা অন্তিম নিশ্বাসের সঙ্গে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যায় এই ব'লে যে, 'পুরুষান্তর হ'ল, তবু সেই সন্ধিক্ষণ এল না; বহুকামনার কালান্তর হ'ল না।' কামনা ক'রে যায়, 'যেন তার পরবর্তী পুরুষের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ আসে।'

১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন সেই সন্ধিক্ষণ এল, ঘোষণা ক'রে বললে—আমি এলাম।

সেই তিরিশে আশ্বিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দিন দেশ যে জেগে উঠল—সে জেগে ওঠার তুলনা নাই। সেদিন পাখীরা যেন কলরব ক'রে গেয়ে উঠল—

"ভেঙেছে তুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।"

ফুলেরা ফুটল, তাদের বর্ণে গন্ধে বাণী ফুটে উঠল—

"তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়।"

কীট-পতঙ্গের পক্ষগুঞ্জনে উঠল তারই প্রতিধ্বনি। মানুষেরা জেগে উঠল, সূর্যপ্রণাম ক'রে বললে—

"হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।...
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।"

মহাকবির কাব্যকে আশ্রয় না-ক'রে তার মহিমা প্রকাশ করা যায় না।

আমার জন্ম ১৮৯৮ সালের আগষ্ট মাসে। ১৯০৫ সালের অক্টোবরে আমার বয়স সাত বছর দু মাস। আমার চোখে সে-দিনের সে জাগরণের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ছে ভোর হতে-না-হতে গ্রামের তরুণ দলের সাড়া জেগে উঠল। এ ওকে ডাকছে, ও তাকে ডাকছে—

—নির্মল!

—কে? গোপাল?

—হ্যাঁ। উঠে আয়।

—আসছি।

—আয়। আমরা আর সবকে ডাকতে যাচ্ছি।

—ষষ্ঠী! ষষ্ঠী!

—ষষ্ঠী তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফোড়নকে ডাকতে গিয়েছে।

—গাবু! গাবু!

—যাচ্ছি।

—ধীরেন উঠেছে?

—উঠেছি। আমি ছোটকাকা একসঙ্গে যাচ্ছি।

—সুধীর! সুধীর!

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ীতে।

—রজনী! রজনী!

—সে কালীকিঙ্করের বাড়ী গেল সুধীরের সঙ্গে।

—কালীকিঙ্কর!

—যাচ্ছি আমরা।

ডাক চলেছে এপাড়া থেকে ওপাড়া। সেখান থেকে বাজারপাড়া। ওদিকে ইস্কুল-বোর্ডিং থেকে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ভেসে আসছে—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্!

আমার বাবা উঠতেন একটু দেরীতে। আগেই বলেছি তাঁর বৈঠকখানায় একটা বড় মজলিস বসত। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের অন্তত অর্ধেক প্রধানেরা এসে সমবেত হতেন। সে মজলিস চলত রাত্রি বারোটা পর্যন্ত। তারপর বাড়ী এসে মুখ হাত ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ইষ্টস্মরণ সেরে শুতে প্রায় একটা বাজত। কোন কোনদিন মজলিস ভাঙতে আরও দেরী হ'ত। কাজেই ভোরে

তিনি উঠতে পারতেন না। সেদিন কিন্তু ভোরবেলা উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ডায়েরীতে সে কথার উল্লেখ রয়েছে। আমার মনে আছে—তিনি আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। তিনি গল্প বড় একটা বলতেন না। সেদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন সুলতান মামুদের সোমনাথ-মন্দির ধ্বংসের গল্প। একটা কথা তার মধ্যে আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। বলেছিলেন—"সোমনাথ শিবলিঙ্গকে উপড়ে নিয়ে গেল সুলতান মামুদ। সোমনাথ আপত্তি করলেন না, রুদ্রমূর্তিতে জেগে উঠলেন না, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হিন্দুর অধঃপতন দেখে। দেবতা প্রসন্ন থাকেন, সাহায্য করেন, পরিত্রাণ করেন সাধুকে। সাধু কে? না, যিনি সৎ, যিনি পবিত্রাত্মা, তিনি। হিন্দু জাতি তখন অধঃপতিত, তাদের সততা নাই, অন্তরের পবিত্রতা নাই, তাই দেবতা তখন তার প্রতি বিমুখ। দেবাদিদেব বহুপূর্বেই ওই পাথরের গড়া লিঙ্গ-মূর্তির ভিতর থেকে চ'লে গিয়েছেন স্বস্থানে। মন্দিরের পাণ্ডারা, পূজকেরা ওই লিঙ্গমূর্তির নিচে একটা গহ্বর তৈরী ক'রে তাতে লুকিয়ে রাখত ধন সম্পদ—কোটী কোটী টাকা মূল্যের সোনা মণি মাণিক্য। দেবাদিদেব শিব পরম বৈরাগী, শ্মশানের ছাই তাঁর অঙ্গভূষণ, মড়ার হাড় তাঁর আভরণ, পশুচর্ম তাঁর বসন। সম্পদ সোনা রূপা হীরা মণি মাণিক্যের স্পর্শে তাঁর শরীরে যন্ত্রণা হয়। ঘর দোর তিনি তৈরী করেন না, তিনি ঘুরে বেড়ান শ্মশানে, বাস করেন হিমালয়শিখরে কৈলাসে। তিনি লোভী পূজক আর অধঃপতিত, অপবিত্র-আত্মা, মানুষের পূজা নেবেন কি ক'রে? তাই চ'লে গিয়েছিলেন। সেই কারণেই দেবতা-পরিত্যক্ত পুণ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুরা হ'ল পরাজিত। অনায়াসে সুলতান মামুদ জয় করলেন সোমনাথের মন্দির, ভেঙে ফেললেন পাথরের

শিবমূর্তি। পেলেন রাশি রাশি ধন। সেই ধনসম্পদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন শিবমূর্তি। হাহাকার উঠল দেশে—সমস্ত ভারতবর্ষে। অরক্ষিত হ'ল ভারতবর্ষ। তখন স্বপ্নাদেশ দিলেন পরমেশ্বর। স্বপ্নে বললেন—অধঃপতনের এ হ'ল প্রায়শ্চিত্ত। এ প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে, যে দিন সমস্ত জাতি অনুতপ্ত হয়ে আবার পুণ্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে, পুণ্য যেদিন সঞ্চিত হবে সেই দিন। এমনি পুণ্যবান যদি কেউ আমার বেদীতে বা ওই বিদেশে গিয়ে আমার ভগ্নমূর্তির উপর এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল আর একটি মাত্র বিল্বপত্র নিয়ে 'নমঃ শিবায়' ব'লে দিতে পারে—তবে সেই মুহূর্তে আমি আবার আবির্ভূত হব।" গল্পটি শেষ ক'রে বলেছিলেন, 'জান বাবা, আজ যে এই দিন—এ বোধ হয় সেই দিন। আজ বোধ হয় আমাদের চৈতন্যোদয় হ'ল। আজ বোধ হয় সুরু হ'ল পুণ্য সাধনার।' চোখ তাঁর ছলছল ক'রে উঠেছিল।

পুণ্য সাধনার যে সূত্রপাত হ'ল, এ যেন সে দিন চোখে দেখা গিয়েছিল। বেলা দশটা নাগাদ গ্রামের রাস্তায় বের হ'ল প্রকাণ্ড মিছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক ঘরের অল্পবয়সী ছেলেরা, বোর্ডিঙের ছেলেরা খোল করতাল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দলের পুরোভাগে ছিলেন কে কে—সকলকে স্মরণ করতে পারি না। তবে তিন জনকে মনে আছে। আমাদের গ্রামের শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়—গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত-দেহ গোপালবাবু আমার চোখে সেদিনের লাভপুরের নব অভ্যুদয়ের অগ্রদূত। সৃষ্টিকর্তা দুর্লভ মূলধন দিয়ে তাঁকে যেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মত রূপ, দুর্লভ সুকণ্ঠ, জন্মগত সঙ্গীতপ্রতিভা, তেমনি প্রতিভা ছিল সাহিত্যে; বুদ্ধি

ছিল শাণিত তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপার। তিনিই ছিলেন সেদিন গানের দলের অগ্রগায়ক অধিনায়ক। তাঁর পাশে আরও দুজন ছিলেন—একজন স্বর্গগত নির্মলশিববাবু, অপরজন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বর্গগত নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অল্পবিস্তর পরিচিত। বিশেষ ক'রে তাঁর 'রাতকানা' প্রহসনটি বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের প্রহসন বিভাগে স্থায়ী আসন পেয়েছে। তিনি আমাদের গ্রামের আকাশের নবোদিত ভাস্করতুল্য—নবীন ধনী স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর ছোট ছেলে। ইতিমধ্যেই ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিরা যাদবলালবাবুকে করস্পর্শ দিয়ে সম্মানিত করেছে, নিজের সামনে চেয়ার দিয়ে বসবার অধিকার দিয়েছে, কানে কানে ভাবীকালে খেতাবের কথাও বলেছে। বলেছে, তোমরাই হ'লে আইন ও ন্যায়াধিকারে প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। তুমি দেখবে যাদবলালবাবু, এখানে যেন ওই সব বাজে হুজুগ—That Suren Banerjee's wretched Bandemataram movement, কাপড় পোড়ানো, এ সব না হয়। কিন্তু নির্মলশিববাবু সে দিন ছিলেন তরুণ। সে দিন তিনিও সাড়া না-দিয়ে পারেন নি। তিনি ছিলেন পুরোভাগে, তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। আর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন—আমাদের নূতন হাই ইস্কুলের থার্ড মাস্টার। তেজস্বী দীপ্তিমান মানুষ। খড়্গের মত নাক, চোখ দুটি ছিল অদ্ভুত ছোট, কিন্তু তাতে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এবং সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল অকুতোভয়তা। আর ছিলেন তিনি সুবক্তা, সুবক্তা বললেও ঠিক বলা হ'ল না—তাঁর মধ্যে বাগ্মিতার বীজ ছিল।

আজ এই তিন জন সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটা কথাই তিন জন

সম্পর্কে মনে হচ্ছে। তিন জনেই জীবনে সার্থক হতে পারেন নি। গভীর বেদনা অনুভব করি তিন জন সম্পর্কে। মধ্যে মধ্যে ভাবি কেন পারলেন না? অথচ উপাদান ছিল প্রচুর।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর কারণ জানি। ধনসম্পদ এবং ইংরেজ সরকারের রাজপুরুষদের মোহে প'ড়ে তিনি তাঁর সাধনমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। সুখ তাঁকে নষ্ট করেছিল। তিনি যদি রায় বাহাদুর উপাধি না পেতেন, তবে শেষ জীবন এমন সকরুণভাবে নিষ্ফল ব্যর্থ হ'ত না। তাঁর জীবনে ছিল সুদুর্লভ একটি গুণ, বহু তপস্যা না ক'রে এ গুণ আয়ত্ত করা যায় না। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, সে জন্মায় জীবরূপ নিয়ে, তার স্বাভাবিক ধর্ম হ'ল ক্রোধ হিংসা লোভ। নির্মলশিববাবু জন্মেছিলেন যেন অক্রোধ নিয়ে। ওটি যেন ছিল তাঁর জন্মগত গুণ-সম্পদ। শেষ-বয়সে উপাধি এবং সম্পদ তাঁর দেবদুর্লভ গুণকেও বহুলাংশে নষ্ট করেছিল। বাইরের যাঁরা, তাঁরা হয়তো এর আঁচ পান নি। আর যারা লাভপুরের নিকটের মানুষ তারা এ আঁচ পেয়েছিল। আর ছিল প্রগাঢ় সাহিত্যানুরাগ, অভিনয়-প্রীতি ও প্রতিভা। এমন অভিনয়-প্রতিভা ও প্রীতি দুর্লভ। জীবনের প্রথমাংশে এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যকারের সাধক। তাঁর সাধনার ফল গোটা গ্রামকে ধন্য ও সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে সাধনাতেও তাঁর ছেদ টেনে দিলে ইংরেজ রাজসরকারের তুচ্ছ প্রসাদ প্রলোভন।

নিত্যগোপালবাবুকে নষ্ট করেছে, তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করেছে, ঠিক তার উল্টো দিকের আঘাত। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান; বাড়ীতে শাসন ছিল অতিমাত্রায় কঠোর, আঠারো-উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর কাকার হাতের বেত্রাঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

তবু হার মানেন নি। হার মানতে হ'ল নিষ্ঠুর অভাবের মধ্যে প'ড়ে। আদর্শানুরাগী তরুণ, কন্যাদায়গ্রস্ত শিক্ষককে তাঁর অন্তিমশয্যায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবেন। শিক্ষক তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। গোপালবাবু গোপনে শিক্ষক-কন্যাকে বিবাহ ক'রে প্রতিশ্রুতি রাখলেন। কিন্তু বিবাহের সন্ধ্যাতেই কথাটা প্রকাশ পেয়ে গেল। বেত্রপাণি খুল্লতাত লোক নিয়ে ছুটে গেলেন, বিবাহ বন্ধ করবেন। কিন্তু তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বর্জিত হলেন সংসার থেকে গোপালবাবু। বয়স তখন ১৯।২০, আরম্ভ হ'ল দুঃখের পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। আশ্রয় নাই, অন্নসংগ্রহের সাধ্য নাই; কি করবেন? ওই অবস্থাতেই অগ্রসর হতে না-পেরে তাঁকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হ'ল, তারও বেশী—নিতে হ'ল তাঁকে পুলিশের চাকরি। জীবনাদর্শের সব শেষ হয়ে গেল। নইলে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন আমাদের গ্রামে বিবেকানন্দের ভাবধারাকে বহন ক'রে। সাহিত্য-সাধনার একটি ধারাকে শঙ্খ বাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এবং নির্মলশিববাবু, তাঁরাই এ ক্ষেত্রে ছিলেন যুগ্ম ভগীরথ। সব চেয়ে বড় ছিল তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। এমন সতেজ এবং সুডৌল মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর বোধ হয় আমার জীবনে আমি শুনি নি। সে সুরমাধুর্য আজও কানে লেগে রয়েছে। শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টকং, রবীন্দ্রনাথের 'কে হে মম মন্দিরে' এ গান দুখানি ছেলেবেলায় শুনেছি, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

থাক্ সে সব কথা।

মিছিলের কথা বলি।

সেদিন মিছিল চলল করতাল বাজিয়ে, দেশের বন্দনা গান গেয়ে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে এসে উপনীত হ'ল আমাদের গ্রামের মহাপীঠে। সেখানে স্নান করলেন সকলে।

'ভাই-ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই' ব'লে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

'বাংলার মাটি বাংলার জল' মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে হলুদ রঙের রাখী বাঁধলেন পরস্পরের হাতে। শপথ নিলেন—এ শপথ সকলে নিলেন নিজের কাছে নিজে। শপথ নিলেন—'সকল দুর্বলতাকে করব পরিহার, আত্মনিয়োগ করব পুণ্যের তপস্যায়। সকল কালিমাকে করব মার্জনা, করব ধৌত, করব মুক্ত। অন্তরকে করব শুভ্র, করব নির্মল সুপরিচ্ছন্ন সুপবিত্র।'

আশ্চর্যের কথা, তরুণেরা যারা ইতিমধ্যেই জমিদার ও তান্ত্রিক-প্রধান গ্রাম্য-সমাজের প্রভাবে মদ্যপান সুরু করেছিল, কলকাতা-ফেরত যারা কলকাতার ফ্যাশন ও বিলাসলালসায় মদ্যপান সুরু করেছিল—দুই দলই শপথ করলে, ছাড়ব।

এরা বললে—মদ খাব না।

ওরা বললে—Drink করব না।

এরা খেত—দেশী মদ।

ওরা খেত—হুইস্কী।

সত্যিই সে দিন এল নবযুগ। নূতন সূর্যোদয়। জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব যেন প্রত্যক্ষ দেখেছিলাম।

আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন আমার মা।

আমার বড় মামা তখন লাভপুরে ছিলেন। তাঁরও থাকা উচিত ছিল মিছিলের পুরোভাগে। কিন্তু তিনি তা থাকেন নি। ছিলেন

পিছনে। তাঁর সঙ্গে তখন বিপ্লবী দলের ক্ষীণ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। মুরারীপুকুর বাগানের বোমারু দলের সঙ্গে পাটনার কিছু লোক সংস্রবে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি মিছিল থেকে ফিরে মায়ের হাতে রাখী বাঁধলেন। মা একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিলেন।

মনে আছে আমার। স্পষ্ট মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে—গোপালবাবু কবিতা রচনা ক'রে হাতে লিখে নাটমন্দিরের দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। শুনলাম ওটা নাকি রাজদ্রোহমূলক কবিতা। বয়স তখন আমার সাত পূর্ণ হয়েছে। রাজদ্রোহ কাকে বলে ঠিক বুঝি না। তবে কবিতাটিতে যে একটি ঝাঁজ ছিল, সে অনুভব করবার মত আমার মনের স্পর্শশক্তি তখন হয়েছে। সে কবিতাটির একটা লাইন আজও মনে আছে। ভাবটা গোটাই মনে রয়েছে। কবি বলছেন মহাশক্তিকে—মা, তুমি জাগো···মা, তুমি জাগো। যে লাইনটি মনে আছে, সেটি হচ্ছে এই—

"দেবাসুর-সংগ্রামের এই তো সময়!"

মনে হয়েছিল···অসুর ওই ইংরাজেরা। স্পষ্ট মনে আছে।

১১

কয়েক বৎসর আগে হ'লে ও-লাইনের অর্থ হ'ত অন্যরূপ বুঝতাম, অসুর মানে তারাই যারা সোমনাথ ভেঙেছে, বেণীমাধবের ধ্বজা ভেঙে মসজিদ তুলেছে, যারা বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভেঙেছে; কিন্তু উনিশ শো পাঁচ সাল নূতন কাল নিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আনলে নূতন ব্যাখ্যা নূতন ব্যঞ্জনা। এ ছাড়াও অনেক কিছু নিয়ে এল।

বিচিত্র আবির্ভাব! কেমন ভাবে সে যে এল তা ব'লেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। গাজনে মহাকালের পূজা হয়, ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে ভক্তবৃন্দ উচ্চকণ্ঠে কালাধিপতি মহাকালের নাম ঘোষণা ক'রে বলে, বলো—শিবো কালরুদ্র। নূতন বৎসর আসে, সে নিয়ে আসে নূতন জীবন। এও ঠিক তেমনি। বন্দেমাতরম্!

উনিশ শো পাঁচ সালের পর নূতন জীবন আত্মপ্রকাশ করল।

আগে বলেছি, এর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের গ্রামে ছিল পুরানো কালের মানুষদের অসহায় মনের ধর্মবিশ্বাস—অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। আর এক দিকে ছিল নূতন কালের ইংরাজী সভ্যতার ফেনা অর্থাৎ ফ্যাশন। নিছক ফ্যাশন। যাকে আমি তুলনা করি সেকালের প্রচলিত—O. H. M. S. Whiskyর সঙ্গে। ইংরেজ জাতির অধিপতির প্রতি আনুগত্য সঞ্চার করা এই ফ্যাশনের একটি স্বভাবধর্ম ছিল। সেই হিসাবে O. H. M. S, নামটি সার্থক।

হঠাৎ Whisky পরিণত হ'ল সঞ্জীবনী রসে।

নেশার উত্তেজনায় কৃত্রিম জীবনোচ্ছ্বাস নয়, এ যেন স্বতোৎসারিত ভোগবতী ধারার আত্মপ্রকাশ। চোখের সামনে সে দেখা দিল আমাদের বীরভূমের বৈশাখের তৃণহীন গৈরিক প্রান্তরের বুকে—নববর্ষণে শ্যামলাভায় জেগে-ওঠা তৃণাঙ্কুর প্রকাশের মত। বিস্ময় লাগে। প্রশ্ন জাগে, লালমাটির রুক্ষ রসহীন বুকের মধ্যে এই পৃথিবী-দগ্ধ-করা রৌদ্র সহ্য ক'রে এই তৃণবীজগুলি বেঁচে ছিল কেমন ক'রে? মনে মনে যেন অনুভব করতে পারি—জীবন অবিনশ্বর। সেদিনও মনে হয়েছিল জীবনমহিমা—মানবসাধনা অবিনশ্বর।

শুধু তৃণাঙ্কুরই জাগল না, কিছুদিনের মধ্যেই ফুল ধরল ঘাসগুলির ডগায়। উনিশ শো পাঁচ সালেই 'বন্দেমাতরম্' নাম ললাটে ধারণ ক'রে জেগে উঠল দুটি প্রতিষ্ঠান। আরও একটি প্রতিষ্ঠান জাগল, যার নামে বন্দেমাতরম্ না থাকলেও বন্দেমাতরমের প্রত্যক্ষ প্রাণধর্ম ছিল সেই প্রতিষ্ঠানটিতেই।

'বন্দেমাতরম্ থিয়েটার'। থিয়েটার শব্দটিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করবার মত মনোভাব তখনও হয় নি। আর হ'ল 'বন্দেমাতরম্' লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা।

আর প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'দরিদ্র সেবা ভাণ্ডার'। এর প্রতিষ্ঠাতা নিত্যগোপালবাবু, তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় শৈবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলালবাবুদের প্রতিষ্ঠায় প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারবংশের সন্তান।

বন্দেমাতরম্ থিয়েটার, বন্দেমাতরম্ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী ছিলেন স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু। তার সঙ্গে ছিলেন নিত্যগোপালবাবু, দ্বিজেনবাবু। থিয়েটারের মধ্যে ছিলেন আর একজন। তিনি ছিলেন আমাদের গ্রামের জামাতা, গৃহজামাতা—

স্বর্গীয় শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। শশাঙ্কবাবুর প্রাণ ছিল এই থিয়েটার। আরও একজন ছিলেন প্রথম দিকে, তাঁর নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন গৃহ-জামাতা। শশাঙ্ক-বাবুর কথা একটি গল্পে আমি বলেছি, 'চন্দ্র জামাইয়ের জীবন-কথা'য়। শেষের দিকটা কল্পনা। অবশ্য পুরো কল্পনা নয়, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর আকর্ষণ তখন জেগেছিল। আমাকে গোপনে বলেছিলেন—আর বয়স নাই তারাশঙ্কর! সাহস পাই না। ভরসা হয় না।

থাক্ সে সব কথা। থিয়েটারের কথা বলি। থিয়েটার আমাদের গ্রাম্য সমাজে অনেক রস পরিবেশন করেছে। ভালয় মন্দতে অনেক দিয়েছে। নূতন যুগের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় আমাদের এই নাট্য-আন্দোলন যতখানি করিয়ে দিয়েছে, ততখানি আর কিছুতে হয় নি।

নির্মলশিববাবু, নিত্যগোপালবাবু আগেই সাহিত্যের অমৃতরসের সন্ধান পেয়েছেন। সাহিত্যরস-পিপাসার সঙ্গে এই নাট্য-আন্দোলনের সমন্বয় ঘটল। তাঁরা নাটক লিখেছেন—অভিনয় হয়েছে। হয়তো নাট্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না-হ'লেও তাঁরা সাহিত্য-চর্চা করতেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়া গ্রামে যুবক সম্প্রদায় ছিল, তারাই অনেকখানি রক্ষা পেল নাট্য-আন্দোলনের প্রভাবে। কয়েক জনের কথা বলি। নির্মলশিববাবুদের সমবয়সী বন্ধু ছিলেন ছুজন—একজন ষষ্ঠী, অপর জন সীতাংশু, ডাকনাম ফোড়ন। ষষ্ঠী ফোড়ন তখনও পড়ে। পড়ে নামমাত্র। অধঃপতনের সকল আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ষষ্ঠী টেরি কাটে—ডাইনে বাঁয়ে ছু দিকে সামনের চুল কপালের উপর গুটিয়ে গোল হয়ে উঠে থাকে, লম্বা ফুলে-

ফেঁপে থাকে, ষষ্ঠী তারই মধ্যে গুঁজে রাখে আস্ত তিনটি চারটি সিগারেট। এবং সেই নিয়েই ইস্কুলে যায়। বাড়ী ফেরে। বাড়ীতে গ্রাজুয়েট প্রাইভেট মাস্টার রেখেছিলেন বাপ। মাস্টার বই খুলে ব'সে থাকেন, ষষ্ঠী বাঁয়া তবলা নিয়ে সঙ্গীতচর্চা করে। ফোড়ন সঙ্গে থাকে। এমনি ফোড়ন এবং ষষ্ঠী অনেক তখন। এরাঃ স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হ'ত উনবিংশ শতাব্দীর বিকৃত তান্ত্রিক কি শৈব কি বৈষ্ণবে। কিন্তু এই নাট্য-আন্দোলন এদের নূতন কালের ভাবের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলে।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়ছে। তার নাম ছিল ত্নকড়ি চক্রবর্তী। বর্ণ-ব্রাহ্মণের ছেলে, সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, তার উপর গিয়েছে দৃষ্টিশক্তি, প্রায় অন্ধ বললেই হয়। দিনের আলোয় মানুষকে দেখে সে আবছা আবছা। রাস্তার ধারে বাড়ী--দাওয়ার উপরটিতে ব'সে থাকে রাস্তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে। মানুষ যায় আসে--সে দেখে কিছু যেন নড়ছে, কিছু যেন চলছে। হঠাৎ কোন পরিচিত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর কানে এলে মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে ডাকে—কে মরিরাম? শোন—শোন।

মরিরামের দৃষ্টি আছে, কাজ আছে, সে চ'লে যায়—ত্নকড়ির মুখের আলো নিভে যায়।

ত্নকড়ি বাঁচল থিয়েটারে যোগ দিয়ে। সুন্দর চেহারা ছিল, অভিনয় করবার শক্তিও ছিল। আর একটা শক্তি ছিল, দৃষ্টিশক্তি ছিল না কিন্তু কানে শুনে সে পার্ট্‌ মুখস্থ ক'রে ফেলত অল্প সময়ের মধ্যে।

শশাঙ্কবাবু এসে ডাকতেন—দোকন?

—জামাইবাবু!

এস।

শশাঙ্কবাবু হাত ধ'রে তাকে নিয়ে যেতেন, দোকন যেত— মহলার মজলিসে বসত। রাত্রে শশাঙ্কবাবুই তাকে পৌঁছে দিতেন। দোকন সকাল থেকে দাওয়ায় ব'সে পার্ট আওড়াত আপন মনেই। ক্রমে সে পেলে অভিনয়ে প্রতিষ্ঠা। তখন তার সঙ্গীর অভাব হ'ত না। বেকার যুবকেরা তার কাছে ব'সে আড্ডা জমাত। তার সুপারিশ নিয়ে তারাও ঢুকবে থিয়েটারে। তা ছাড়া লাইব্রেরী থেকে দোকন নাটক আনত। ওরাই তাকে প'ড়ে শোনাত। দোকন সুর ক'রে বক্তৃতা ক'রে যেত—

"উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিল নর্মদা
ভীষণা রাক্ষসী-মুখে তুলিয়া হুঙ্কার—
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী!"

অদ্ভুত ছিল তার স্মৃতিশক্তি। যে ভূমিকায় সে একবার অভিনয় করেছে সে ভূমিকার অংশ কোনদিন ভোলে নি। উলুপী নাটকে সে গঙ্গার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, সে ছবি আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে।

নাট্য-আন্দোলন আর একটি সুমহৎ কাজ করেছিল। গ্রামের সকল স্তরের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অতি মধুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। সেকালের গ্রাম্য সমাজ, গ্রামটি জমিদার-প্রধান, জমিদারেরা সকলেই ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকাল ধ'রে ব্রাহ্মণ সমাজের যুবকেরা অপর সকল স্তরের যুবকদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেন। চলায় ফেরায়, ওঠায় বসায় অহেতুক অশোভন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলতেন। এক দাওয়ায় এক বিছানায় বসতেন না, এমন কি কোন সাধারণ কর্মে গ্রামের তরফ থেকে সম্প্রদায়নির্বিশেষে

কোথাও যেতে হ'লে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পথ চলতেন। মেলায় যাত্রা-কীর্তনের আসরে বাবুদের ছেলেরা বসত যেখানে, সেখান থেকে খানিকটা স'রে বসতেন অন্য সম্প্রদায়ের যুবকেরা। নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে—সেই বিসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়ে গেল। নাট্যসম্প্রদায়ের মহলার আসরে সকলেই বসতেন এক ঘরে এক বিছানায়, সরস হাস্যপরিহাসে সকলেই যোগ দিতেন, সকলেই হাসতেন সমান প্রাণ খুলে, সমান উচ্চ কণ্ঠে। শুধু তাই নয়—এই সর্বস্তরের যুবকদের এমনি অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফলে—জীবনে, আচার-আচরণে ও ব্যবহারের মধ্যে দেখা দিল উদ্ধত আভিজাত্যের পরিবর্তে উদার মাধুর্য, সস্নেহ আত্মীয়তা; অন্য দিকে সভয় সঙ্কোচ এবং গোপন হিংসার পরিবর্তে অসঙ্কোচ প্রসন্নতা, শ্রদ্ধান্বিত গুণমুগ্ধতা।

এর জন্য সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য ছুটি লোকের। প্রথম, এ যজ্ঞের যাঁকে যজ্ঞেশ্বর বলা যায়—তিনি, স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে—তাঁর ধাতুর মধ্যে ছিল অপরূপ মাধুর্য। প্রথম যৌবনে মানুষকে কাছে টানবার, মানুষকে স্বীকার করবার, মানুষকে মানুষ ব'লে বুকে গ্রহণ করবার এই সহজাত মাধুর্য এবং ঔদার্যের তুলনা সংসারে বিরল—অতি বিরল। দ্বিতীয় জন—ওই শশাঙ্কবাবু, হাত ধ'রে এদের নিয়ে আসতেন, নির্মলশিব-বাবু পরমস্নেহে গ্রহণ করতেন সকলকে। শশাঙ্কবাবু ছিলেন ঘরজামাই। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর খাঁটি ঘরজামাই। যাঁরা চিরকাল বসবাসের সংসারেও জামাই সেজে থাকতেন, এক মুহূর্ত ভুলতেন না জামাইয়ের মর্যাদা—তিনি তাঁদের একজন। আমাদের

গ্রামে তিনিই বোধ হয় শেষ খাঁটি ঘরজামাই। ভোরবেলা উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে দস্তুরমত বেশভূষা ক'রে নীচে নামতেন, সামান্য জলযোগ ক'রে ছড়ি, থিয়েটারের বই এবং পার্টলেখার কাগজপত্র বগলে নিয়ে বের হতেন। এসে বসতেন—দোকনের দাওয়ায় অথবা গোপাল স্বর্ণকারের দাওয়ায়। তারা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা ক'রে মোড়া বা চৌকি পেতে দিত। তামাক সেজে হুঁকাটি হাতে দিত। তিনি তামাক খেতেন, পার্ট লিখতেন, আর খোঁজ নিতেন—পাড়ার কোন্ কোন্ তরুণের থিয়েটারে যোগ দেবার অভিপ্রায় আছে, যোগ্যতা আছে। তাদের ডাকতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, নিমন্ত্রণ করতেন মহলার আসরে যাবার জন্য। সন্ধ্যার ঠিক আগে এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতেন, এস, আমার সঙ্গে এস। তিনি জানতেন যে, সঙ্গে না-নিয়ে গেলে ইচ্ছা সত্ত্বেও ওরা যেতে পারবে না। গিয়েও হয়তো দরজার মুখ থেকে ফিরে আসবে। সঙ্গে নিয়ে হাসিমুখে শশাঙ্কবাবু আসরে ঢুকে বলতেন, একে নিয়ে এলাম। বেশ ছেলে—ভাল ছেলে।

নির্মলবাবু সহজাত মিষ্ট হাসি হেসে বলতেন, ব'স ব'স। তুমি তো—এর ছেলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এত দূরে—এমন ভাবে এক পাশে স'রে বসলে কেন ? ভাল ক'রে উঠে ব'স। গান গাইতে জান ?

—আজ্ঞে না।

—বাজাতে ?

এবার চুপ ক'রে থাকত সে।

—বাজাতে পার তা হ'লে। কই, তবলাটা বাঁধ দেখি !

এগিয়ে দিতেন তবলাটা।

মজলিস চলত। গানে বাজনায়, সরস সর্বজনীনতার মহিমায়, উদার রসিকতায়, প্রসন্ন হাস্যের মধ্যে কেমন ভাবে যে সে একদিনেই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠত, সে কথা কেউই বুঝতে পারত না।

মজলিস শেষে শশাঙ্কবাবু জ্বালতেন তাঁর হ্যারিকেন লণ্ঠনটি। একেবারে আসল ডিট্জ লণ্ঠন। তেমনি ঝকঝকে, ঠিক যেন নতুনটি। কাচটি তেমনি পরিষ্কার। সপ্তাহে কাচটি একদিন ক'রে চুন মাখিয়ে সাফ করতেন। তেমনি আধখানা চাঁদের মত ক'রে কাটা পলতেটি। আলোটি জ্বেলে বলতেন, এস।

ডাকতেন তিনি—দোকনকে, হরি স্বর্ণকারকে, পঞ্চানন সাহাকে, ক্ষুদিরাম সাহাকে। প্রত্যেককে পৌঁছে দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন।

এর মধ্যেও কিন্তু শশাঙ্কবাবু ছিলেন—বিশ্বামিত্র। দুরন্ত ছিল তাঁর ক্রোধ। সে ক্রোধ হ'ত তাঁর অভিনয়ের সময়ে বা অভিনয়ের পথে ত্রুটিতে কি বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হ'লে। সুরেন গড়াঞীকে দেওয়া হয়েছিল একটি পরিচারকের ভূমিকা। রাজবাড়ীর পরিচারক। রাজবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, নিরুপায় অসহায় বৃদ্ধ রাজার পরিত্রাণের কোন পথ নেই। রাজা ডাকছেন—ওরে, কে আছিস—আমার জপের মালা। ওরে—মালা আন্, আমার জপের মালা। ওরে কে আছিস—

শশাঙ্কবাবু তিন মাস প্রত্যহ সুরেনকে তালিম দিয়েছেন—মালাগাছি হাতে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে—রাজাকে প্রথম প্রণাম করবে, তারপর মালাগাছি রাজার হাতে দেবে, তারপর আবার একটি প্রণাম ক'রে চ'লে আসবে। সুরেন প্রতিদিন মহলার সময় ঠিক ঠিক

নির্দেশ পালন ক'রে এসেছে। অভিনয়ের দিন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে সুরেন, শশাঙ্কবাবু মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা ডাকছেন। ঠিক সময়টিতে মালা সুরেনের হাতে দিয়ে—রেসের ঘোড়াকে জকির ইঙ্গিতের মত ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সুরেন প্রবেশ করলে রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে দর্শকভরা আসরের দিকে তাকিয়ে তার কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সে প্রণাম করলে, তারপর মালাখানি রাজার হাতে না দিয়ে নিজের গলায় পরলে, তারপর আবার প্রণামটি ক'রে ফিরে এল। এক গা ঘেমে সে তখন যেন নেয়ে উঠেছে। ওদিকে দর্শকের আসরে হাসির অট্টরোল উঠেছে তখন। শশাঙ্কবাবুর মনে হচ্ছে, সমস্ত অভিনয়ের উপর বজ্রাঘাত হয়ে গেল। মাথায় তাঁর আগুন জ্ব'লে গেল। সুরেন উইংসের ফাঁক থেকে পা বের করবামাত্র তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

সুরেন জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল সেইখানে।

শশাঙ্কবাবুর দৃক্‌পাত নেই, তিনি তার গলা থেকে মালাখানি খুলে নিয়ে নিজেই গিয়ে দিয়ে এলেন রাজার হাতে।

দোকনদের দল বলত, বাপরে—জামাইবাবু সাক্ষাৎ বাঘ!

আবার বলত, এমন মানুষ আর হয় না।

সুরেনও বলত।

পরের দিনই শশাঙ্কবাবু নিজে গিয়েছিলেন সুরেনের বাড়ী।

—সুরেন! সুরেন!

—কে?

—আমি হে। শশাঙ্কবাবু। জামাইবাবু। শোন। বাইরে এস।

—আজ্ঞে জামাইবাবু।

—কাল মেরেছি। বড় লেগেছিল তোমার। তোমার—

'তোমার কাছে মাফ চাইতে এসেছি' বলতে পারেন না। মুখে বাধে। কিন্তু সুরেন বুঝে নেয়। সে পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—আজ্ঞে না। লাগে নাই বেশী।

—আজ যেন ঠিক সময়ে যেও। ঠিক আটটায় প্লে আরম্ভ হবে।

—যাব আজ্ঞে।

অভিনয়ের ত্রুটির জন্য শুধু যে সুরেন গড়াঞীরাই মার খেয়েছে শশাঙ্কবাবুর হাতে তা নয়। রথী-মহারথীরাও মার খেয়েছে, তিরস্কৃত হয়েছে স্বয়ং নির্মলশিববাবুও একবার চড় খেয়েছিলেন। নির্মলশিব ছিলেন অক্রোধ। চড় খেয়ে হেসে বলেছিলেন, বড় জোর হয়ে গেছে হে শশাঙ্ক

নির্মলশিববাবু পার্ট মুখস্থ করেন নি। নিজে ছিলেন নাট্যকার, পার্ট আটকায় নি, তিনি নিজেই গ'ড়ে ব'লে চালিয়ে এসেছিলেন।

আর একবার নির্মলশিববাবু রঙ্গমঞ্চে হেসে ফেলেছিলেন। তার জন্যও শাস্তি দিয়েছিলেন শশাঙ্কবাবু। পরবর্তী অভিনয়ে তাঁকে সামান্য দূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আর একবার, ইন্দুবাবু নামে একজন বিদেশী ভদ্রলোক অভিনয় করবেন। অভিনয়ও হচ্ছে বিদেশে। লাভপুর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে—সুপ্রাচীন জমিদার-প্রধান গ্রাম এড়োয়ালীতে। কাঁদীর কাছাকাছি। রেল-ষ্টেশন থেকে পনের মাইল পথ। গরুর গাড়ী ছাড়া যান নাই। অভিনয়ের দিন সকালবেলা ইন্দুবাবুর আসার কথা। কিন্তু গাড়ী ফিরে এল, ইন্দুবাবু এলেন না। সমস্ত দিন শশাঙ্কবাবু গ্রামের বাইরে পথের ধারে একটা গাছতলায় ব'সে

রইলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, ইন্দুবাবু এলেন না। ওদিকে ডুপ্লিকেটের ব্যবস্থা হচ্ছে। অভিনয় স্থুরু হবে। হঠাৎ ইন্দুবাবু এসে হাজির হলেন অশ্বপৃষ্ঠে। মুখে রঙ, হাতে একগাছা মালা। ভদ্রলোক ধানবাদের ওদিকে কোথায় অভিনয় করছিলেন গত রাত্রে। অভিনয় শেষ হতে বিলম্ব হওয়ায় যে ট্রেন ধরবার, সে ট্রেন ফেল করেছিলেন; পরের ট্রেনে এসে অপরাহ্ণে নেমেছেন। গরুর গাড়িতে মাইল পাঁচেক এসে এক মিঞাসাহেবের কাছে অনেক কাকুতি ক'রে ভাড়া দিয়ে অশ্বটি সংগ্রহ ক'রে এসে পৌছেছেন। শশাঙ্কবাবু চপেটাঘাতের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু বিবরণ শুনে ক্ষান্ত হন।

ইন্দুবাবুর কথায় নাট্য-আন্দোলনের আর একটি মহৎ কল্যাণের কথা মনে পড়ছে। সেটি হ'ল আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরের যুবক সম্প্রদায়ের যোগাযোগ। এত বিদেশী ব্যক্তি, গণ্যমান্য রসিক জনের সঙ্গে আমাদের গ্রামের যোগাযোগ হয়েছিল যে, সে কথা স্মরণ ক'রে আজও বিস্মিত হই।

কামদাবাবু, ইন্দুবাবু, ললিতবাবু, প্রফুল্লবাবু, হরিশবাবু, সোমনাথবাবু, ফণিবাবু, আরও কত জন—তুলসীবাবু, প্রমথ, বলাই।

পেশদার রঙ্গমঞ্চের রাধাচরণ ভটচায দীর্ঘদিন লাভপুরে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প, স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করতেন, মেয়েদেরও এত ভাল মানাত না নারী-ভূমিকায়। তেমনি ছিল সুকণ্ঠ।

ক্ষুদিরাম মালাকার। সে বোধ হয় পঁচিশ বৎসর অভিনয় করেছে লাভপুরে। আর্ট থিয়েটারের আমলে—তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ মিত্র এঁরাও একবার লাভপুরে গিয়ে 'কর্ণার্জুন' নাটকে পরশুরাম ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের ভূমিকায় স্বেচ্ছায় অভিনয় ক'রে এসেছেন।

আর যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ওখানে থাকতেন। নাটক লিখতেন। যেতেন স্বর্গীয় নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মন্মথমোহন বসু মহাশয় গিয়েছেন। রসরাজ স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু গিয়েছেন। তিনিই আমাদের নবপর্যায় নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করেছিলেন।

আমি বাল্যকালে এঁদের দূরে থেকে দেখতাম।

প্রথম যৌবনে ধন্য হয়েছি এঁদের কাছে এসে।

মনের আবেগে কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে—একসঙ্গে অনেক কালের কথা ব'লে ফেলেছি। উনিশ শো পাঁচ সালে—আমাদের প্রথম রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হ'ল। আজও মনে পড়ছে। কি অপরূপ মায়ারাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'ল সেদিন। দৃশ্যপট—উজ্জ্বল আলো! অভিনয়ে নূতন সুর—নূতন ছন্দ! আমার শিশু নয়নের নিদ্রা কোথায় গেল কে জানে, আমি বিনিদ্র হয়ে ব'সে অভিনয় দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র আর বিল্বমঙ্গল অভিনয় হ'ল প্রথম।

হরিশ্চন্দ্র ও বিল্বমঙ্গলবেশী নির্মলশিববাবুকে মনে পড়ছে। পাগলিনীবেশী নিত্যগোপালবাবুকে মনে পড়ছে। বিশ্বমিত্রবেশী শাশাঙ্কবাবুকে মনে পড়ছে। চণ্ডালবেশী আমার মামাকে মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে—চিন্তামণি ও শৈব্যা-বেশী এক কলকাতার কিশোরকে। তার নাম ছিল শিবচন্দ্র। আরও একজন এসেছিল, তার নাম জ্যোতির্ময়। সেও এসেছিল কলকাতা থেকে।

এর পরই হ'ল পাকা স্টেজ। নূতন ড্রপসিন আঁকানো হ'ল। মধ্যস্থলে ভারতমাতা, দুই পাশে—এক দিকে হিন্দু, অপর দিকে মুসলমান; ভারতমাতা দুজনের হাত ধ'রে মিলিয়ে দিচ্ছেন। উপরে

লাল অক্ষরে লেখা বন্দেমাতরম্ থিয়েটার। ছবির নিচে লেখা--
'হিন্দু মুসলমান একই মায়ের দুই সন্তান'।

এসব নিয়ে এল ওই নূতন কাল।

*　　　　*　　　　*

এই যে এল নূতন কাল, সে অবশ্য এল আপন বেগে; কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত এল। যা কিছু আবর্জনা, যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পথে দিলে বাধা, তাদের উড়িয়ে ভেঙে ফেলে ঢেলে দিলে বর্ষণ; আবর্জনার পুঞ্জ মাটির সঙ্গে মিশে পচল, উর্বর ক'রে তুলল দেশকে, নূতন সৃষ্টি-সমারোহে চঞ্চল হয়ে উঠল চারিদিক। ঋতুর পর অন্য ঋতুর মত কাল হতে কালান্তর আপনিই আসে কিন্তু বসন্তশেষে গ্রীষ্মাবির্ভাবের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তিতে আমরা করি গাজন। বৈশাখে বিষ্ণুদেবতার চন্দনযাত্রার অনুষ্ঠান ক'রে সচেতন ভাবে কাল হতে কালান্তরে মহাকালের পদচিহ্নে আলপনা এঁকে আমরা করি তার অর্চনা। অনেক সময় ঋতু অথবা কাল পরিবর্তনের জন্য সাধকেরা সাধনা করে থাকেন। ভারতবর্ষেও তাই হয়েছিল। সে মহাযজ্ঞের প্রথম সমিধসংগ্রহ এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলন হয়েছিল বাংলা দেশেই। ইতিহাসে সে কথা লেখা হবে।

আমাদের গ্রামে সে যজ্ঞাগ্নির আলোর আভাস এল, তার উত্তাপও আমরা অনুভব করলাম। উচ্চারিত মন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার মনের তানে কম্পন তুললে।

এর জন্যও আয়োজনের প্রয়োজন হয়, সাধনার প্রয়োজন হয়। সে সাধনা আমাদের গ্রামে যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মনে পড়ছে।

স্বর্গীয় যাদবলালবাবুর কথা আগেই বলেছি। তিনিই গ্রামে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বালিকা

বিদ্যালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন তাঁকে কীর্তির নেশায় পেয়ে বসেছে। শ্মশানভূমির মত একটা পরিত্যক্ত প্রান্তর তাঁর কীর্তিমালায় হেসে উঠেছে। তিনিই আমাদের গ্রামের সেই সাধক। মানুষও অকৃতজ্ঞ নয়, আজও লাভপুর বলতে আমরা যাদববাবুর লাভপুরকেই বুঝি। তাঁর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে পরবর্তী কালে গ্রামের সমস্ত লোকের বিরোধ বেধেছে। আসল বিরোধ সেই প্রতিষ্ঠার বিরোধ, সে বিরোধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু তবুও কেউ স্বর্গীয় যাদবলালবাবুকে ভুলে যায় নি, তাঁর স্মৃতির প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নি। যাদবলালবাবুর কীর্তি লাভপুরে অবিস্মরণীয়, তিনিই লাভপুরে নবযুগ-যজ্ঞ-প্রজ্বলনের সমিধ সংগ্রহ করেছিলেন, বেদী রচনা করেছিলেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছিলেন। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, নীলচক্ষু, হাস্যপ্রসন্ন মুখ, মিষ্ট কথা ; এ মানুষকে লক্ষের মধ্যে চেনা যায়। আমরা ছেলেবেলায় আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে খেলা করতাম, তিনি তাঁর ভিতরবাড়ী থেকে তাঁর ঠাকুরবাড়ী, কাছারীবাড়ীতে যেতেন ওই চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে ; প্রতিটি ছেলের সঙ্গে কথা ব'লে যেতেন। তিনি আমার কাছে অবিস্মরণীয়। তিনি লাভপুরে আবির্ভূত না-হ'লে, এই বর্তমান রচনা কোনদিনই রচিত হ'ত না। আমি লিখতেই হয়তো শিখতাম না। লাভপুর অন্তত বিশ ত্রিশ বৎসর পিছিয়ে থাকত।

তাঁর সঙ্গে আর একজন এসেছিলেন লাভপুরের সৌভাগ্যক্রমে। তিনি স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবলাল-বাবু তাঁর মেসোমশায় হতেন। দরিদ্রের সন্তান, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা দেখে যাদবলালবাবুই তাঁকে পড়তে সাহায্য করেছিলেন ; এম. এ. পাস ক'রে আগ্রা কলেজে অধ্যাপনা করতেন ; যাদবলাল-

বাবুর কীর্তি স্থাপনের প্রারম্ভেই তিনি লাভপুরে এলেন। নূতন কালের শিক্ষায় প্রদীপ্তদৃষ্টি শক্তিশালী মানুষ, নিষ্ঠাবান সাধক, জীবনে বিপুল আশা ও উৎসাহ। তিনি প্রাণপাত পরিশ্রমে যাদবলাল-বাবুর সকল কীর্তিকে সার্থক ও পূর্ণ ক'রে তুললেন। পরবর্তী কালে সমগ্র বীরভূম তাঁর কর্মে কল্যাণ পেয়েছে। তাঁর সে কর্মের সূত্রপাত লাভপুরে। তিনি বিবাহও করেছিলেন লাভপুরে।

আজও স্মরণ করতে পারি, তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমার বুকের ভিতরটা যেন গুরু গুরু শব্দে ধ্বনি তুলত। যখনই কালপরিবর্তনের কথা স্মরণ করি, তখনই আমার কল্পনানেত্রে আমি দেখতে পাই, লাভপুরের পশ্চিমদিকে গেরুয়া রঙের প্রান্তরে বেদী বাঁধা হয়েছে, সমিধ সংগৃহীত হয়েছে, নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। স্বর্গীয় যাদবলাল-বাবু স্নান ক'রে পট্টবস্ত্র প'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যজমান; যজ্ঞস্থলে বেদীর উপর উত্তরসাধকের বেশে স্থান গ্রহণ করেছেন অবিনাশবাবু। অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্করবাবুরা দল বেঁধে; ওঁদের পিছনে আমিও দাঁড়িয়ে আছি। স্বয়ং কাল পুরোহিত।

যজ্ঞ প্রজ্বলিত হ'ল। ঘৃতগন্ধে আকাশ বাতাস ভ'রে উঠল। মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। সব পাল্টে যেতে সুরু হ'ল। দ্রুত পাল্টে যেতে সুরু হ'ল সব।

১২

আমার শৈশবকালের পটভূমিতে দেশের দ্রুত পরিবর্তন, সমাজের পটভূমিতে গ্রামের দ্রুত পরিবর্তনের উপরেও আমাদের পারিবারিক জীবনে এল এক মর্মান্তিক পরিবর্তন। আমার বয়স তখন আট বছর। সে কথা বলবার আগে আমার ছেলেবেলার নিজের কথা কিছু ব'লে নেব। আমার মনে যে ঘটনাগুলি ছবি হয়ে রয়েছে সেইগুলির কথা। যে যে শৈশব-সাথীদের চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই তাদের কথা। আগে বলব ঘটনার কথা।

আমার জীবনে প্রথমে সঙ্গী আসে নি, বন্ধু আসে নি, এসেছিল সঙ্গিনী, বান্ধবী। তার কথা আগে বলেছি। চারু আমার সম্পর্কে ভাই-ঝি, আমার থেকে বছর দেড়েক বড়। আমাদের বাড়ীতে কোন শিশু ছিল না, আমাদের সঙ্গে এক দেওয়ালে-বাড়ী আমার জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতেও কোন শিশু ছিল না। আমাদের বাড়ীর দৌহিত্র-বংশের কন্যা চারুই ছিল আমাদের নিকটতম বাড়ীতে আমার একমাত্র সমবয়সী। তার মা—আমার বউদিদি আমার মার চেয়ে বয়সে ছিলেন অনেক বড়। তবুও সেকালের প্রথা অনুযায়ী—বয়সে ছোট শাশুড়ীকে প্রণাম করতেন, ভক্তি করতেন। সে ভক্তি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তার কারণ অবশ্য আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব এবং শক্তি। তাঁর কাছে আপনি মাথা নুয়ে পড়ত। তাঁরা সবাই ছিলেন আমার মায়ের গল্পের আসরের শ্রোতা।

চারু আমাকে পৃথিবীর অনেক কিছু চিনিয়েছে। বাড়ীর আশপাশ থেকে গাছ তুলে এনে সিমেণ্ট-বাঁধানো উঠানে বাগান

করতাম, চারু আমায় গাছের নাম বলত। আমের আঁটি থেকে ভেঁপু তৈরী হয় এ কথা সেই আমাকে বলেছিল। কাগজের নৌকা করতে সেই আমাকে শিখিয়েছিল। পুতুল খেলতে শিখিয়েছিল।

চারু আমার অত্যাচার সহ্য করেছে অনেক। মেয়ে ব'লেই বোধ হয় বয়সে বড় এবং দৈহিক শক্তি বেশী থাকা সত্ত্বেও সে আমার প্রহার সহ্যই করত, কখনও আমার গায়ে হাত তোলে নি। একবার তার উপর চরম অত্যাচার করেছিলাম। এর আগে দেওঘর যাওয়ার কথা বলেছি। চারুর মাও পুত্রসন্তান কামনায় আমাদের সঙ্গে দেওঘর গিয়েছিলেন, সঙ্গে চারুও গিয়েছিল। চারুর কাকা—আমার আশুদাদা—তিনি সঙ্গে গিয়েছিলেন—তাঁর ছিল অম্লশূলের ব্যাধি। আশুদাদার স্ত্রী তাঁর জন্য ধর্না দিয়েছিলেন। আশুদাদা আমার প্রথম শিক্ষক। দেওঘরে হ'ল হাতেখড়ি; সেইখানেই তিনি সুরু করলেন আমাকে পড়ানো। আশুদাদা ছিলেন ছোটখাটো মানুষটি, মুখে ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী। সাধারণ লোকের কাছে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিতে তিনি বড় সুন্দর মানুষ। ছোটখাটো মানুষ আশুদাদার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। আমার বাবা আমাদের অঞ্চলে ব্যক্তিত্বের জন্য, গম্ভীর প্রকৃতির জন্য খ্যাতনামা ছিলেন। আজও তাঁর নাম আমাদের গ্রামের আজকালকার প্রবীণেরা ক'রে থাকেন। আমার বাবার চেয়ে আশুদাদা বয়সে বড় থাকলেও সম্পর্কে ছিলেন ভাইপো, প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অনেক ছোট। কিন্তু আশুদাদা বাবাকে অনেক সময় তিরস্কার করতেন। বিশেষ করে জমিদার বংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমা করার ক্ষেত্রে বলতেন—কেন? মামলা কেন? যদি আপোষে কথা বললে মিটে যায়, তবে মামলা কেন? আরও তিরস্কার করতেন যখন মধ্যে মধ্যে

বাড়ীতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর দল এসে অতিথি হ'ত। বাবা হাসিমুখে সহ্য করতেন। আমার যত ভালবাসা ছিল এই মানুষটির উপর, তত ভয় ছিল। এই আশুদাদাও গিয়েছিলেন দেওঘরে। পাণ্ডাদের মহল্লায় বেশ একটা বড় বাড়ীতে বাসা হয়েছিল। কয়েকখানা ঘর প'ড়ে ছিল—তার মধ্যে একটাতে ছিল বোলতার চাক। একটা দ্বিপ্রহরে চারুর সঙ্গে সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে দুজনে বোলতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিলাম। ছোট ছোট ঢেলা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলাম পূর্ব থেকেই। ঢেলা ছুঁড়তে শুরু করলাম। ঢেলা লাগে না। তখন চারুই বললে—একটা লম্বা কিছু নিয়ে খোঁচা দিলে কি হয়?

কি যে হয় তা চারু কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপলব্ধি করলে। লম্বা একটা কিছু—বোধহয় ঘর ঝাড়বার জন্য একটা বাখারি-জাতীয় কিছু—বাড়ীওয়ালারা বাড়ীতেই রাখত—সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিলাম। বোলতারা ভোঁ-ভোঁ ক'রে উড়ল—উড়ে তেড়ে এল। আমি বুঝে নিলাম কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ-দৌড়—পিছনে অনুসরণ করছে বোলতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজাটা দিলাম টেনে। চারু চীৎকার করতে লাগল ঘরের মধ্যে। মর্মান্তিক আর্তনাদ! আর্তনাদ শুনে ওদিক থেকে আশুদাদা চীৎকার ক'রে শাসন করলেন চারুকে, আমি আর দরজা খুলতে সময় পেলাম না, পালিয়ে এসে ঢুকলাম বাবার বিছানায়। চারু বোলতার কামড়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছিল। তবু সে আমার উপর রাগ করে নি। তবে চারুটা ছিল বুদ্ধিহীন, আশুদাদা বলতেন—মাথামোটা। দুর্ভাগিনী চারু আজও বেঁচে আছে। ভাইদের সংসারে নিঃসন্তান চারু, জীবনের ভার বহন ক'রে চলেছে। দুর্দান্ত মুখরা মেয়ে। আমি যখন দেশে যাই, তখন সর্বাগ্রে দেখা হয় চারুর সঙ্গে। চারুর

ভাইয়েরা গ্রামের ভিতর থেকে স'রে এসে স্টেশনের ধারে বাড়ী করেছে। আগে থেকে খবর জানা থাকলে চারু পথের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। নইলে আমার সাড়ায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ছানিপড়া চোখের মোটা কাচের চশমা আমার মুখের উপর তুলে আমায় দেখে বলে, এলেন ? ওরে বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে! এক যুগ পরে ? ব'লে সেই পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে।

আমি বলি—ভাল আছিস তুই ?

—ভাল ? ভাল কি ক'রে থাকব, বেঁচে রয়েছি যে! চারু হাসে।

চারুর পরে এল বন্ধুরা। প্রথম বন্ধু কে তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, দুজন প্রায় এক সঙ্গেই এসেছিল। একজন লক্ষ্মীনারায়ণ—অন্য জন প্রতুলকৃষ্ণ। ডাকনাম—নারাণ আর খোকা। শান্তশীল আর অশান্তশীল। একজন যত শান্ত, যত মধুর প্রকৃতি, অপরজন তত অশান্ত তত বিচিত্র-দুষ্টবুদ্ধি। নারায়ণ স্বর্গীয় নির্মলশিববাবুর মেজ বোনের ছেলে, যাদবলালবাবুর দৌহিত্র, তার মা গ্রামের মেয়ে, আমার মায়ের সমবয়সী, কিছু ছোট, সখী। তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে এলেন। নারাণের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল এক মুহূর্তে। আমার ছিল বিখ্যাত কার্তিক-গড়িয়ে মতিলাল মিস্ত্রীর হাতের তৈরী দুটি কার্তিক ঠাকুর। একই হাতের তৈরী, কিন্তু একটি ছিল খারাপ। খুব তাড়াতাড়ি গড়া ব'লেই এমন হয়েছিল। মতি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে গড়েছিল। আমিই দুটির নামকরণ করেছিলাম—বাবু-কার্তিক, আর পেয়াদা-কার্তিক। আমি ছিলাম দুই কার্তিকেরই মালিক, সুতরাং আমি অনুগ্রহ ক'রে নিত্যই নারাণকে দিতাম পেয়াদা-কার্তিক। কোন কোনদিন জেদ ধরত, আজ বাবু-কার্তিক

নেবেই সে। আমি তখন বলতাম—তবে আমি খেলবই না। তারপর জানলার গরাদ ধ'রে জানালায় উঠে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হাত পুরে বাইরে আনতাম আর আকাশে উড়িয়ে দিতাম কাল্পনিক পায়রা।

—এই—গিরে মদা—হুস ধা!

গিরে মদা, অর্থাৎ গিরি নামক কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কেনা মদ্দাটা।

—এই তিলে মাদী—হুস—ধা!

অর্থাৎ তিলের মত অজস্র কালো বিন্দু আছে গায়ে যে মাদী পায়রাটার—সেইটা।

এ সব নাম এবং এই পায়রা ওড়ানোর ভঙ্গি শিখেছিলাম আশুদাদার ভাইপো ষষ্ঠীর কাছে। যে ষষ্ঠী নির্মলশিববাবুর সমবয়সী, থিয়েটার-প্রসঙ্গে যার নাম এর আগে করেছি—তার কাছে।

নারাণ অবশেষে পেয়াদা-কার্তিক নিয়েই খেলতে রাজী হ'ত। এর পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধারা পাল্টাল। নারাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হ'ল না: বোধ হয় তখন আট-দশ বছর বয়স, তখন থেকে একটা নূতন খেলা খেলতে শুরু করেছিলাম আমরা দুজনে। রামায়ণ খেলা। খেলাটা আমার আবিষ্কার। তখন রামায়ণ পড়েছি, তিন-চারবার তো নিশ্চয়। রামায়ণের কাহিনী কণ্ঠস্থ। এমন কি বানর সেনাপতিদের সুগ্রীব-অঙ্গদ-নল-নীল-গয়-গবাক্ষ ক'রে সমস্ত নাম—মহাবীর হনুমান তো বটেই, ওদিকে রাক্ষস সেনাপতি খর, দূষণ, ভস্মলোচন, অতিকায়, তরণীসেন—সব নাম মুখস্থ। আমাদের দেশে গেরুয়া রঙের খোয়াইয়ের মধ্যে অজস্র বিচিত্র আকারের বিচিত্র বর্ণের—লাল নীল সবুজ

মুড়ি ছড়ানো। সেই নুড়ি কুড়িয়ে আনতাম পকেট এবং আঁচল ভর্তি ক'রে। তার থেকে রঙ এবং আকার মিলিয়ে কোনটিকে করতাম রাম, কোনটিকে লক্ষ্মণ, কোনটি হনুমান, কোনটি রাবণ, কোনটি কুম্ভকর্ণ, কোনটি অতিকায়, কোনটি মেঘনাদ। বারান্দায় খড়ি দিয়ে সেতুবন্ধ থেকে স্বর্ণলঙ্কা এঁকে দুই দিকে প্রস্তর বাহিনী সাজিয়ে—রামলীলা হ'ত। তালশিরের কাঠিতে সুতো বেঁধে হত ধনুক এবং কুঁচিকাটি ভেঙে করতাম তীর। সীতাহরণ থেকে সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত এই খেলা চলত। বলা বাহুল্য, আমিই বেশীর ভাগ নিতাম রামপক্ষ, নারাণকে নিতে হ'ত রাবণপক্ষ। তাই নিত নারাণ। নারাণের চরিত্রের মধ্যে ছিল নির্মলশিববাবুর ওই মহৎ গুণের প্রতিফলন—অক্রোধগুণ। আরও গুণ তার ছিল—সে ছিল সত্যকারের সমাজ-কর্মী। প্রথম যৌবনে - চরকা খদ্দর নিয়ে সংগঠনে সত্যকারের শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ওই এক পথে, যে পথে নির্মলশিববাবু হয়েছেন সাধন-ভ্রষ্ট, সেই পথে নারাণও হ'ল সাধন-ভ্রষ্ট। সে কথা থাক্। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ পনের বছর বয়সে—আবার খেললাম নূতন খেলা। তখন আমরা দুই দলের দুই নেতা। আমরা যুদ্ধ করলাম। ওই যুদ্ধের খানিকটা ছাপ আছে 'ধাত্রী দেবতার' প্রথমে।

তারপর বয়স বাড়ল। বন্ধুত্ব বিচিত্রভাবে পরিণত হ'ল সম্পর্কে। সে হ'ল আমার ভগ্নীপতি—আমি হলাম তার ভগ্নীপতি। কিন্তু দুজনের জীবনপথ ধীরে ধীরে সরতে শুরু করছে তখন। বলতে ভুলেছি সাহিত্যচর্চা, তাও শুরু করেছিলাম দুজনে একসঙ্গে। নিত্যগোপালবাবুর কবিতা লেখা দেখে আমরাও কবিতা রচনা করলাম—

শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকদের আনন্দ বাড়িল।

আর এরই মধ্যে এল প্রতুলকৃষ্ণ—খোকা।

চারুর জ্ঞাতি-ভাই খোকা। নিত্যগোপালবাবুর আপন খুড়তুত ভাই। আমরা ইস্কুলে এক ক্লাসে ভর্তি হলাম। খোকা, আমি আর শিবকৃষ্ণ—তিনজন ছাত্র ক্লাসে। খোকা প্রথমবার হ'ল ফার্স্ট, হয়ে ডবল প্রমোশন নিলে। আমি সেকেণ্ড, ক্লাস প্রমোশন পেলাম। শিবকৃষ্ণ থার্ড, ফেল হ'ল। কিছুদিন পর খোকাকে একদা দেখলাম, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে আমাদের ঠাকুর-বাড়িতে ঘুরছে। আমাকে ডাকলে। আমি গেলাম। অনেক কথা হ'ল। সে সমস্তই হ'ল কেমন ক'রে নির্মলশিববাবু-নিত্যগোপালবাবুর মত ফ্যাশনেবল হওয়া যায়। খোকা বললে—ওরা দাড়ি কামায়। ওরা ছ আনা দশ আনা চুল কাটে। তাই এমন সুন্দর দেখায়। সে বের করলে একটা কাঁচি, এবং প্রস্তাব করলে সে আমার চুল কাটবে—আমায় কামিয়ে দেবে, আমি করব তার ক্ষৌরকর্ম। সে প্রথমেই আমার মাথার পিছনে চালালে কাঁচি। তারপর বললে, ঠিক হয়েছে। এইবার দাড়ি। কিন্তু দাড়ি তো নেই, কি কামাবে? অথচ না কামালে চলবে না। অতএব ভুরুর উপর চালালে কাঁচি। তারপর আমি ধরলাম কাঁচি। কয়েক মুহূর্ত পরে যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে তাকে ছেড়ে দিলাম।

মা পিসীমা মুখ দেখে অবাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন।

খোকার কথা অনেক।

১৩

খোকার কথা অনেক।

আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়; হিলহিলে লম্বা। কথায় কথায় ফিক্-ফিক্ ক'রে হাসত। দারুণ দুঃখেও তার সে হাসি বন্ধ হ'ত না। মায়ের একমাত্র সন্তান। প্রকাণ্ড একটি পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। খোকার বাপ-খুড়োরা ছয় ভাই। সে আমলের নিয়ম অনুযায়ী খোকার মা-খুড়ি-জেঠীদের আসল নাম কেউ জানে না। বউরা বাড়ীতে পদার্পণ করবামাত্র নামকরণ হ'ত—মতি-বউ, যুঁই-বউ, বেলি-বউ, শরৎ-বউ, মানিক-বউ, রাণী-বউ, সৌরভ-বউ ইত্যাদি। বউদের নামের মধ্যে মূল্য এবং সৌন্দর্য দুই বোধেরই পরিচয় চোখে পড়বে। সমাদর যেখানে বেশী সেখানে মানিক-বউ নাম পেতেন বউ-মানিক, রাণী-বউ হতেন বউ-রাণী। খোকার মায়ের নাম ছিল—যুঁই-বউ, লোকে ডাকত যুহি-বউ বলে। অতি শান্ত সরল মিষ্ট প্রকৃতির ছোটখাটো মানুষ ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কাঁচা সোনার মত। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সে বৈধব্যের আঘাত যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড; ছোট দেওরের বিবাহে গেল তাঁর বড় ছেলে, খোকার দাদা অতুল, আর ফিরল না, কলেরায় মারা গেল। সেখান থেকে ফিরেই তিন দিন কি চার দিনের দিন মারা গেলেন স্বামী। কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়ীর আনন্দ আয়োজনের আসরে যুহি-বউদি একসঙ্গে হারালেন স্বামী পুত্র। যুহি-বউদি মারা গেছেন গত বৎসর ১৩৫৬ সালে। খোকার উপর তাঁর প্রত্যাশা কতখানি ছিল তা বুঝতে

পারি নি, কখনও কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে দেখি নি। খোকা কলকাতাতেই থাকে। আমি কলকাতা থেকে গেলে বউদির সঙ্গে দেখা হ'ত; কিন্তু কখনও প্রশ্ন করেন নি—খোকার সঙ্গে দেখা-টেখা হয় নি ভাই? এর একটা কারণ আমার মনে হয়, এই সংসারটির সে আমলের অস্বাভাবিক অতি কঠোর ব্যবস্থার ফল। এরই জন্যে খোকা জীবনে হয়েছে অকৃতকার্য—ব্যর্থ। নিত্যগোপালবাবুর নাম পূর্বে করেছি—তিনি এই বাড়ীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, ভগবানের অজস্র প্রসাদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দুর্লভ রূপ, দুর্লভ মধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি; বলেছি তো অজস্র প্রসাদ। সংসারের এই কঠোর ব্যবস্থার ফল তাঁর জীবনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। অন্তঃপুরে খোকার কুণ্ডলিনী পিসিমা ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী, বাইরে কর্তা ছিলেন ওঁদের সেজকাকা। একজন জ্বলন্ত চুল্লী, অপরজন উত্তপ্ত কটাহ। ষোল-সতের বয়স যখন নিত্যগোপালবাবুর—যখন তিনি এণ্ট্রাস পরীক্ষা দেবেন তখনও বেত্রাঘাতে তাঁর পিঠ জর্জরিত ক'রে দিয়েছেন সেজকাকা। তাঁর প্রচণ্ড শাসনের অন্তরালে ছিল—এমন উচ্চাশা, যা মানুষকে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়। সম্ভবত, সম্ভবত কেন—নিশ্চয়ই, তার উগ্র উচ্চাশা ছিল এই যে, তাঁদের বাড়ির ছেলেরা প্রত্যেকেই হবে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, মাইনের পর থেকে এণ্ট্রাস, এফ-এ, বি-এ, এম-এতে বৃত্তি পাবে, প্রথম হবে, পরিশেষে হবে ম্যাজিস্টেট অথবা জজ। এই গ্রামের অপর যে সকল পরিবারের মাথা তাঁদের পরিবারের মাথা থেকে উঁচু হয়ে আছে, সেগুলিকে অবনত ক'রে দেবে। তাঁর সকল শাসন ছিল—গ্রাম্য ঈর্ষা-বিদ্বেষের উত্তাপে উত্তপ্ত। সে আমল; দৃষ্টি একমাত্র আবদ্ধ ছিল সরকারী চাকরির প্রতি। নইলে

নিত্যগোপালবাবুর প্রতিভার বিকাশে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারত। থাক্‌। খোকার কথা বলি। খোকারও ছিল মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং তার বুদ্ধিও ছিল তীক্ষ্ণ; সে আর কিছু পারুক না পারুক, পরীক্ষা পাস ক'রে বি. এ ডিগ্রী নিয়ে কোন বড় অপিসের হেডক্লার্কও হতে পারত। কিন্তু সেজকাকার শুভ কামনার উগ্রতা সে সহ্য করতে পারলে না। ক্লাসে সে ফার্স্ট হতেই সেজকাকা হেড মাস্টারকে ধ'রে তাকে ডবল প্রমোশন দেওয়ালেন। খোকা পড়ত আমার সঙ্গে, আমাকে পিছনে ফেলে উপর চ'লে গেল—সেজকাকার উগ্র উচ্চাশা সেদিন পরিতৃপ্ত হয়েছিল সাময়িক ভাবে। তারপর অন্তরালে যা ঘ'টে গেল—সে দেখবার দৃষ্টিও তাঁর ছিল না, অবকাশও ছিল না। বেচারা শিশু হাঁটুজলে সাঁতারে পারঙ্গমতা দেখিয়েছে ব'লে তাকে অগাধ জলে ঠেলে দিয়ে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন—মধ্যসমুদ্র থেকে তুলে আনুক সহস্রদল পদ্মটি, যার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন কমলালয়া লক্ষ্মী। প্রথম ভাগ পড়ে (সত্য-সত্যই প্রথম ভাগ, পাঠ্য-বইয়ের নাম ছিল শিশুপাঠ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগকে সংক্ষিপ্ত ক'রে সে এক বিচিত্র বই) ফার্স্ট হয়েছে ব'লে খোকাকে ঠেলে উঁচুতে তুলে দ্বিতীয় ভাগ বাদ দিয়ে—তার সামনে প্রায় ধ'রে দেওয়া হ'ল চারুপাঠ। খোকা বেচারা—চারুপাঠে ভীমভীষণ ঝঞ্ঝাতাড়িত 'উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ অর্ণববক্ষে' প'ড়ে গিয়ে ডুবে গেল অর্ণবতলে, অথবা উত্তাল তরঙ্গমালায় তাড়িত হয়ে ঊষর বালুবেলায় নিক্ষিপ্ত হ'ল; যে বেলাভূমে—মুক্তা তো দূরের কথা, ঝিনুক শামুকের একটা কুচি পর্যন্তও নাই। পালাতে লাগল খোকা। বাড়ীতে পড়তে ব'সে পালাতে লাগল, স্কুলে ক্লাস থেকে পালাতে লাগল, মিথ্যা কথা বলতে শিখলে বাধ্য হয়ে, ছেলে-

মানুষ অপটু ভাবে মিথ্যে বলত। প্রথম প্রথম পালাবার স্থান আবিষ্কার করলে—'পেম্‌না' নামক এক গন্ধবণিকনন্দন বন্ধুর বাড়িতে। ব'সে থাকত, তামাক খেত। ক্রমে সে স্থানের সন্ধান জানাজানি হতেই যত্র-তত্র ধাবমান হ'ল।

অনেক দিন পরের একটা ঘটনার কথা বলছি। তখন আমার ফার্স্ট ক্লাস। খোকা তখনও ফোর্থ ক্লাসে। সেই বোধ হয় স্কুলে শেষ বৎসর খোকার। আমার ক্লাস থেকে বেরিয়ে আমি লাইব্রেরীর দিকে যাচ্ছি; বড় হলের মধ্য দিয়ে পথ; হলে দুটো ক্লাস বসে পাশাপাশি—ফোর্থ ক্লাস আর থার্ড ক্লাস। ফোর্থ ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন আমাদের সেকেণ্ড মাষ্টারমশাই ননীবাবু, তিনি আমায় দেখেই হঠাৎ বললেন—এই হয়েছে! শোন তো তারাশঙ্কর।

দেখলাম খোকা দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। বইয়ের আড়াল দিয়ে অবশ্য। সেকেণ্ড মাস্টার বললেন, শ্রীমান প্রতুলকৃষ্ণের বাড়ি তো তোমাদের পাশেই। এক খিড়কির ঘাটেই তো আচরণ তোমাদের। বলতে পার—শ্রীমান প্রতুলের মা নাকি কাল খিড়কির ঘাটে পা পিছলে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?

কি বলব ভেবে পেলাম না। এমন কোন সংবাদও শুনি নি, তার উপর আজই তাঁকে বকতে শুনেছি। খোকাকেই বকছিলেন।

আমি বিব্রত হলাম, কিন্তু খোকা হেসেই চলল সমানে।

মাস্টার মশাই বললেন, অতঃপর আজ তোমাদের বাউরীপাড়ায় একটা নাকি দাঙ্গা হয়ে গেছে?

দাঙ্গা হয়েছে কি না জানি না, তবে বাউরীপাড়ায় ঝগড়া তো লেগেই থাকে, আজ সকালেও গোলমাল একটা শুনেছি। হঠাৎ প্রতুল ব'লে উঠল, এই ডাক্তারবাবুকে শুধান না স্যার! বাঁকা বাউরী আর

নন্দ বাউরীর শালার মধ্যে ঝগড়ায় লাঠালাঠিতে নন্দর মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গিয়েছে কি না? বলুন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু স্কুলে কোন প্রয়োজনে এসে হলে মাত্র প্রবেশ করেছেন। হেসে ডাক্তারবাবু বললেন, দু ফাঁক ঠিক নয় তবে কেটে খানিকটা গিয়েছে। খোকাই নিয়ে এসেছিল তাকে ডাক্তারখানায়। কিন্তু সে কথা এখানে? কি ব্যাপার?

মাস্টার বললেন, আমি পরশু শ্রীমান প্রতুলকে আলটিমেটাম দিয়েছি যে, বেতন নিয়মিত দিলেই যে তুমি এই ক্লাসের বেঞ্চিতে বসতে পাবে, 'তা পাবে না। হয় পড়াশুনা কর, নয় স্কুল ছাড়। পাকা উচ্ছেদের নোটিশ। কি প্রতুল, বল কথা ঠিক কি না?

খোকার নাকের নীচের অংশটা খোলা বইটায় ঢাকা, উপরের অংশটা দেখা যাচ্ছিল, সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ, কথা ঠিক।

খোলা বইয়ের আড়ালের অন্ধকারে ঠোঁটের উপর মুচকি হাসি ঘন ঘন খেলে যাচ্ছিল, সে সত্য অন্ধকার ঘরে শব্দ তুলে ছোট্ট ইঁদুরের ছুটে বেড়ানোর মত শব্দের ইঙ্গিতেই আত্মপ্রকাশ করছিল। খোকার মুখের আড়াল দেওয়া বইয়ের ভিতর থেকে শব্দ উঠছিল খুক্-খুক্-খুক্।

মাস্টার মশায় বললেন, কিন্তু কাল পড়া জিজ্ঞাসা করতেই, ঠিক এমনি ভাবে বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়াল এবং কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বললে—কাল খিড়কির ঘাটে প'ড়ে গিয়ে ওর মা সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন—শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, তাঁর সেবা করতে গিয়ে পড়া করবার অবকাশ পায় নি। মাতৃভক্তি, মাতৃসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার কি ক'রে করি? কাল সন্তুষ্ট মনে মার্জনাই করেছিলাম। আজ জিজ্ঞাসা করলাম পড়া, আজও ঠিক কালকের অবস্থা—ওই দেখুন না,

বইয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ বলছে—বাউরীপাড়ায় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছিল কোন এক বাউরী-বধূ নিয়ে; দুই বীরপুঙ্গবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, সে যুদ্ধ থেকে কেউ তাদের নিবৃত্ত করতে পারে নি—অগত্যা ওকেই যেতে হয়েছিল রণাঙ্গনে। যুধ্যমান দুই বীরের উদ্যত মহাস্ত্রের মধ্যস্থলে উপবীতধারী দেবতার মত দাঁড়িয়ে ওকে বলতে হয়েছে—ক্ষান্ত হও। নতুবা ভস্ম ক'রে দেব। তবে তারা ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়, বিচার করতে হয়েছে—ওই কন্যাটি কার প্রাপ্য—

খোকা বললে, তারপর নন্দার শালার মাথা ফেটেছিল, তাকে—

ডাক্তার বললে, হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে এনেছিল। একটু টিংচার আইডিন দিয়ে বেঁধে দিলাম।

মাস্টার মশায় বললেন, তবে আজও তোমার মার্জনা। জনসেবার পুরস্কার দিতে না পারি, তিরস্কার করব কি ক'রে? ব'স প্রতুলচন্দ্র।

যাক, আগে তার গোড়ার কথা বলি।

প্রতুল ডবল প্রমোশন নিয়ে—পরের বারে ফেল হ'ল পরীক্ষায়। প্রতুলের সেজকাকা যত চটলেন প্রতুলের উপর, তত চটলেন পরীক্ষকদের উপর। তিনি রেগে ইস্কুলে গেলেন এবং রাগারাগি ক'রে প্রতুলকে প্রমোশন দেওয়ালেন, এবং আমাদের বাড়িতে আমার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু তখন তার শিশুমন অরণ্যবহ্নির উত্তাপে আতঙ্কিত কুরঙ্গশিশুর মত পলায়নপর। জীবনে সে আতঙ্ক ব্যাধির মত পেয়ে বসেছে। সে একমাত্র পথ আবিষ্কার করেছে—পলায়ন। সে পালাতে চায়,

ছুটে পালায়, ,জ্ঞানরাজ্য সমাদর ক'রে ডাকলেও সে কর্ণপাত করে না। নিত্য সন্ধ্যায় সে পড়তে .আসত। আমার গৃহশিক্ষক ব্রজেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় দুর্বলদেহ মানুষ ছিলেন। তার উপর ছিল তাঁর নিতান্ত অল্পবয়স। অতি সৎপ্রকৃতির আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন, স্কুলে পড়াতেন কঠিন পরিশ্রম ক'রে। পড়ানোর সূচীর মধ্যে তাঁর কাজ ছিল—ড্রিল শেখানো। প্রায় দু ঘণ্টা—দুটো থেকে চারটে—নিজে ড্রিল ক'রে দেখিয়ে ড্রিল শেখাতেন। স্কুল থেকে ফিরতেন একেবারে ক্লান্ত হয়ে। সন্ধ্যায় পড়াতে ব'সে পড়াগুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়তেন। যেমন তাঁর নাক ডাকা শুরু হ'ত, অমনি খোকা পড়া বন্ধ করত। দু মিনিট—তিন মিনিট—পাঁচ মিনিট অন্তর পড়া বন্ধ করত, এক মিনিট দু মিনিট তিন মিনিট নীরব থাকত আবার সুরু করত—মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড, মনোহর ইক্ষুদণ্ড। তারপর হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরত; আমি মুখ তুলে চাইলেই ফিক্ ক'রে হেসে ফিসফিস ক'রে বলত—আমি চললাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করতাম আমি—কোথায়? বা কেন?

সে বলত, বাড়ী।

আমি পড়তে পড়তেই আঙুল দেখিয়ে দিতাম মাস্টারের দিকে।

সে বলত, ব'লো তার মা ডাকছিল।

খোকাদের বাড়ী এবং আমাদের বৈঠকখানা-বাড়ি সামনাসামনি, মাঝখানে হয়তো দশ ফুট চওড়া একটা গ্রাম্য রাস্তা। ওদের বাড়ীর কথাবার্তা আমাদের এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যেত। ওই কথা

ব'লেই খোকা বই বগলে নিয়ে অন্ধকার রাস্তায় আমাদের বৈঠকখানার উঁচু দাওয়া থেকে ঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়ত। সিঁড়ি বেয়ে নামবার বিলম্ব তার সইত না। মিনিট ছুয়েক পরেই শোনা যেত খোকার পিসীমার উচ্চ কণ্ঠের কথা—এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেল খোকা?

এর উত্তরে খোকা কি বলত শোনা যেত না। কিন্তু ওর পিসীমার কথা শোনা যেত—ভাত খেতে চ'লে গেল? এই তো সন্ধ্যে। এরই মধ্যে ভাত খেতে গেল?

এবার খোকার কথা শোনা যেত। সে এবার উচ্চ কণ্ঠেই জবাব দিত, না? গেল না? মাস্টার সন্ধ্যেবেলাতেই খেয়ে নেয়। ভূতের ভয় মাস্টারের। ওর নাম বু-বু মাস্টার, তা জান না না কি?

আমি হঠাৎ চমকে উঠতাম মাস্টার মশায়ের ডাকে—পড়্। তুই নিজে পড়্।

মাস্টার জেগে উঠেছেন ইতিমধ্যে। সম্ভবত খোকার পিসীমায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বরেই জেগে উঠতেন, এবং নিজের 'বু-বু মাস্টার' নাম শুনে লজ্জা পেতেন। তার প্রতিক্রিয়ায় ক্রুদ্ধ হতেন।

খোকার পিসীমা বলতেন, এই খানিকক্ষণ পড়ানোর জন্যে মাসে ছু-ছুটো টাকা? বলছি আমি সাতনকে। এ যে গালে চড় মেরে টাকা নেওয়া!

তিনি ব'কেই যেতেন।

এদিকে ক্রোধ মাস্টারের মনে খোঁচা-খাওয়া সাপের গর্তে ঘুরপাক খাওয়ার মত ঘুরপাক খেত।

এ লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়! ছাত্রকে না পড়িয়ে তিনি

ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়ে থাকেন? বু-বু মাস্টার নামের লজ্জাও লঘু হয়ে যেত।

অথচ এ নামটায় তাঁর ছিল অপরিসীম লজ্জা। আমাদের বাড়ির ঠাকুর তরুণ ক্ষুদিরাম নিষ্ঠুর কৌতুক ক'রে মাস্টারকে ভয় দেখিয়েছিল। ঠাকুর ক্ষুদিরাম মাস্টার মশায়ের চেয়েও অল্পবয়সী ছিল। মাস্টারের বয়স ছিল কুড়ি-বাইশ, ক্ষুদিরামের ছিল সতের-আঠারো। আমাদের বৈঠকখানা থেকে ভিতর-বাড়ি যেতে একটি দীর্ঘ গলিপথ অতিক্রম করতে হয়। দু পাশেই আমাদের নিজেদের লোকের বাড়ী-ঘর। আমার জ্যেঠামশায় পেয়েছিলেন আমাদের পুরানো বাড়ি, সে বাড়ির অনেক অপবাদ। একটা পুরানো ডুমুর গাছ গলির মাথায় ছত্রছায়া মেলে থাকত। সেখানে নাকি কেউ থাকতেন, মধ্যে মধ্যে দুটো পা ঝুলতে দেখা যেত—চকিতের মত; এই বাড়ীতেই ছিল একটা শিউলী গাছ, সেখানেও কেউ থাকতেন নাকি—তাঁর মাথা ন্যাড়া, পায়ে খড়ম। তিনিও মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেন, এবং তিনি দেখা দিলেই নাকি আমাদের পরিবারের মধ্যে কাউকে যেতে হ'ত। এই ভৌতিক গৌরব বা অপবাদগ্রস্ত গলি নিয়েই হোক বা অন্য কোন হেতু হতেই হোক, মাস্টার মশায় ক্ষুদিরামের ভূতসম্পর্কীয় কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন। অনেক নজীর দেখিয়েছিলেন, বিজ্ঞানবাদ বুঝাতে চেয়েছিলেন, সায়েবদের দোহাই পেড়েছিলেন এবং ক্ষুদিরামকে নির্বাক ক'রে দিয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম তখন নির্বাক হয়ে সেই রাত্রে মাস্টার মশায় যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের বাড়ীর ভিতর থেকে একাকী বৈঠকখানায় আসছেন, (সুকৌশলে ক্ষুদিরাম সেদিন মাস্টারকে একাই ফেলেছিল) তখন হঠাৎ ওই গলির মধ্যে এক স্থানে ঝরঝর শব্দ তুলে এক রাশি

কিছু বর্ষণ হয়ে গেল। সম্মুখেই ডুমুরতলা, তার ওদিকে শিউলীবৃক্ষ। মাস্টার মশায়ের রামকবচ—অভয়মন্ত্র বইয়ের মধ্যে আছে, বই তখন সঙ্গে নেই। কাজেই তিনি বু-বু-বু-বু শব্দ ক'রে আমাদের বাড়ীর মধ্যেই ফের দৌড়ে গিয়ে প'ড়ে গেলেন। শব্দটা তিনি প্রাণ খুলেই করেছিলেন, পাড়ার লোকে শুনেছিল ; কাজেই ও-নামটা সেই দিন সেইক্ষণেই করণ ক'রে দিলে লোকে। মর্মান্তিক লজ্জা সেই জন্যে।

এ লজ্জাও তাঁর কাছে লঘু হয়ে যেত। টাকা নিয়ে ছাত্রকে পড়াতে তিনি ফাঁকি দেন ? চোখ ফেটে তাঁর জল আসত। হতভাগ্য শিশুর মনের দুঃখ বুঝে ওঠা সহজ নয়, সে আমলে এ দিকটায় বুঝবার মত আলোকপাতও হয় নি ; কিন্তু শিশুর প্রতি করুণা-মমতা মানুষের অন্তরের সহজাত বৃত্তি, জৈব প্রবৃত্তির মত। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে হরণ ক'রে পশু তাকে হত্যার পরিবর্তে পালন করেছে। মাস্টার মশায় হৃদয়বান মানুষ ছিলেন, তবুও পরদিন সন্ধ্যায় পড়তে এলেই তাকে ধরতেন চুলের মুঠোয় চেপে। তারপর নির্মম প্রহার। কি কান্নাই কাঁদত প্রতুল! কিন্তু মাস্টার তাকে ছেড়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই সে চোখ মুছতে মুছতে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলত। আমি তাকে বলতাম, আমি বলি নি রে। মাস্টার মশাই নিজেই শুনেছে।

সে ঘাড় নাড়ত—ঠিক। ঠিক। তুমি বল নাই সে আমি জানি।

দু-চার দিন আমিও ব'লে দিয়েছি। যে দিন ছুটি নেওয়ার ইচ্ছা হ'ত, অথচ খোকার পিসীমা ওদিকে কোন গোল তুলতেন না সেই দিন। সেদিন আমাকেই তুলতে হ'ত সাড়া। ডাকতাম—মাশ-শাই—অর্থাৎ মাস্টার মশাই! স্যার! এদিকে টেনে নিতাম অঙ্কের খাতা।

—হুঁ।

—এটা হ'ল কি না দেখুন।

—কি, পড়।

—অঙ্ক স্যার।

—এখন অঙ্ক নিয়ে বসলি কেন? উঠে বসতেন মাশ-শাই। নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস ব্রজেন্দ্র পণ্ডিত অঙ্কশাস্ত্রে সত্যকার পণ্ডিত ছিলেন। কলেজ-ক্লাসের গণিতশাস্ত্র নিয়ে আপন মনেই ক'ষে যেতেন। সে যে তাঁর কি আনন্দ, আমি তা ভুলব না। আবার কবিতাও লিখতেন মস্ত খাতায় কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন। তিনি আজ নেই, কিন্তু কবিতার খাতার স্তূপ আছে। নাটকও লিখেছিলেন তিনি। সে কথা থাক্। খোকার কথাই বলি। জেগে উঠে ব'সে অঙ্ক দেখে বলতেন, কুড়কুড়ির ছা, ভুরভুরির মা, কষেছ তো ঠিক। বাঃ বাঃ! ওই বিচিত্র শব্দ দুটি তাঁর আবিষ্কার, ওর অর্থ তিনিই জানতেন। আমি যেটুকু বুঝতাম, সেটুকু মাস্টার মশায়ের স্নেহের সমাদর। মাস্টার এর পর লক্ষ্য করতেন খোকা নেই।

—খোকা? পালিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। বললে, জিজ্ঞাসা করলে বলিস, মা ডাকছিল।

—হু।

এর পরই বলতাম—আমিও যাই স্যার।

—ওই ছোঁড়াই তোর লেখাপড়া হতে দেবে না। চল্।

তার পরদিন আবার খোকাকে সৎপথে পরিচালনা করবার চেষ্টা করতেন। এ দিনের প্রহার তত নির্মম হ'ত না। খোকা কাঁদত। আমার সঙ্গে কথা বলত না। কাঁদতে কাঁদতেই পড়ত।

আমি মধ্যে মধ্যে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাতাম, সেও তাকাত। একবার—দুবার—তিনবারের বার খোকা ফিক্‌ করে হেসে ফেলত।

এই সময়টুকুর বাইরে খোকার সঙ্গে আমার কোনও সঙ্গ ছিল না। তার জীবন যেখানে মুক্তির অবকাশ পেয়েছে, সেইখানেই সে গিয়েছে। বাড়ী ঘর সমাজ থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়েছে, নিচের স্তর থেকে আরও নিচের স্তরে গিয়েছে। সে যেন খুঁজত অন্ধকার। যে অন্ধকারে মানুষ শৃঙ্খলা-শাসন-লজ্জা—সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। সেখানে সে ছুটত বুনো কালো ঘোড়ার মত। গ্রীষ্মের ছুটিতে খোকা গামছা কাঁধে বের হ'ল স্নান করতে। গিয়ে উঠল আমবাগানে। কাঁচা আম খেয়ে কামড়ে ছড়িয়ে দাঁত ট'কে গেলে উঠত তালগাছে। তাল কেটে খেয়ে জলে নেমে—পুকুরের পাঁক ঘুলিয়ে বাড়ি ফিরত প্রায় তৃতীয় প্রহরে। তখন ভাত খেলেও চলে, না খেলেও চলে। সেজ কাকা তখন ঘুমিয়েছেন। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়েছেন। জেগে আছেন শুধু তারপর মা। এর পর হঠাৎ খোকা পেটের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চীৎকার করত। তারপর ভেদবমি। এই ভেদবমি তিনবার কলেরার পর্যায়ে উঠেছে। আম জাম তাল এ সবের সময় পার হয়ে গেলে খোকা ছুটত বিচিত্র আঁকাবাঁকা পথে। সমস্ত কথা ভুলে গিয়েছি। দুবারের কথা বলছি। একবার হঠাৎ দেখি, খোকা থিয়েটারের স্টেজের ভিতর থেকে উঁকি মারছে। তখন পাকা স্টেজ হয়েছে। সামনেটা চট দিয়ে ঢাকা থাকে। সেই চটের একটা বড় ছিদ্র দিয়ে খোকার মুণ্ডটা বেরিয়েছে। সে মুণ্ডটা দুলিয়ে ডাকলে। লোভ সামলাতে পারলাম না। সে বললে, পিছনের জানালা দিয়ে এস। পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম, জানালার একটা শিক নেই। শিকটা খোকা ছাড়িয়েছিল কি না

খোকাই জানে। অন্যে ছাড়িয়ে থাকলে সেটা খোকার চোখ এড়ায় নি। জীবনের যে দিকটা পিছনের দিক, যে দিকটায় জ'মে থাকে আবর্জনা, ভাঙা খোলা—সে দিকটার খবর ছিল খোকার নখদর্পণে। ওঁর চোখে পড়তই। আমি যখন ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, তখন সে এরই মধ্যেই সেজেগুজে বসে আছে। মাথায় সখীর পরচুলো—একটা বেণীওয়ালা চুল প'রে দেওয়ালে ঝুলানো একখানা আয়নায় মুখ দেখছে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসছে, বললে, কেমন লাগছে বল তো?

আমারও সে দিন ভাল লেগেছিল। আমিও পরলাম একটা পরচুল। আয়নায় মুখ দেখলাম। খোকা বললে, বিল্বমঙ্গলে আমি সাজব পাগলিনী, তুমি সাজবে চিন্তামণি। হোক?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম, মুখে বললাম, হ্যাঁ।

—দস্তখচংবাবুর চেয়ে আমি ভাল পাট করব। দেখো তুমি। ব'লেই সে গানও এককলি গাইলে—কেমন মা তা কে জানে?

দস্তখচংবাবু হ'ল নিত্যগোপালবাবুর সে আমলের একটা চটানে নাম। আমাদের গ্রামে ফুল্লরা দেবীর স্থানে মেলা হয়। সে মেলায় সেকালে বড় বড় যাত্রার দল আসত। একবার কলকাতার থিয়েটার পার্টিও গিয়েছিল। সেবার এসেছিল ফকির অধিকারী মশাইয়ের নামজাদা দল। মেলায় যাত্রা হ'ল। দশখানা গ্রামের লোক দেখলে। দেখতে পেলে না কেবল আমাদের গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা। মেলায় মেয়েদের জন্যে আসরও করা হয়েছিল, কিন্তু তবু সেখানে যাওয়া চলত না সে আমলে। হোক না কেন ফকির অধিকারীর দলের যাত্রাগান! এই কারণেই গ্রামের মেয়েরা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন—নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে একদিন যাত্রাগান করাতে হবে

—গ্রামের ভিতরে। তাঁরা চাঁদা তুলতে সুরু করলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে কে? কর্তা, যাঁরা যাঁরা গ্রামের প্রধান তাঁদের কাছে এ কথা বলতে সাহস হ'ল না। তাঁরা এসব কাজ কখনও করেন না। মেয়েরা ধরলেন নিত্যগোপালবাবুকে। নিত্যগোপাল নিজে সুকণ্ঠ গায়ক—গান-বাজনায় গভীর আসক্তি। তার উপর অফুরন্ত প্রাণশক্তি, পনের-ষোল বছরের উৎসাহী ছেলে—সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ঘাড় পেতে তুলে নিলেন দায়। দলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা ব'লে এলেন। দলের ম্যানেজারের কাছে এ ধরণের বায়না নূতন নয়। তখন বাংলা দেশের কোন বর্ধিষ্ণু গ্রামে যাত্রার দল তিন দিনের বায়নায় গেলে অন্তত ছ দিন গান গেয়ে তবে বের হ'ত গ্রাম থেকে। এ-পাড়ার মেয়েরা ও-পাড়ায় যায় না, এ-বাবুর বাড়ী ও-বাবু যায় না, বাবুদের পাড়ায় দোকানী-পাড়ার লোকেরা বসতে পায় না; সুতরাং তিন দিন মুল বায়নার পর তিন দিন বাড়তি গাওনা গেয়ে তবে তারা ফিরত। এ সব ক্ষেত্রে দক্ষিণাও কম নিত। খাওয়া-দাওয়া এবং শীতান্তে শীতবস্ত্রের 'সেল প্রাইসে'র মত 'কম-সম' দক্ষিণা নিয়েই গান গাইত। আর মেয়েদের উদ্যোগের প্রতিভূ হয়ে এই রকম কিশোর ছাওয়ালরাই আসে বরাবর। দিনে চাল ডাল মাছ এবং রাত্রে ঘি ময়দা, আসরে পান তামাক আর টাকা পঞ্চাশেক দক্ষিণায় বায়না হ'ল। দশ টাকা বায়নাও দেওয়া হ'ল। ম্যানেজার পাকা লোক, বললেন, সর্তগুলো কাগজে লিখে কিন্তু একটা সই ক'রে দিন।

নিত্যগোপালবাবু বললেন, বেশ তো। ব'লেই কাগজ কলম নিয়ে খস-খস ক'রে লিখে দিলেন।

ম্যানেজার বললেন, সইটা—? সইটা কি—

—আমিই করব। ব'লেই সই করে দিলেন—এন. জি. মুখার্জি

সন্ধ্যায় যাত্রার দলের সাজ-পোষাক নিয়ে গরুর গাড়ী এল। সাজ-ঘরে আলো জ্বলছে, আসরও পড়েছে ; কিন্তু নিত্যগোপালবাবু তখন লুকিয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যে টাকা উঠেছে তার পরিমাণ দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। চাল-ডাল, ঘি-ময়দা-মাছ-তরকারি উঠেছে ; কিন্তু টাকা উঠেছে তিরিশটি, আরও পাঁচ টাকার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু সে বাকী টাকা কোথায় ? কি করবেন নিত্যগোপালবাবু ? এ দিকে যাত্রার দলের ম্যানেজার ব'সে রয়েছেন টাকার জন্য। টাকা না-নিয়ে গান স্থুরু করবেন না। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক। শ্রোতারা এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে জন কয়েক গিয়ে বললেন, কই মশায়, কখন আর করবেন ? বাবুরা যে সব এসে গেছেন। কর্তারা তখন সত্যিই এসেছেন, তাঁরা সেদিন নিমন্ত্রিত অতিথি। ম্যানেজার বললে, আমরাও তো তৈরি। দেখুন না—সকলেই তৈরি। কিন্তু আমাদের টাকা কই ? বাকী চল্লিশ টাকা দক্ষিণা— পান-তামাকের দু টাকা ; টাকাটা পেলেই স্থুরু করব। তিনি কই ?

—কে ?

--কে আবার ? একটা তীক্ষ্ণকণ্ঠ ব্যঙ্গভরে ধ্বনিত হয়ে উঠল—সারা আসরটা ছড়িয়ে পড়ল। শনির ভূমিকার অভিনেতা শনি সেজেই তার স্বভাবগত তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব্যঙ্গ ক'রে ব'লে উঠল. কে আবার ? সেই দস্তখচংবাবু মশায়। বায়না করতে গিয়ে কাগজ টেনে নিয়ে খসখস ক'রে লিখে—টানা ইংরিজীতে সায়েবী ঢঙে দস্তখচং সেরে দিলেন। সেই ছোকরা— দস্তখচংবাবু ?

কথাটা ছড়িয়ে দিলে শনি। বাবুদের কানে গেল। ব্যবস্থাও

হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। তবু যাত্রা সুরু হয় না। কেন? —আরে মশায় সে দস্তখচংবাবুকে আনুন, তিনি সামনে বসুন, তবে তো গাইব আমরা।

গান হয়ে গেল। দল চ'লে গেল। লোকে গানের কথাও ক্রমে ভুলে গেল, কিন্তু নিত্যগোপালবাবুর 'দস্তখচংবাবু' নামটা লোকে সহজে ভুললে না।

খোকায় জাঠতুত দাদা নিত্যগোপালবাবু, খোকা আড়ালে তাকে বলে—দস্তখচংবাবু। শুধু নিত্যগোপালবাবুকেই নয়, অন্তরালে নিজের বাড়ীর সকলকেই ডাকে এমনি ধরনের এক একটা নাম ধ'রে।

দ্বিপ্রহরের অবসরে এমনি ভাবে সে ঘুরে বেড়াত। আপনার মনে যা খুশী তাই করত এবং আমাদের সঙ্গে দেখা হ'লেই এই অবসরের কীর্তি-কলাপের কথা এমন রঙ দিয়ে বড় করে বলত যে, অবাক হয়ে যেতাম আমরা। ছোট একটা সাপ দেখে থাকলে বলত—সাড়ে তিন হাত লম্বা একটা মিস্ কালো আলান (কেউটে) সাপ, বুঝলে কিনা, বুঝলে কিনা—এই তার ফণা। কুলোর মতন—কুলোর মতন; চক্র কি? এই চক্র। আমাকে তাড়া করলে।

—তারপর?

—আমাকে তাড়া করলে। সোঁ-সোঁ ক'রে তাড়া করলে।

—হ্যাঁ। তারপর? তুই কি করলি?

ছুটলাম। হ্যাঁ, ছুটলাম। আমিও ছুটলাম। বোঁ-বোঁ ক'রে ছুটলাম।

—সাপের দৌড়ের সঙ্গে মানুষ পারে?

—তা—পারে নাকি? কিন্তু—আমি—আমি—। আমি মন্তর জানি কিনা। সেই সীতারাম বাবা সন্ন্যেসীর কাছে শিখেছিলাম। সেই মন্তর, ব'লে বললাম— যা, ফিরে যা। সে তখন সুড়-সুড় করে ফিরে গেল।

এমনি ধারায় থেমে থেমে নিজে মিথ্যে কথা ভেবে নিয়ে শ্রোতার চক্ষে প্রকট করে ধরেই সে মিথ্যে বলতে শিখেছিল। সে অভ্যাস তার জীবনে আজও যায় নি। মিথ্যে যখনই বলে, এবং বলে সে প্রায়ই—অকারণেই বলে, নিঃস্বার্থ ভাবেই বলে—অপরের ঈর্ষা না করেই বলে,—বলে এমনি থেমে থেমে। আমাদের গ্রামের লোক বা তার পরিচিত লোক সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বলে—থাম্ খোকা।

খোকা দুঃখিত হয় না, লজ্জিত হয় না, ফিক্ করে হাসে।

১৪

যখন ভাবি, এত অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে, অত্যন্ত পীড়াদায়ক অপ্রতিষ্ঠা ও গৌরবহীনতার মধ্যেও খোকা ওই হাসিটুকু বাঁচিয়ে রাখল কি করে, তখন আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

জীবনের অনুভূতি ম'রে গেছে? মনের ক্ষেত্র, সারা জীবন প্রশংসা প্রেরণা সস্নেহ উৎসাহের বর্ষণ না পেয়ে, শাসনের উত্তাপে, অবহেলা ও অপ্রতিষ্ঠার বালু-ঝড়ে একেবারে অনুর্বর হয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে?

হয়তো হবে। কোন ফুলই ফোটাতে পারলে না সে তার জীবনে। শুধু প্রখর কিছু তার উপর উত্তাপ বিকিরণ করলেই তার

জীবন-বিস্তৃত বালুকণা চিক্‌মিক্‌ ক'রে ওঠে,—তার না আছে কোন মূল্য না আছে কোন অর্থ। মূল্য নাই, অর্থ নাই ব'লে লোকে হাসি দেখলেও চটে ওঠে। সকল লোকেই চটে ওঠে—স্ত্রী পুত্র পর্যন্ত।

আমার অনুমান, ওর স্ত্রীও ওর গল্পে বাধা দিয়ে বলে, থাম বাপু, আর ব'কো না।

—কেন?

—কেন? যত সব মিছে কথা—

—কক্‌খনও না।

—নিশ্চয় মিছে কথা। যা বলছ, তাই হয় কখনও?

—হয় না! তুমি সব জান!

—সব না জানি; এটুকু জানি যে, তোমার সব কথা মিছে।

—মিছে?

—নিশ্চয় মিছে।

—নিশ্চয় মিছে?

—নিশ্চয়—নিশ্চয় মিছে!

—এই দেখ—

এবার মুখের কাছে মুখ নেড়ে বউ বলে, নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে—নিশ্চয় মিছে, একশো বার মিছে। হাজার বার, লক্ষ বার মিছে। ঢের ঢের মিথ্যাবাদী দেখেছি—তোমার মত দেখি নি।

এবার খোকা ফিক্‌ করে হেসে ফেলে। ওঃ, বউ কথাটা জোর বলেছে—হাজার বার, লক্ষ বার মিছে! এঃ, ধরে ফেলেছে!

ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাড়ীতে-ঘরে পাড়ায়-গ্রামে দেশে-দেশান্তরে যত পরিচিত স্থান আছে, সর্বত্রই তাদের বাপের অখ্যাতি অপবাদের কথা শুনে আসছে, চোখেও দেখেছে, বাপের

প্রতিষ্ঠাহীনতার দৈন্য তাদের পীড়া দেয়—তারাও অনেক সময় গল্প-মুখর খোকাকে বলে, তুমি বাপু, বড় বাজে বকো।

—বাজে বকি? জানিস তুই? শূয়ার কোথাকার!

—না! বকো না!

—অ্যাই—

—চুপ কর, চুপ কর—লোক আসছে, থাম। না যদি থাম তবে আমিই উঠে যাচ্ছি—যত খুসী পেট ভ'রে তুমি বাজে বকো—মিছে কথা বল। 'পেট ভ'রে' কথাটা বিচিত্র উচ্চারণে বলে 'পে-ট ভ'-রে'!

ছেলে উঠেই চ'লে যায়।

অল্প ছুটি একটি মুহূর্তের জন্য খোকা স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর আপন মনেই ফিক ক'রে হেসে ফেলে। ধ'রে ফেলেছে ছেলেটা।

অর্থহীন মূল্যহীন হাসি, বালুকণার ঝিমিমিকি! নীরস-নিষ্ফল জীবনের প্রতিফলন ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে। কেন মিথ্যে বলে—সে খোকা জানে না। হয়তো ওর আত্মা ব্যঙ্গ-ভরে বলে—সব ঝুট হ্যায়। তাই হয়তো মিথ্যে বলতে গ্লানির পরিবর্তে আনন্দ অনুভবই ক'রে থাকে খোকা।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে, খোকা হাসে, কাঁদে না। কাঁদলে সে কোন্‌দিন ম'রে যেত।

খোকার অনেক কীর্তি, কিন্তু কথা এইটুকুই—এর বেশী নয়। এক একটা কীর্তি অপরটারই পুনরাবৃত্তি। থাক্ খোকার কথা এইখানে।

খোকার পর আরও বন্ধুরা এল, পাড়ারই ছেলে সব।

দ্বিজপদ, বৈদ্যনাথ, বড় পাঁচু, ছোট পাঁচু।

ক্রমে ও-পাড়া থেকে এল বংশী। তারপরের পাড়া থেকে বীরেশ্বর। বীরেশ্বর বয়সে আমার চেয়ে বড়। তারই মাধ্যমে

আলাপ হ'ল আমাদেরই পাড়ার বীরেশ্বর বয়সী করালীর সঙ্গে।

দ্বিজপদ আমার জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে।

আমার 'কবি' উপন্যাসের বিপ্রপদ—দ্বিজপদেরই অক্ষম রুগ্ন অবস্থার চিত্র। বাল্যকালে দ্বিজপদ ছিল দুর্দান্ত দুরন্ত ক্রোধী, প্রচণ্ড রূঢ়ভাষী; কিন্তু আমার কাছে এবং আরও কয়েকজনের কাছে সে ছিল প্রীতিমধুর, মিষ্টভাষী, অপরূপ মানুষ। আমার সঙ্গ সে খুব পেত না। তবে পেলে কৃতার্থ হ'ত। সম্পর্কে (দূরসম্পর্ক নয়) আমি হতাম তার দাদামশায়, তার মায়ের কাকা। সে, তার দাদা, তার বোনেরা আমাকে 'দাদামশায়' বলত। দ্বিজপদ ছাড়া সবাই ছিল বয়সে বড়। এদের সকলের চরিত্রেই ছিল দ্বিজপদের মত দুটি বিপরীতধর্মী মানুষ এক জন যত ক্রোধী, অপর জন তত মিষ্টভাষী। এর কারণ একেবারে রক্তগত বৈচিত্র্য, বংশানুক্রমের অতি সুস্পষ্ট প্রকাশ। দ্বিজপদের মা, আমার ভাইঝি ত্রিগুণাসুন্দরী—'তিগুণী'র বংশের ভাষা—তার নিজের ভাষা ছিল অতি মিষ্ট ; দ্বিজপদের বাপের দিকের চরিত্রে ছিল অপরিমেয় রূঢ়তা, প্রচণ্ড ক্রোধ, কর্কশ উচ্চ কণ্ঠ ; আর ছিল জৈব আবেগের উন্মত্ততা, সে প্রায় অন্ধ উন্মত্ত ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলত জীবনকে। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাদা কালো দুটি স্রোতধারা যেমন পাশাপাশি চলে, তেমনি ছিল দ্বিজপদের জীবন। আমার ভাগ্যে আমি যতবার ওদের জীবনধারায় অবগাহন করেছি, ততবারই স্নাত হয়েছি স্নিগ্ধ শান্ত কালিন্দীর কালো জলের ধারায়।

দ্বিজপদ আমার চেয়ে বয়সে ছিল এক বৎসরের ছোট। পড়ত কিন্তু ক্লাস তিনেক নিচে, ক্রমে সে ব্যবধান—পাঁচ ছয় ক্লাসের

ব্যবধানে পরিণত হয়েছিল। দ্বিজপদের কণ্ঠ ছিল উচ্চ, উল্লাস ছিল উগ্র, তেমনি প্রবল ছিল জৈব প্রবৃত্তির পথে ছুটবার আবেগ। দ্বিজপদের বাবা ছিলেন আমার বাবার বাল্যবন্ধু, সম্পর্কে হতেন নাতজামাই, প্রতিবেশীও ছিলেন অতি-নিকট। দ্বিজপদের বাবা নিত্য আসতেন আমার বাবার ওখানে। চা খেতেন, গল্পগুজব করতেন। রামজী গোঁসাইবাবা তাঁকে ডাকতেন 'রাজা' ব'লে। তার কারণ যৌবনে দ্বিজপদের বাবা গ্রামের যাত্রার দলে রাজা দুর্যোধন সাজতেন। রাজার মত চেহারাও ছিল। তাঁর কথা থাক্। দ্বিজপদের কথা বলি। আমার জীবনে দ্বিজপদ এবং বড় পাঁচু হঠাৎ একদা এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা ক'রে দিলে, সে সূচনা সূত্ররেখার মত সূক্ষ্ম সূত্রপাত থেকে ভবিতব্যের রেখায় মিলে প্রশস্ত হয়ে হ'ল পায়ে-চলা পথ; তারপর পরিণত হ'ল রাজপথে ;—অথবা তারা সেইদিন বল্মীক-স্তূপে আরোহণের আস্বাদন দিয়ে আমাকে ভাবীকালে দুরূহ পর্বতাভিযানে রত ক'রে দিয়ে— নিজেরা নেমে গেল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারে কোন্ মনোরমের হাতছানি তাদের মুগ্ধ করেছিল, সেই কথাই আজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবি।

স্পষ্ট মনে রয়েছে সেদিনের কথা।

বড় পাঁচু, দ্বিজপদ আমার সঙ্গে খেলা করছিল আমাদের বাড়ীতে। কয়েকদিন আগে নারাণের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বড় পাঁচু এবং দ্বিজপদকে নিয়ে রামায়ণ-খেলা খেলছি। পাঁচু হি-হি ক'রে হাসছে; ওটা ছিল পাঁচুর স্বভাব। কথার একটু জড়তা ছিল। অল্প বয়সেই—বোধ হয় এগারো বারো বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল পাঁচু, তবু যতটুকু মনে পড়ে, তার স্বভাবের মধ্যে একটি ভীরু চতুরপ্রকৃতির জীব উঁকি মারত। ঠাকুর-বাড়ীতে পূজক



ছিলেন বুড়ো ভট্টাচার্য, আগুনের মত কোপন-স্বভাব, কণ্ঠস্বর একটু খোনা। ছিল ব'লে ছেলেবয়সে নাম হয়েছিল—খোনা, ক্রমে সেই নাম কোপন-স্বভাব হেতু—'খুনে'তে পরিণত হয়েছিল। চতুর ভীরু পাঁচু তার কাছেও হি-হি ক'রে হাসত। ভটচাজ পূজা করতেন, পাঁচু দোরের পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মারত আর হাসত—হি-হি! হি-হি! হি-হি! আশ্চর্য চতুর পাঁচু অনুভবে বুঝত যে, খুনে এতেই খুসী হবে।

সত্যই ভটচাজ রাগ করতেও পারতেন না। তিনিও হেসে ফেলতেন এবং পূজার মধ্যে অবকাশ হ'লেই প্রশ্ন করতেন—কি?

—পেছাদ।

প্রসাদ দিতেন ভটচাজ। একটু চিনি, একখানা বাতাসা। এর বেশী শিবঠাকুর আর কি পান?

পাশাপাশি পাঁচটি শিবমন্দির। ভটচাজ এক মন্দিরে পূজা সেরে দ্বিতীয় মন্দিরে ঢুকতেন। পাঁচু আবার এসে দাঁড়াত।

—হি-হি! হি-হি! হি-হি!

—আরে আবার কি?

—ভশচাজ!

—কি? আবার কি?

—পেছাদ!

—আরে! আবার প্রসাদ? এই যে দিলাম!

—তু আমাকে বায়ে বায়ে দে—আমি বায়ে বায়ে খাই ভশচাজ।

এবার ভটচাজই হেসে ফেলতেন হা-হা-ক'রে।

সেদিন খেলতে এসেও অকারণে হাসছিল পাঁচু।

হঠাৎ নারাণ এসে নিমন্ত্রণ জানালে। ভাগবত খেলছে তারা

ভাগবত। অবাক হয়ে গেলাম।

ভাগবতের কথকতা তো তখন শুনেছি। সংস্কৃত শ্লোক—তার ব্যাখ্যাগান, বিচিত্র রসরসিকতা—সেই সব ওরা করবে? কে করবে? তুই? নার'

—না, আমি না। নিশাপতি করবে। মঙ্গলডিহি থেকে নিশাপতি এসেছে।

নিশাপতি মঙ্গলডিহির ছেলে হ'লেও লাভপুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বেশী। নারাণের জীবনে সেই হয়েছে—নব নায়ক। সেই করবে ভাগবতের কথকতা।

গেলাম। সঙ্গে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও গেল। সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। নিখুঁত পরিপাটি আয়োজন। একখানি আসন, সামনে একটি ছোট জলচৌকি, তার উপর একখানি কার্পেটের ঢাকনি, তার উপরে ফুল ও একখানি বই। পুষ্পমাল্যশোভিত কণ্ঠে তিলকশোভিত নিশাপতি বসেছে আসনের উপর। সে বললে, অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন। নমস্কার—

নমস্কার।—বললাম আমরা।

নিশাপতি গম্ভীর ভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে রাজা বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন—আসুন—আসুন, দেবর্ষি, নমস্কার।

নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এ স্টার্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সেকালে ভাগবতের আসরে এই ভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ ক'রে অপ্রস্তুত হতেন।

আমি অপ্রস্তুতই হলাম। কিন্তু পাঁচু বা দ্বিজপদ হ'ল না। তারা

এমন হি-হি ক'রে হাসতে সুরু ক'রে দিলে যে, নিশাপতিই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এর পর সে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে গেল।

মুখস্থ চাণক্য শ্লোক আউড়ে তার ব্যাখ্যা ক'রে নিশাপতি ভাগবত পাঠের খেলা খেলছিল। চাণক্য শ্লোক তখন বাল্য বয়সেই শেখানো হ'ত। আমি চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করি নাই; তবে কেউ বললে চাণক্য শ্লোক ব'লে চিনতে পারতাম। আমার মুখস্থ ছিল রঘুবংশের প্রথম শ্লোক—বাবা শিখিয়েছিলেন,

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দেঃ পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥"

আমার সে শ্লোক আওড়াবার অবকাশ ছিল না। আমি চুপ ক'রেই রইলাম। নিশাপতি শ্লোকের ব্যাখ্যা সুরু করলে। বিষ্ঠার মধ্যেও স্বর্ণখণ্ড থাকলে, তা সযত্নে সংগ্রহ করবে। বাস্, আর যায় কোথায়। হি—হি—হি! হি—হি—হি!—বিষ্ঠা! ভাগবতের মধ্যে বিষ্ঠা! পাঁচু এবং দ্বিজপদ হেসে আসর পণ্ড ক'রে দিয়ে উঠে পড়ল, এবং হঠাৎ পাঁচু মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ফেললে—

নিশাপতি—খিশাপতি—ছিশাপতি রে—

ভাগবতে হ্যাক-থু—হ্যাক থু-থু! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি! সে আর থামে না। নিশাপতি প্রায় ক্ষেপে গিয়ে ভ্রষ্টযোগীর মত আসন ত্যাগ ক'রে উঠে মারপিট সুরু ক'রে দিলে। ওরা দলে ছিল ভারী। এলাকাটা ছিল ওদের। তবুও আমরা শুধু মার খেয়েই এলাম না, নাকের বদলে নরুনের মত দু-এক ঘা দিয়েও এলাম। এলাম আমাদের বৈঠকখানায়। এসে শোধ নেওয়ার পরামর্শ চলতে লাগল। হঠাৎ বাগানের একটা গাছ থেকে পড়ল একটি পাখির বাচ্চা। ছোট্ট পাখির বাচ্চা, বাসা থেকে প'ড়ে

গেল কি ক'রে? খেলার মোড় গেল ঘুরে। শোধ নেওয়ার পর মর্শ স্থগিত থাকল। পাখিটিকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য পরিচর্যা সুরু ক'রে দিলাম। জল দিলাম, গাড়ুর নলের মুখে জল। খামার থেকে ধান এনে দিলাম তার মুখে—খা খা। পরিচর্যায় হাঁপিয়ে উঠে ছোট পাখির ছোট প্রাণটুকু বেরিয়ে গেল। ঘাড়টি লট্‌কে পড়ল। অত্যন্ত দুঃখ হ'ল। আহা-হা, ছোট পাখিটি! বাঁচলে—কেমন পুষতাম!

অতঃপর পাখিটিকে সমাধি দেবার কল্পনা হ'ল। মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করলাম। পাখির ছানাটি প'ড়ে রইল বাগানের বাঁধানো বেদীর উপর।

হঠাৎ পাঁচু ডাকলে—দেখ।

দেখি, পাখির মা ডাল থেকে নেমে এসে ছানাকে ডাকছে। তার চারিপাশে ঘুরছে, সস্নেহে ঠোকরাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম।

পাঁচু ইতিমধ্যে মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে ফেললে—

"তারা দাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি
তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ-কেঁউ করি।"

আমাদের বৈঠকখানার দরজায় লাইন দুটো খড়ি দিয়ে লিখে ফেললে সে। আমি বিস্মিত হয়ে পাঁচুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কবির সম্মান, কবির মূল্য তখন বুঝি নি, কিন্তু পাঁচু যা করেছে সে যে একটা মহাগৌরবের—তার মূল্য যে পরম মূল্য—তা যেন সেই মুহূর্তেই উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধি করলাম নিজের বিস্ময়ের পরিমাণ থেকে, গভীরতা থেকে। মা-পাখিটা ইতিমধ্যে ডালে গিয়ে বসলে, আবার এল, আবার গেল, কয়েকবারের পর

ভালেই ব'সে রইল। তখন খড়ি নিয়ে আমি পাঁচুর লাইন দুটির নিচে লিখলাম—

পাখির ছানা—মরে গিয়াছে—
মা ডেকে ফিরে গিয়াছে—
মাটির তলায় দিলাম সমাধি—
আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

লাইন কটি অন্তত কুড়ি বৎসরের উপর লাল রঙ করা দরজার খড়খড়ির গায়ে লেখা ছিল। বোধ হয় কুড়ি বৎসরেরও বেশী। আমার আমলেই আমি নিজে হাতে সাদা রঙ দিয়েছিলাম দরজায়, তাতেই সে ঢাকা প'ড়ে গেছে। আমার সাহিত্য-সাধনা সুরু হয়ে গেল সেই দিন।

পাঁচু লিখেছিল প্রথম দুটি চরণ। আমি করেছিলাম পাদপূরণ। দিন তারিখ মনে নেই। তবে বয়স মনে আছে। আমার বয়স তখন আট বছরের কম। আট বছরেই আমার বাবা মারা গেলেন। তখন বাবা আমার বেঁচে ছিলেন। সেই বারেই পূজোর সময় কবিতা রচনা করলাম—

শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।

আর মনে নেই, আরও অন্তত বারো চৌদ্দ লাইন ছিল। বাবা সে কবিতা দেখেছিলেন। কবির সম্মান, কবির মূল্য আমাকে বুঝিয়েছিল পাঁচু। জিহ্বায় জড়তা, সবতাতেই হাসি, বিচিত্র পাঁচু হঠাৎ সেদিন কি ক'রে এবং কেন কবিতা রচনা করেছিল—তা ভাবি আর বিস্মিত হই। কবিতা রচনা করা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তার আকস্মিক উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাকে দিয়ে গেল জীবনের দীক্ষা।

১৫

"শারদীয়া পূজা যত নিকট আইল
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

কবিতাটি রচনা করেছিলাম যখন, তখন অলক্ষ্যে কাল নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। আজ সেই বহুকালের পুরানো কথা স্মরণ করতে গিয়ে--যখন পুরানো ছবিগুলি ঝাড়ামোছার পর স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে তখন মনে হচ্ছে--সে দিন ছবিগুলি আঁকা হওয়ার সময় অনেক কিছু চোখে পড়ে নি-- পড়লেও সেদিন তার অর্থ উপলব্ধি হয় নি। কাল হেসেছিলেন এবং সে হাসি ঠিকই চোখে পড়েছিল, কিন্তু তাকে কালের হাসি ব'লে চিনতে পারি নি। এতকাল পর্যন্ত, এই মুহূর্তে সেই কাহিনী লিখবার আগের মুহূর্ত পর্যন্তও না। আজ মনে পড়ছে সেই কালের হাসির খানিকটা ফুটেছিল বাবার মুখে—খানিকটা ফুটেছিল লোকের মুখে। বাবা হেসেছিলেন, রোগশয্যায় শুয়ে ছোট্ট কাগজে ছাপানো কবিতাটি প'ড়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটেছিল। প্রসন্ন, কিন্তু রোগের ক্লান্তি ও ক্লিষ্টতার জন্য বিষণ্ণ ও ব্যথিত। আমায় ডেকে সমাদর ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কতটা লিখেছো, নারাণই বা কতটা লিখেছে ?

কবিতাটির নিচে রচয়িতা হিসাবে আমার এবং নারাণের নাম ছিল। ছাপা হয়েছিল কলকাতার তখনকার দিনের এক বিখ্যাত প্রেসে—ক্যালিডোনিয়ান প্রেসে। নারাণের ঠাকুরদা ছিলেন ক্যালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কুলীন। ঘেঠেরা তারাচরণের বংশধর, আমাদের গ্রামের জামাই। বছরে বার

ছয়েক শ্বশুরবাড়ী আসতেন। পূজোর সময় একবার এবং আর একবার যখন হোক। তিনিই এনেছিলেন ছাপিয়ে। নারাণের সঙ্গে তখন বিরোধ মিটে গেছে; নারাণের পাশ থেকে নিশাপতির দলও অন্তর্হিত হয়েছে, আমার আশপাশ থেকে দ্বিজপদ পাঁচু এরাও সরেছে। পৃথিবীকে যারা ভাল-মন্দবোধের বিচার দিয়ে বেছে-বুছে ভোগ করে—তাদের সঙ্গে, যারা দুহাতে ভোগ ক'রে যায় কোন বিচার না ক'রেই তাদের সঙ্গে ঠিক বনে না। ওদের সঙ্গে তাই ঠিক বনত না আমার। পাঁচু অল্পবয়সে গেছে, দ্বিজপদ অনেক দিন দুনিয়াকে দুর্দান্ত ভাবে ভোগ ক'রে—শেষ-জীবনে যেন কার প্রচণ্ড গদাঘাতে ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের মত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। সুস্থ জীবনে যার প্রচণ্ড চীৎকার ক'রে পৃথিবীতে কোলাহল সৃষ্টি ক'রে চলা অভ্যাস ছিল, হঠাৎ সে একেবারে রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল; কঠিন যৌন ব্যাধি থেকে বাত। রোগের সামান্য উপশম হ'লেই দ্বিজপদ লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে গ্রাম্য রাস্তা উচ্চ হাস্যে রসিকতায় মুখর ক'রে তুলত। থাক্ সে কথা। দ্বিজপদরা বার বার এসেছে আমার কাছে। কিন্তু কিছুতেই বনে নি, কয়েক দিন পরেই আমার সঙ্গ ছেড়ে যেন পালিয়ে গেছে। সে দিনও নারাণ এলে ওরা চ'লে গিয়েছিল। বড় পাঁচুর দেওয়া প্রেরণা তখন আমার মনের প্রদীপে আলো জ্বালিয়েছে। একটা ছোট কথা মনে প'ড়ে গেল। এ ঘটনার অনেক পরে—সম্ভবত বছর পঁচিশেক আগে—কালীপুজার রাত্রে আমাদের গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এক জায়গায় পূজা। দেখতে চলেছিলাম; হঠাৎ পথের ধারে গাছতলায় সিগারেট খেতে ব'সে দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় চোখে পড়ল কিছু খড় প'ড়ে আছে, বোধ হয় কোন রাহী ফেলে

গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হ'ল খড়গুলিতে আগুন ধরিয়ে বহ্ন্যুৎসব করবার। ধরিয়ে দিলাম আগুন, খড় পুড়ে ছাই হতে লাগল। হঠাৎ বেশ একটু দ্রুতগতিতে এল দুটি লোক, বললে—'বাঁচলাম বাবু' দাও তো একটু আগুন, লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিই। আলো ধরিয়ে নিতে আগুন পাই নাই সারাটা পথ। সাথে দিয়েশলাই নাই।' আলোর শিখা জ্বেলে নিয়ে তারা চ'লে গেল মাঠের পথে। আমার সামনে খড় জ্ব'লে নিভে গেল; অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল। কেউ খড় পুড়িয়ে হাসে, কেউ পথের আলো জ্বালিয়ে নেয় তা থেকে।

বাল্যকালে একদিন আমার আলোয় নারাণকেও বললাম, তুই ভাই ধরিয়ে নে তোর মনের পিদীম এই শিখাতে। তা হ'লে ভাল হবে—একসঙ্গে চলব দুজনে।

নারাণ প্রথমটা উৎসাহিত হয়েছিল। এ উৎসাহ তার অনেকদিন ছিল। ওই কবিতা রচনায় সেদিন সেও যোগ দিয়েছিল। কতটা সে, কতটা আমি রচনা করেছিলাম—সে হিসাব আজ মনে নেই, করবও না।

বাবার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, আমি অর্ধেক, নারাণ অর্ধেক।

—তুমি সবটা লিখলে না কেন?

আমি চুপ ক'রে ছিলাম। তারপর বলেছিলাম, ওর ঠাকুরদাদাই যে ছাপিয়ে দিলেন।

এবার বাবা চুপ করেছিলেন।

সেদিন ষষ্ঠী। সপ্তমীর দিন সকালে ছাপা কবিতার তাড়া নিয়ে ঢাক ঢোল শানাই কাঁসী কাঁসর ঘণ্টা মুখর শোভাযাত্রার মধ্যে—দুটি শিশু কবি—সর্বসমক্ষে সলজ্জ বিনয়ের অন্তরালে সগৌরবে

আত্মঘোষণা করলে—'আমাদের পক্ষ, পড়ে দেখুন।' আমার এই আত্মঘোষণার সময় কাল হেসেছিলেন বিচিত্র হাসি।

ক্ষুদ্র একটি বাংলার পল্লীতে সেকালের গ্রাম্য বাঙালীর সমাজে এ আত্মঘোষণা খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু আমাদের গ্রাম ক্ষুদ্র ছিল না—আকারেও না, প্রকৃতিতেও না, প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে অহরহ উত্তপ্ত গ্রামখানিতে দ্বন্দ্বী রথীর সংখ্যা ছিল অনেক। আভিজাত্য কৌলিন্যগৌরব, বংশগৌরবের এবং সম্পদগৌরবের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজক্ষেত্রটি প্রায় কুরুক্ষেত্র তখন। অল্পস্বল্প ভূসম্পত্তি, গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ—এমন ধরনের ব্যক্তিরা সে কুরুক্ষেত্রে অর্ধ রথীর সামিল। কিন্তু তা হ'লেও অস্ত্রে ধার তাঁদের কম ছিল না। কুরুক্ষেত্রের সমরে সেনাপতি শল্যের মত বিক্রমে তাঁরা ভীষ্ম দ্রোণের অভাবে সৈনাপত্য গ্রহণের শক্তি ধরতেন। বড় রথী ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা শুধু গ্রামে প্রতিষ্ঠাবান নন—গ্রামের বাইরেও যাঁরা গণ্যমান্য। এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে আবার আমাদের গ্রামে এমন সব মানুষ ছিলেন, যাঁরা সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতায় থাকতেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। রূপে, সজ্জায়, অস্ত্রে, ধ্বজায়, শঙ্খনাদে, তাঁরা এমনই দীপ্যমান ছিলেন যে তাঁদের চিনিয়ে দিতে হ'ত না—দেখবামাত্র চেনা যেত। এই রথীদের সামনে প্রতিষ্ঠা-কামী বালকের আত্মঘোষণা সহজ ছিল না। সে দিন রথীরা সবাই সমবেত। সমস্ত বৎসরের মধ্যে দুটি দিন তাঁরা সকলে একত্রিত হতেন, মহাসপ্তমীর প্রভাতে ঘট পূর্ণ করবার ঘাটে এবং বিজয়া-দশমীর দিন ওই ঘাটেই—ঘট বিসর্জনের অপরাহ্ণে। আজ স্মৃতি স্মরণ করতে ব'সে সে দিনের আমার গ্রামের সেই দীপ্তমুখ প্রসন্নস্বাস্থ্য উজ্জ্বলশ্রী প্রাণবন্ত মানুষের সমারোহ মনে ক'রে চোখে জল আসছে।

চারিদিকে দীপ্তি—চারিদিকে সবল দ্বন্দ্বে যুধ্যমান মানুষ, সে কত কোলাহল—কত বাজনা—কত উল্লাস—সে কি উচ্চ হাসি, সে কি প্রাণখোলা আলাপ! আবার তেমনি কঠিন উচ্চ ছিল বাদানুবাদ, ক্ষেত্রবিশেষে দৈহিক আক্রমণও হয়ে যেত। আর বক্র তীক্ষ্ণ হাস্যের গুণ আরোপ ক'রে মর্মান্তিক শরক্ষেপ—সে যেন অগ্নিবাণ ব্যর্থ হচ্ছে বরুণাস্ত্রে, বরুণাস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে বায়বাস্ত্রে, বায়ুবহ্নি স্তিমিত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে শৈবাস্ত্রে; সে যুদ্ধ বিচিত্র! তার মধ্যে ছাপা পদ্য হাতে নিয়ে যখন প্রবেশ করলাম, তখনকার অবস্থা আজ কল্পনা করতে গিয়ে মনে হচ্ছে—অভিমন্যুর মতই দুঃসাহস হয়েছিল আমার সে দিন। কাগজ বিলি করতেই এই রথীদের অধরধনুতে বক্র হাস্যের জ্যা যোজিত হয়েছিল—পদ্য! কবিতা! কে লিখে দিলে? কি থেকে টুকলে? এরই মধ্যে ডিম ফুটে কালিদাস-হংস বেরুল নাকি? কেউ কেউ হয়তো মহাকবির "মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী" শ্লোকটির প্রথম চরণও আউড়ে ছিলেন। সংস্কৃত-জানা কালিদাস পড়া লোকও না-থাকা ছিল না আমাদের গ্রামে আমার কালে। আমার বাবার কালিদাস গ্রন্থাবলী আজিও রয়েছে। অর্ধপ্রসন্ন অর্ধবক্র কালের হাসির প্রসন্ন ভাগটা ফুটেছিল শয্যাশায়ী আমার বাবার মুখে—বক্রকুটিল দিকটা ফুটল সেদিনের সমবেত জনতার মুখে। কয়েকজনের মুখে প্রসন্ন প্রশংসার হাসিও ফুটেছিল। তাঁদের আজও ভুলি নি। এঁদের ভোলা যায় না।

স্বর্গীয় নির্মলশিববাবু, তাঁর মেজদাদা স্বর্গীয় অতুলশিববাবু, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপালবাবু, এঁদের সেদিনের প্রশংসা-প্রসন্ন হাসি আমার চোখের উপর ভাসছে।

দ্বিজপদ সেদিন হঠাৎ আমায় সম্বোধন করলে 'কপিবর' ব'লে।

সঙ্গে সঙ্গে কোন পূজাবাড়ী থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা একটা কপি-পাতা নিজে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে বললে, কপি খেয়ে ফেললাম। ওর আচরণটুকু আমাকে ওর বাক্যের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে। বুঝলাম, কেউ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কপিবর কথাটা। কিন্তু কপির অর্থ বেচারা জানে না। আমি কপিপাতা চিবিয়ে খাওয়া দেখে হেসে উঠেছিলাম। পরবর্তী কালে দ্বিজপদকে আমিই ডাকতাম কপিবর বলে। সে প্রাণ খুলে হাসত। মধ্যে মধ্যে বলত, একদিন কিন্তু 'উঁ-প' শব্দ ক'রে ঘাড়ে চ'ড়ে বসব।

আমি হাসতাম, বলতাম, ঘাড়ে না, তুই নাতি, তুই বন্ধু—পড়িস তো বুকে লাফিয়ে পড়িস।

কখনও কখনও বলতাম, দোহাই, যেন ঘাড়ে ব'সে কান ধ'রে টেনে ছিঁড়িস না।

সে জিভ কেটে পায়ের ধুলো নিয়ে বলত, দাহু, ছি-ছি দাহু! ছি-ছি! গাল পেতে বলত, মার মার, তিন চপেটাঘাত—থ্রি শ্ল্যাপস। সটাসট—সটাসট!

সেদিনের কথাই বলি। কপিবর ব'লে কপির পাতা চিবিয়েই দ্বিজপদ ক্ষান্ত হ'ল না, সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় দ্বিজপদ ও-পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এল—ওই ছাপানো 'পত্ত' নিয়ে।

—কে লিখতে পারে? কার ক্ষমতা আছে বল্ না শুনি? আমাদের পাড়ায় চারজনা পত্ত লিখেছে। গোপালবাবু লিখেছে, নির্মলবাবু লিখেছে, তারাশঙ্কর লিখেছে, নারাণ লিখেছে। কে লিখেছে তোদের পাড়ায়?

—লেখে নাই, লিখতে পারে আমাদের কালীকিঙ্করবাবু।

—কালীকিঙ্করবাবু! কালীকিঙ্করবাবু তোদের পাড়ার? একা তোদের পাড়ার? কালীকিঙ্করবাবু দু পাড়ার।

শেষ পর্যন্ত মারপিট ক'রে ফিরল দ্বিজপদ।

আমাকে এসেই ডাকলে।—লাগাও যুদ্ধ ওদের সঙ্গে; ও পাড়ার সঙ্গে।

আমাদের বাড়ীতে তখন সমস্ত কিছু যেন থমথম করছে। বাবার অসুখ দেখে ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন পিসীমা। বাবা পুজোর বাজার করতে গিয়েছিলেন কলকাতা; সেখান থেকে এসে জ্বরে পড়েছেন। একজ্বরী জ্বর। প্রথমে ছিল অল্প জ্বর। ধীরে ধীরে জ্বর বেশী হয়ে চলেছে। আজ চারদিন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন নি। আমাদের গ্রামের ডাক্তার গিরিশবাবু ভয় পেয়েছেন আজ। আমার আশুদাদাও চিন্তিত হয়েছেন। তখন আমাদের জেলায় সিউড়িতে ছিলেন লালা গোলোক ব'লে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। কিন্তু তাঁর চেয়েও খ্যাতি বেশী ছিল রামপুরহাটের হরিতারণ ডাক্তারের। ডাক্তার আনাবার জন্য লোকও অপরাহ্নে রওনা হয়েছিল, কিন্তু অন্য কয়েকজন প্রবীণে সে লোককে ফিরিয়ে এনেছেন।

সেকালে এটি ছিল একটি গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য।

শুধু ক্রিয়াকলাপেই নয়, অসুখে বিসুখেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এসে একান্ত আপন জনের মত বসতেন। কতটা তার আন্তরিক কতটা তার শুদ্ধ কর্তব্য পালনের তাগিদ—সে কথা বলতে পারব না, তবে এটা ছিল। সে অসুস্থ ব্যক্তি, যেমন প্রতিষ্ঠার মানুষ হোক না কেন, তার চারিপাশে মানুষের অভাব হ'ত না।

রোগের গুরুত্ব তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাঁরা নিজেরা

প্রত্যেকেই নাড়ী দেখতে জানতেন। ওটা ছিল সেকালের অপরিহার্য একটা শিক্ষা। অনেকের এই নাড়ীজ্ঞান ছিল যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি বিচক্ষণ।

ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে নাড়ী চলছে, পায়রার মত থমকে-থমকে চলছে, পিঁপড়ের পায়ের মত চলছে—এ সব কথা এখনও আমার মনে আছে। তাঁরাই নিজেরা নাড়ী বিচার করে লোক ফিরিয়ে আনলেন।

বাবার হয়েছিল টাইফয়েড। কলকাতা থেকে বীজাণু সংক্রামিত হয়েছিল। নাড়ী দেখে তাঁরা সে আভাস সকলেই পেয়েছিলেন, কিন্তু রোগ কতটা কঠিন হয়েছে বা হতে পারে তাই নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। আমার বাবার স্বাস্থ্য ছিল অপরূপ। এই রোগে—শেষ তিন চারদিন বিছানায় থাকলেও—বসেই আছেন; সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যাচ্ছেন। তিনি নিজেও বললেন, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ শৈলজা? তুমি ব্যস্ত হলেও তো রোগ ব্যস্ত হয়ে চলে যাবে না। ওর ভোগ ও পূর্ণ ভোগ করে তবে যাবে।

সপ্তমীর দিনই সকালবেলা আমায় পুজোর পোষাক বের করে দিয়েছেন। আমরা তখন ভাইবোন তিনজন—আমি বড়, আমার ছোট বোন, তারপর আমার মেজভাই; আমার কনিষ্ঠ সহোদর পাঁচ মাস মাতৃগর্ভে। আমাদের সকলকে পোষাক পরিয়ে ভাল করে দেখেছেন কাকে কেমন মানিয়েছে। রসিকতা করেছেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাম চাকরের কোলে আমার ছোট ভাইকে দেখে। মাকে আদেশ করেছেন পোষাকী কাপড় পরতে। পরদিন মহাষ্টমীতে আমাদের বাড়িতে গ্রামের লোকের নিমন্ত্রণ, তার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই চণ্ডীমণ্ডপ—জানলা খুললে

খাটে বসেই সব দেখা যায়। তিনি খাট থেকে নেমে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পূর্ণঘট চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশমাত্র প্রণাম করেছেন;—নবপল্লবকে মণ্ডপে স্থাপন করে সপ্ত তীর্থের জলে স্নান করানো দেখেছেন—হুলুধ্বনি দিয়ে পান সুপারি ছিটিয়ে বরণ করে নবপল্লব পূজাবেদীতে স্থাপনার পর তবে আবার বিছানায় শুয়েছেন। সুতরাং তাঁকে খুব বেশী অসুস্থ না ভাববার মত কারণ অনেক ছিল। বুঝতে কয়েকজন পেরেছিলেন। মা-পিসীমা মনের একটা আকুলতা থেকে বুঝেছিলেন। রাম চাকরও যেন বুঝেছিল। আর বুঝেছিলেন যোগেশদাদা। যোগেশ মজুমদার ছিলেন আমার জ্যাঠা মশায়ের নায়েব। তাঁর কথা আগে বলেছি। তাঁর মত নাড়ীজ্ঞান ক্বচিৎ দেখা যায়। নাড়ী দেখে তিনি বলে দিতেন—এ জ্বরের ভোগ হবে কত দিন। বলতে পারতেন—জ্বরের পরিণতি কি হবে। খুব বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয়, বৎসর পঁচিশেক আগে, আমাদের ওখানে স্বনামধন্য কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছেলের টাইফয়েড হল। বারো দিনের দিন যোগেশদাদা নাড়ী দেখে এসে বললেন, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্য লোক গেল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কেমন দেখলে যোগেশদা?

—আমি? দাড়িতে হাত বুলিয়ে যোগেশদা ম্লান হাসি হাসলেন।

—কঠিন কিছু?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভাই, নাড়ীর গতি আমি যতটুকু বুঝি তাতে আমার মনে হল, রোগটি ব্রহ্মা-বিষ্ণুর আয়ত্তের বাইরে। তবে শিব সব পারেন। মৃত্যু একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন।

তারপর বলে দিলেন—আঠারো দিন কি বাইশ দিন। তার পূর্বে বোধ হয় একটি অঙ্গ পঙ্গু হয়ে যাবে।

সে অসুখে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন, কলকাতার বর্তমান চিকিৎসা-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। পাঁচ ছ দিন তিনি ছিলেন, প্রাণপণে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে যা করবার করেছিলেন। অবশ্য তিনিও আশা প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁর কর্তব্য তিনি করেছিলেন। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে যোগেশদাদার নাড়ী-পরীক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। চিকিৎসা তিনি করতেন না, শুধু ওই নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন আশ্চর্য সাধনায়। আজ পেনিসিলিন-স্টেপটোমাইসিনের যুগে যোগেশদার নাড়ীজ্ঞান অনেকটা বিভ্রান্ত হত এ কথা ঠিক, কিন্তু তাঁর একটা কথা লিখবার সময়েও আমার কানের কাছে যেন বাজছে। ঐ সময়েই তিনি বলেছিলেন, ভাই, সাধারণ রোগের নাড়ী আর মৃত্যু-রোগের নাড়ীতে পার্থক্য আছে। বুঝা কঠিন, সব সময়ে বুঝতে পারাও যায় না। তবে গভীর মন দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে আভাস পাওয়া যায়, বুঝা যায়। সাধারণ রোগে নাড়ী দেখে এও বলা যায়—ঠিক ঠিক ঔষধ পড়লে এই এই দিনে এই উপসর্গের হ্রাস হবে, এই ভাবে জ্বরত্যাগ হবে। সে বলা কঠিন নয়। রোগের প্রকোপের মাত্রা, ঔষধের শক্তির মাত্রা, ঐ দুইয়ে যোগ-বিয়োগ ক'রে বেশ বলা যায়। কিন্তু মৃত্যুব্যাধিতে ঔষধ কার্যকরী হয় না।

এই যোগেশদাদা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনিও এ কথা বলতে পারেন নি। কি করে বলবেন—এই ভেবে তিনি কূলকিনারা পান নি।

রাম চাকর সকলকে বলেছিল—আমার কি রকম লাগছে গো। উঁহু, ই ভাল নয়। উঁহু! উঁহু!

সে এক বিচিত্র পরিবেশ! আজও মনে পড়ছে—আমার শিশুচিত্তের

সে কি স্বপ্ন! বাইরে দুয়ারের ওপারে আনন্দ-কলরোলের প্রবাহ বয়ে চলেছে, শঙ্খ-ঘণ্টায় হুলুধ্বনিতে ঢাকে-ঢোলে-কাঁসীতে সানাইয়ের সুরে ঘোষণা করে আনন্দ কলরোল প্রহরে প্রহরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটায়, শরৎ-রৌদ্রের ঝলমলানিতে, দেবীমূর্তির সৌন্দর্যে গাম্ভীর্যে রূপের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। রূপের সঙ্গে গন্ধ মিশেছে—গঙ্গা-যমুনার ধারার মত। দেবমন্দিরে উঠছে ধূপগন্ধ, ঘৃতদীপের গন্ধ, পরাতের উপরে রাশিকৃত গন্ধপুষ্প—পদ্মফুল এসেছে ডালা ডালা, গন্ধরাজ টগর মালতীর রাশি সাজানো রয়েছে, ওদিকে ঘষা হচ্ছে অগুরু চন্দন। বধূ-কন্যাদের পরিচ্ছদে উঠছে পুষ্পসারের গন্ধ।

সেই চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই আমাদের বাড়ীটা সে দিন যেন ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর ভিতরে পূজার আয়োজন চলছে, তবু যেন সেখানকার আকাশ মেঘমলিন, সব যেন স্তব্ধ হতশ্রী, বায়ুরও যেন অভাব ঘটেছিল। বাড়ীতে থাকতে আমার শিশুচিত্তের যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তবু সেখান থেকে বেরুতে পারছিলাম না। কেউ জোর করে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠিয়ে দিলে—সেখানেও থাকতে পারছিলাম না, কঠিন আকর্ষণে বাড়ীতে এসে ঢুকছিলাম।

আমাদের সেকালের লাভপুর ব্যক্তিত্বে আভিজাত্যে এবং যোগ্যতায়, রুচিতে এবং মহার্ঘ্যতায় বাংলাদেশের মহানগরীর রুচিসমৃদ্ধ পল্লীর সঙ্গে তুলনীয় ছিল; পূজার সময় সেই শোভা ষোলকলায় পরিপূর্ণ হত। বিদেশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রতিটি জন ফিরতেন গ্রামে। ষষ্ঠীর দিন রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেকে যেন ফিরতে বাধ্য ছিলেন। না-আসাটা মহা-অপরাধ বলে গণ্য হত। সমাজের কাছে, গ্রামের কাছে এই সর্তে যেন দলিল লেখা ছিল। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ

যাঁদের বলি, সেদিনের লাভপুরের জীবন-দ্বন্দ্বের মহারথী ও রথী—তেমন মানুষের সংখ্যাই ছিল ষাট-সত্তর জন, এঁদের সঙ্গে আসত পরিজনেরা। একটি পল্লীগ্রামে এমন দেড়শত মানুষের আগমন কম কথা নয়। তাঁরা এসে পূজা-সমারোহের মধ্যে যে উল্লাসের সৃষ্টি করতেন তাতে গ্রামের সকল বিষণ্ণতা, সকল মলিনতা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাঁরাও যেন দমিত-উল্লাস হয়ে গেলেন। আমার বাবার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। এই পূজা-সমারোহের মধ্যে তিনি থাকতেন পুরোভাগে। তাঁর কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য উল্লাসকে যেন একটি মহিমা দিত। এবং তাঁর অসুস্থতা ছিল যেন কল্পনার বাইরের ব্যাপার। তিনি যে-অসুখে উঠতে পারেন নি, সে-অসুখ তো কম নয়—এই কথাটাই সকলকে উল্লাসের মধ্যেও সচকিত ক'রে দিয়েছিল। একে একে দল বেঁধে তাঁরা আসতে সুরু করলেন দেখতে।

এর মধ্যে বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে কয়েক জনকে। ইন্দ্রবাবু উকিল, যোগীবাবু উকিল আর ব্রজ জ্যেঠা-মহাশয়কে। বাবার সমবয়সী—অন্তরঙ্গ বন্ধু তিনজনেই। ইন্দ্রবাবু শুধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলই ছিলেন না—তিনি সে আমলের সত্যকারের সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন, পাণ্ডিত্যে ব্যক্তিত্বে আচারে ব্যবহারে তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগর-ভূদেব-বঙ্কিম-ইন্দ্রনাথের (পঞ্চানন্দ) অনুগামী। সম্ভবত সেকালে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সপ্তমীর সন্ধ্যায় বাবার রোগশয্যার চারিপাশে মজলিস ব'সে গেল। আমি উঁকি মারছিলাম। যেতে পারছিলাম না। মনে আছে—ইন্দ্রবাবু আমার গায়ে বীরভূমের বসোয়া বিষ্ণুপুরের সিল্কের পাঞ্জাবি দেখে বলেছিলেন, হরিবাবু, এই জন্যই আপনাকে এত ভালবাসি। এখানে এসে দেখলাম

ছোট ছেলেদের গায়ে আগাগোড়াই বিলিতী জামা পোষাক। আপনার ছেলের পরনে দেখছি, ফরাসডাঙ্গা ধুতি—দেশী সিল্কের পাঞ্জাবি। ছেলে কাঁদে নি—জরিদার ভেলভেটের পোষাকের জন্যে?

বাবা মৃদু হেসেছিলেন।

এইটুকুই মনে আছে। তারপর আলোচনা চলেছিল অনেকক্ষণ। যোগীবাবু ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। সৎ মানুষ, খাঁটি উকিল। বাবার সুখ-দুঃখের বন্ধু ছিলেন—আমাদের উকিলও ছিলেন। তিনি ব'সেই ছিলেন চুপ ক'রে।

ব্রজজ্যেঠার আসার কথা মনে আছে। আত্মভোলা সরল রসিক মানুষ। গান গাইতে পারতেন। তিনি গান গেয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। শুনেছি, তিনি সিঁড়ি থেকেই গান ধরেছিলেন—

"ও ভাই কানাই, তু ভাই বিনে রাখাল-খেলা হয় না খেলা—
তু ভাই শুয়ে থাকলি ঘরে, চ'লে যে যায় গোঠের বেলা।"

ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, এ কি কাণ্ড ভাই হরাই! মনে মনে কত আঁচ ক'রে গাঁয়ে এলাম—মহামায়ার পূজা, তুমি ভাই অসুখ ক'রে ঘরে পড়ে! শিবরাম! শিবরাম! তারা কালী—কালী তারা! কপালে হাত দিয়েই চমকে উঠে বলেছিলেন, হরি—হরি—হরি! এ যে অনেকটা জ্বর ভাই হরাই!

ব্রজজ্যেঠা আমার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন, জ্যেঠা, তুমি নাকি পদ্য লিখেছ? আমাদের পাড়ার সদরে দেখি—ছেলের দল দেওয়াল থেকে কাগজ ছিঁড়ছে। আর ঐ পাড়ার শশনের ব্যাটা—কি নাম—আচ্ছা বাহাদুর লেড়কা—এই যে কি-পদ—তার কান ছিঁড়ছে। আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কান ছিঁড়িস না বাবা, তার আগে বল্ হ'ল কি? বলে—হরিবাবুর ছেলে তারাশঙ্কর আর

চারুবাবুর ছেলে নারাণ পত্ত লিখেছে—তাই ওই কি-পদ—ও এসে টিটকিরি দিয়েছে আমাদের পাড়ার ছেলেদের! তাই ছেলেরা—পত্ত ছিঁড়েই ক্ষ্যান্ত হয় নি, ছোকরার কানও ছিঁড়ে দেবে। আমি বলি, বাবারা, তাতে রাগ কেন? সরকারপাড়ার আমরা সাতপুরুষ জমিদার—কাগজং-কলমং-লিখনং-পঠনং—ও আমাদের বারণং; হায়—হায়—হায়, নইলে পোস্টাপিসে চাকরি পেয়েছি সেই কবে, আজও প্রমোশন হ'ল না রে বাবা! যতবার দরখাস্ত করি, ততবার ওপর থেকে লেখে—'নো'। কেন 'নো'? না—দরখাস্তেই এত ভুল যে ওতে প্রমোশন হয় না। আমি বলি, দিস না ব্যাটারা। জমিদারকে প্রমোশন দিতে হ'লে রাজা করতে হয়, সে তোদের হাতে নেই। কই জ্যেঠা তোমার পত্ত দেখি। ছেঁড়া কাগজটা তো পড়া হয় নি!

হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার এবং আশুদাদা। তাঁদের পিছনে পিসীমা।

ওষুধ খাবাব সময় হয়েছে। ডাক্তার দেখবেন। পিসীমা বললেন, সকলেই বলছেন ভাল আছেন দাদা। কিন্তু আমার যে ভাল ঠেকছে না ডাক্তার। তুমি দেখ। ভাল ক'রে দেখ। মুহূর্তে অন্ধকার এল ঘনিয়ে। ইন্দ্রবাবু আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ক্ষিদে পায় নি? যাও, মায়ের কাছে যাও।

অকস্মাৎ কাল এসে দাঁড়াল।

তাকে যেন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। অষ্টমীর দিনও কেটে গিয়েছিল এমনি ভাবেই। মহানবমীর দিন অকস্মাৎ অতর্কিতে সে এসে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে তার ঠোঁটের এক কোণে বাবার ঠোঁটের ম্লান হাসি, অন্য কোণে ফুটেছিল বক্র তীক্ষ্ণ হাঁসি।

মহানবমীর দিন বেলা একটার সময় বাবা মারা গেলেন।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাবা দশটার সময়ে বললেন—এ ঘর তিনি বদল করবেন। মহানবমীর দিন আমাদের ও-অঞ্চলে পূজা-সমারোহের সর্বোচ্চ লগ্ন। বলি হয় অনেক—ছাগ-মেষ-মহিষ, এবং বলির নিয়ম এক স্থানের পর অন্যস্থানে পর্যায়ক্রমে। গ্রামে সকল পূজা-বাড়ীর ঢাক ঢোল একত্রিত হয়ে বাজতে থাকে, গোটা গ্রামের লোক এক স্থানের পর অন্য স্থানে চলে শোভাযাত্রার মত।

এই কারণেই বাবা বললেন, এ ঘরে বাজনার শব্দ হবে প্রচণ্ড। একটু দূরের ঘরে যাবেন। ডাক্তারে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। দুজনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হেঁটেই ঘর বদল করলেন।

বেলা এগারটা নাগাদ দেখা দিল বিকার। ভুল বকতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সে চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর ভাসছে, রক্তাভ চোখের অস্থির চঞ্চল অর্থহীন দৃষ্টি ; সে দৃষ্টি কি যেন খুঁজছিল।

মনে আছে, ইন্দ্রবাবু উকিল মুখের কাছে ব'সে প্রশ্ন করলেন, হরিবাবু!

—আঃ! কি?

—কে আমি বল তো? ,চিনতে পারছ আমাকে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি ইন্দ্র।

—কিন্তু এমন কেন করছ?

—সর ইন্দ্র, সর। স'রে ব'স। দেখছ না, বসতে পাচ্ছেন না। দাঁড়িয়ে আছেন।

—কে? কি বলছ?

—ঠিক বলছি। বাবা। আমার বাবা এসেছেন, দাঁড়িয়ে

আছেন। আঃ, ইন্দ্র, গুরুজনের সম্মান রাখ। স'রে ব'স, জায়গা দাও। বাবা—আমার বাবা। স'রে যাও, সব স'রে যাও। শৈল, আসন দে। আসন দে।

কপালের উপর জলপটি, লাল চোখ, অস্থির দৃষ্টি—বাবার চোখ আমার দিকে পড়ল, কিন্তু আমি তাঁর চোখে পড়লাম না।

কে যেন আমায় কোলে তুলে নিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়ছে, বাবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের ছবি। সেই সময় ছুটে এসে পড়েছিলাম।

বিহ্বল হয়ে দেখলাম।

চারদিকের কলরব কান্না—কিছুই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে নি। আমি দেখলাম, সে বিকারের প্রচণ্ডতা—সে অস্থিরতা।

আবার আমাকে কে নিয়ে গেল।

বাবার দৃষ্টি তখন স্থির হয়ে গেছে।

আবার ফিরে এলাম।

জনতা তখন স্তব্ধ। মৌন মূক সব। মা উপুড় হয়ে প'ড়ে আছেন আপাদমস্তক আবৃত ক'রে ঘরের এক পাশে। বোধ হয় চেতনা ছিলনা তখন। পিসীমা প'ড়ে আছেন। একে একে লোক আসছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার চ'লে যাচ্ছে। শুধু উঠছে পদধ্বনি।

বাবা শুয়ে আছেন। চোখ দুটির পাতা তখন নামিয়ে দিয়েছে কেউ। আমি নেড়েছিলাম বাবার দেহ। ঠাণ্ডা হিম—কঠিন। মুহূর্তে মনে হ'ল, আর ডাকলে সাড়া দেবেন না। ঠাণ্ডা হিম কঠিন হয়ে গেছেন বাবা। স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলাম প্রথম। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। আতঙ্কিত অভিভূত আমি থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলাম।

১৬

আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল।

আমার কালের কথা স্মরণ করতে গেলেই মনে পড়ে আমার কালের সে-কালকে। ধরাশায়ী বিশালকায় ঘনপল্লব বনস্পতি। মনে ভেসে ওঠে আমার পিতার শবদেহের কথা। শালপ্রাংশু মহাভুজ, লৌহকপাটের মত বুক, প্রশস্ত ললাট, ললাটে সারি সারি চিন্তাকুল বলীরেখা। গভীরদৃষ্টি মানুষটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মনে পড়ে না। মনে পড়ে কঠিন হিমশীতল দেহ, অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্যদৃষ্টি চোখ, নিথর হয়ে প'ড়ে আছেন, ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যেন অনন্তের ধ্যানে। এই আমার সে কালের ছবি। তাই সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ, তার স্খলন আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত। আমার বাবা তাঁর দিনপঞ্জীতে তাঁর চরিত্রের কোন দিক অনুদ্‌ঘাটিত রাখেন নি, এবং সে দিনলিপি আমাকেই উদ্দেশ ক'রে লিখে গেছেন, সব জানিয়ে গেছেন; বার বার ব'লে গেছেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে, বংশগত ঐতিহ্য-মহিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে, অপূর্ণ কামনাকে পরিপূর্ণ করতে। সে ঐতিহ্য, সে মহিমা ব্রাহ্মণের। ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমময় মানুষের। যে ত্রুটি জীবনে ছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ দিয়ে গেছেন। তাই তো শ্রদ্ধা ছাড়া অবজ্ঞা ঘৃণা করতে পারি না সেকালকে। তাই তো বলতে পারি না, সেকাল ছিল ভ্রান্ত।

কোন ভ্রান্ত জন কি বলে?—অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রো। আমি পারি নি; হে আমার উত্তরপুরুষ, তুমি ক'রো।

কোন ঘৃণ্য জন কি বলে?—জীবনে যেটুকু সত্য তাকে জীবন বিনিময়ে রক্ষা ক'রো। হে আমার উত্তরপুরুষ, তোমার উত্তর-পুরুষের জন্য এটুকু গচ্ছিত দিয়ে গেলাম তোমার কাছে।

কোন অতৃপ্ত আত্মকেন্দ্রিক অসুস্থ মানুষ বলে?—আমার জীবনে যা পরিপূর্ণ হ'ল না, হে আমার উত্তরপুরুষ, তা যেন তোমার জীবনে পূর্ণ হয়।

আমার কালের অপরার্ধ নূতন-কাল যেন আমার মা।

জ্যোতির্ময়ী—প্রসন্ন।

তিনি বলেন, আঘাতে বিচলিত হ'য়ো না, ক্লান্ত হ'য়ো না, পথ চল।

শুচিশুভ্রবস্ত্রাবৃতা মায়ের একটি কথা ব'লেই শেষ করব।

বাবার মৃত্যুর পরই অকস্মাৎ একদিন অনুভব করলাম—আমি নিঃসহায়, আমি সমগ্র গ্রামে উপেক্ষার পাত্র, করুণার পাত্র। আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শারদীয়া নবমীর দিন আমার বাবা মারা গেলেন। পরদিন বিজয়া-দশমী। তারপর দিন একাদশী। একাদশীর দিন সকালে আমাদের হিন্দুসংসারে একটি অনুষ্ঠান আছে। আজও আছে। বলে 'যাত্রার সাইত'।

সম্ভবত, রামচন্দ্র বিজয়া-দশমীর দিনে রাবণ বধ ক'রে বিজয়-যাত্রা শেষ ক'রে পরদিন প্রাতে সভানুষ্ঠান করেছিলেন। পুরস্কৃত করেছিলেন বানর-সৈন্যদের, রাক্ষসদের মার্জনা করেছিলেন, প্রসাদ

বিতরণ করেছিলেন। মহাযজ্ঞ শেষে আরম্ভ হয়েছিল নবজীবন। সেই অনুকরণেই বোধ হয় এই প্রথার সৃষ্টি।

সেদিন সকালে শুভসময়ে চণ্ডীমণ্ডপে গৃহস্থকর্তা তাঁর সম্বল নিয়ে বসতেন, আজও নামমাত্র বসেন। সামনে থাকত বাক্স। বাক্সের মধ্যে আধুলি সিকি দুয়ানি ডবলপয়সা পয়সা। তখন আনি মুদ্রার সৃষ্টি হয় নি। ডবলপয়সা ছিল তামার এবং আকারে ছিল টাকার মত বড়। প্রথমেই আমাদের গ্রামদেবতা ফুল্লরা দেবীর পূজক পুরোহিত ও গদিয়ান এসে প্রসাদী বিল্বপত্রের মালা গলায় দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে দাঁড়াতেন। কর্তা টাকা বা আধুলি বা সিকি দিয়ে প্রণাম করতেন। তারপর দুর্গাপূজার পূজক, পুরোহিত, পরিচারক, পাচক, ছেত্তাদার, প্রতিমা গঠনের কারিগর, ডাকসাজের মালাকার, নাপিত, বাদ্যকর, প্রতিমাবিসর্জনের বাহক দল, প্রতিমার চুল যারা তৈরি করে তারা, প্রতিমার নাকের নথ দেয় যারা তারা, আসন-অঙ্গুরী-সরবরাহকারী, ফুলবিল্বপত্র-সরবরাহকারী—সে অনেক অনেক জন—এসে তাদের প্রাপ্য নিয়ে যায়। গ্রামান্তর থেকে লাঠিয়াল আসত, তারা বিসর্জনের মিছিলে রক্ষক হিসেবে থাকত, তারা নিয়ে যেত প্রাপ্য। এর পর আসতেন চিকিৎসক, বৈদ্য, বিষবৈদ্য—অর্থাৎ সাপুড়ে, গো-বৈদ্য, চৌকিদার, দফাদার, কনস্টেবল, পোস্টাপিসের পিওন। মোদক আসত মিষ্টান্ন নিয়ে, মুদী আসত মসলা নিয়ে, জেলে আসত মাছ নিয়ে। তারা কাপড় পেত, টাকা—একটা টাকাও নিয়ে যেত, হিসেবে জমা করত। গ্রামের দাই আসত, রজক আসত, কর্মকার আসত। দু আনা চার আনা বৃত্তি নিয়ে যেত। বাউল আসত, দরবেশ আসত, ভিক্ষুক আসত, সন্ন্যাসী আসত। সাঁওতালেরা আসত দল বেঁধে, তারা নাচত;

বাঁশী মাদল বাজাত, দু পয়সা চার পয়সা বিদায় পেত আর পেত অন্দরের দুয়ারে আঁচল ভ'রে মুড়ি খই মুড়কী। এ সব এই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পেত। এই আসরে এসে বসত গ্রামের শিশু বালক বালিকার দল। প্রতি আসরে একটি করে পয়সা পেত। এ হ'ল শিশুদের বৃত্তি, এ আজও আছে। এই দিনটিতে ছেলেদের হাত পাততে কোন বাধা নাই। লক্ষপতির সন্তানেরও নাই। আমি আমার বাবার কাছে প্রতি বার পেতাম একটি ক'রে টাকা। তা ছাড়া সকল আসর ঘুরে পাঁচ ছ আনা হ'ত।

সেবার যাত্রার সাইতের আসরে আমাকেই বসিয়ে দিলে আমার বাবার শূন্য আসনে। ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ পরেই হ'ল আমার ছুটি। উঠবার সময় কিন্তু আমার বৃত্তি একটি টাকা নিতে ভুললাম না। আমাকে তখন পাশের আসর থেকে ডাকলেন জ্যাঠামশাই। একটি সিকি বা কিছু যেন দিলেন। ওপাশ থেকে ডাকলেন হিরণ্যভূষণবাবু। তিনি বোধ হয় আধুলি দিলেন। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, এমন অভাবিত সৌভাগ্যের হেতু। একটু উৎসাহিত হয়েই অন্যান্য কর্তাদের আসরে গেলাম স্বাভাবিক ভাবেই।

এক স্থানে অভাবিত ভাবে সমাদৃত হলাম।

আমাকে একটা টাকা দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গেই ছিল আমার বন্ধু ওই কর্তার ভাগিনেয়। তার হাতে দিলেন তিনি একটি সিকি। কর্তার ভাগিনেয় স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুণ্ণ হ'ল। বললে, ওকে টাকা দিলে, আমি সিকি নেব কেন?

কর্তা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে তাকে বললেন, যাও—যাও, যাও বলছি।

আমি পালিয়ে এলাম। হয়তো ভয়েই এসেছিলাম! মনে হয়তো হয়েছিল যে, আমার টাকাটাও হয়তো ফিরে দিয়ে সিকি নিতে হবে

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধুর অপেক্ষায়। সে কি পায় দেখব। যাত্রার সাইতে কে কত পায় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হ'ত আমাদের মধ্যে। যে বেশী পেত, সে-ই আপন সৌভাগ্যে স্ফীত হয়ে উঠত।

হঠাৎ কানে এল ভিতর থেকে বন্ধুর কান্নার শব্দ। বন্ধু কাঁদছে। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, কর্তার বাড়ীর কোন কর্মচারী বন্ধুকে বলছে, ছি, কাঁদতে নাই। ছেলেমানুষ টাকা নিয়ে কি করবে? ওর বাবা মরেছে কিনা—তাই ওকে একটা টাকা দিয়েছেন তোমার মামা। ওর হিংসে করতে নাই, ও নেহাত হতভাগা ছেলে!

সে দিনের সে মুহূর্তটি আমার মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সে যে কি হয়েছিল—তা বর্ণনা করা আজ সম্ভবপর নয়। শুধু ওই একটা কথা যেন লক্ষ কোটী হয়ে আমার পৃথিবীর আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে বেজে উঠেছিল।

হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে! হতভাগা ছেলে!

ছুটতে ছুটতে বাড়ী ফিরে এসেছিলাম।

মা আমার তখনও মাটির প্রতিমার মত আপাদমস্তক থান কাপড়ে আবৃত ক'রে প'ড়ে ছিলেন। এসে মায়ের কাছেই শুয়ে পড়েছিলাম। হাতে আর তখন টাকা-পয়সাগুলি সব ছিল না। প'ড়ে গেছে রাস্তায়।

মা মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি মস্ত লোক হবে। কেন হবে হতভাগা! দুঃখ ক'রো না। ও তোমাকে তারা ভালবেসে বলেছেন।

টাকাটি ছিল না, প'ড়েই গিয়েছিল। বাকী সিকি দুয়ানি আধুলিগুলি মা ভিক্ষার্থীদের দিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কারণেই একালে অবজ্ঞা অবহেলা জীবনে যা এসেছে, তাই আমি পথে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলতেই চেষ্টা করেছি আজীবন। আমার কালের যে অংশ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, পালন করেছে আমাকে মায়ের মত—এ হ'ল তারই শিক্ষা। দীক্ষা আমার কালের সেকালের কাছে।

অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ, অর্ধনিমীলিত চক্ষু, হিমশীতল দেহ আমার বাবা আমার কালের অর্ধাঙ্গ—আমার জ্যোতির্ময়ী প্রদীপ্ত-দৃষ্টি শুভ্রবাসপরিহিতা তেজস্বিনী মা আমার কালের অপর অর্ধাঙ্গ; আমার জীবনে আমার কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমার সেকাল আর একালের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। চির কল্যাণের একটি ধারা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোন কালে ওপারে ফুটেছে ফুল—কোন কালে এপারে ফুটছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলের মালা গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়। ওই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমার কালের রূপ ভেদ ক'রেই একদা আমাকে দেখা দেবেন। সে দিন আমার মাল্য-রচনা সমাপ্ত হবে! বলব, নাও আমার মালা। শেষ ক'রে দিলাম মালা-গাঁথার পালা। আমি হারিয়ে যাই তোমার মধ্যে। তোমার জয় হোক—জয় হোক—জয় হোক!